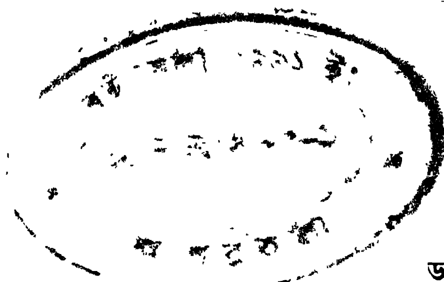
অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

অসমীয়া একাঙ্কগুচ্ছ

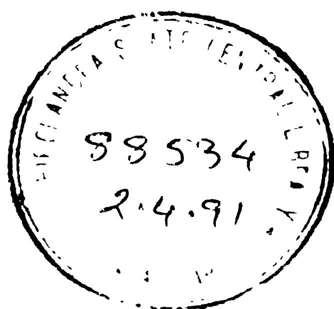
ও

পিয়লি ফুকন

অসমীয়া একাঙ্কগুচ্ছ
ও
পিয়লি ফুকন



সম্পাদনা
ডঃ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী
অনুবাদ
গুরুদাস ভট্টাচার্য





ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

মূল্য ঃ Rs. 13.50

Original title : ASAMIYA EKANKIKA AATKHON ARU PIYALI FUKON *(Assamese)*
Bengali translation : ASAMIYA EKANKOGUCHCHHO-O-PIYALI FUKON

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিউটি প্রিন্ট, পাহাড়গঞ্জ, নয়াদিল্লি-110055 থেকে মুদ্রিত।

ভূমিকা

প্রাচীন নাট্যসাহিত্যে একাঙ্ক-নাটকের শৈলী যে দুর্লভ, তা নয়। কিন্তু বর্তমান শতকে জন-প্রীত এই শ্রেণীর নাটকের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকে। য়ুরোপে স্ট্রীন্ড্‌বার্গ, চেখভ, ইংলণ্ডে কোনান ডয়েল, লেডী গ্রেগরী, সীঞ্জ্‌, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউজীন ও'নীল প্রভৃতি একের পর এক নাট্যকার এই নাট্যফর্মকে একটি নিজস্ব সার্থক রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হন। স্ট্রীন্ড্‌-বার্গের 'মিস জুলী' লেখা হয়েছিল 1888 খ্রীষ্টাব্দে ; সীঞ্জের সুবিখ্যাত 'দ্য রাইডার্স্‌ টু দ্য সী' অভিনীত হয়েছিল 1904 খ্রীষ্টাব্দে। এইসব নতুন নাটক, অনেক সময়, এক-একটা দলের তথা গ্রুপ-থিয়েটারে পরীক্ষামূলকভাবে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল ; চিন্তা এবং উদ্‌ভাবনার ক্ষেত্রে অগ্রণী এক শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের আগ্রহ পরিপোষণ করেছিল এহেন নাট্যকর্মগুলি।

পূর্বকালে, দীর্ঘাঙ্গ নাটক পরিবেষণ করার মাঝখানে, বিরতির সময়ে, কখনও বা এক-আধটা ধামালী দৃশ্যের অবতারণা ক'রে দর্শকের মনোরঞ্জন করা হত। একালে, এইসব তন্বী দৃশ্যকাব্য তথা নাটিকা একটি নিজস্ব কলা-রূপ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাটকহিসাবেও সম্মানলাভে সমর্থ হল। উদাহরণস্বরূপ, লেডী গ্রেগরীর 'দ্য রাইজিং অফ দ্য মুন' অথবা সীঞ্জের 'দ্য রাইডার্স্‌ টু দ্য সী' আদি একাঙ্কিকায় দেশপ্রেম, প্রকৃতির অজেয় শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম ইত্যাদি গহীন ও গভীর বিষয়ের, সমস্যাগুলি কলাসম্মত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এগুলি আদৌ লঘু রচনা নয়। এইসব নাটিকা প্রমাণ করে যে, হাল্কা রসিকতা থেকে গভীরতর যেকোন বিষয়বস্তুই একাঙ্কিকা ধারণ করতে পারে। এই বিশেষত্ব হেতু, এবং বাস্তববাদের প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, ছোটগল্পের মতো, একাঙ্কিকাও বার্তমানিক সাহিত্যের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ কলা হিসেবে মাথা তুলতে পেরেছে। লেডী গ্রেগরী, চেখভ, প্রভৃতি নাট্যকারের যে কয়েকটি নাটিকা অসমীয়া রূপে মঞ্চস্থ হয়েছে, সেগুলি আমাদের লেখকদের অবশ্যই প্রেরণা দিয়েছে। এইসব একাঙ্কিকা নাটক ইংলণ্ডের বিভিন্ন 'স্কুল'-এর নাট্যসমিতিগুলি প্রায়ই মঞ্চস্থ করে ; এবং কোন নাটক মঞ্চস্থ করলে, নাটকটির জন্যে, নাট্যকারকে একটা নির্ধারিত মাশুল বা ফী দেওয়া ওখানকার নিয়ম। এ-ধরণের নিয়ম আমাদের এখানে প্রচলিত হলে নাট্যকারগণ কিঞ্চিৎ উৎসাহ পেতে পারেন!

আসামে একাঙ্কিকা আন্দোলনের সূত্রপাত আমাদের স্বাধীনতা লাভের বছর কয়েক পরে। কিন্তু বিস্ময়ের বিস্ময় এই যে, বেজবরুয়ার 'গদাধর রজা' এর অনেক আগে, অর্থাৎ 1918 খ্রীষ্টাব্দে লেখা। যদিও একে একাঙ্কিকা না বলে পারা যায় না। বেজবরুয়া এর নাম দিয়েছিলেন 'চরাধরীয়া ভাওনা'—ড্রায়ংরুম প্লে। এটি হাল্কা ধরণের নাটিকা, কিন্তু এর বিষয়বস্তু আদৌ লঘু নয় রাজনীতি এর

বিষয়বস্তু। গদাধর রাজার পলায়ণ ও রাজ্যোদ্ধারের প্রচেষ্টা, এবং তাঁর প্রতি সচেতন শ্রেণীর লোকেদের সহানুভূতি—নাটিকাটির উপজীব্য। 'এই প্রসঙ্গে ফণি তালুকদারের মন্তব্য : 'নামভূমিকায় গদাধর মঞ্চে দেখা না দিয়েও, রচনার পটভূমিতে থেকেই, কাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন। টেকনিকের দিক থেকে এটাও উল্লেখযোগ্য।'

1937 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীরমেশচন্দ্র বরুয়ার কাব্যিক নাটক 'মনালিছা' (মোনালিসা)-র কথা ছেড়ে দিলে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা শ্রীঅনিল চৌধুরীর 'চিরন্তন'। এর আগে ছাপা হয়েছিল 'এবেলার নাট' (এক বেলার নাটক)। বীণা দেবী (বরিঞ্চি কুমার বরুয়া)-র 'এবেলার নাট' ছাপা হয়েছিল 1955 খ্রীষ্টাব্দে, 'চিরন্তন' 1962 খ্রীষ্টাব্দে, 'এবেলার নাট' আকারে ছোট নয়, প্রায় পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমান দীর্ঘ। গ্রন্থের ভূমিকায় বীণা দেবী যে স্বল্প মন্তব্য করেছেন, তা একাঙ্কিকার ফর্ম সম্পর্কে আভাষ দেয় : 'এবেলার নাট' অসমীয়া সাহিত্যে নতুন ধরণের সৃষ্টি। এই নাটকে কাজের চেয়ে কথা প্রধান। একটি পরিবারের বৈঠকখানায় একবেলায় সংঘটিত কাহিনীর ওপর নির্ভর ক'রে নাটকখানি লেখা হয়েছে। ঘটনার পরিসর সংক্ষিপ্ত ; পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা কম ; দৃশ্য মাত্র একটি। 'দৃশ্য' অর্থাৎ ঘটনা স্থল একটি—'জোড়হাটের ধৈর্যচরণ বরুয়ার বৈঠকখানা'—যদিও নাটকের কুড়ি এবং চল্লিশ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায় যে নাট্যকার ওই-ওই জায়গায় অল্প বিরতির আবশ্যকতা অনুভব করেছেন। এই পরিস্থিতিতে অনিল চৌধুরী প্রয়োগ করেছেন 'দর্শন' শব্দ ('চিরন্তন' দ্রষ্টব্য)। একাঙ্কিকায় এ জাতীয় বিরতি টেকনিকের দিক থেকে অল্প ত্রুটিপূর্ণ ; কারণ, এই শ্রেণীর নাটকের অভিনয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটা বাঞ্ছনীয়। মঞ্চ জনশূন্য হলে নাটকীয় গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দু-একটা ইংরেজী নাটকে অবশ্য এ-ধরণের বিরতি লক্ষ্য করা যায়। নাটকটির বিষয়বস্তু গভীর—নতুনের সঙ্গে পুরণোর সংঘাত, কিছু পরিমাণে যুক্তির সঙ্গে অনুভূতির সংঘাত ; এর উপসংহারও শোকাবহ। নাটকটির শেষের দিকে একজনের উক্তি : 'পুরণো-নতুন, দুই শক্তির সংঘর্ষে মানুষের মতো মানুষ একজনের জীবন শেষ হয়ে গেল।' উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা নিয়ে নাটকটির কাহিনী ; সমস্যা ও ব্যক্তি, দুই ক্ষেত্রেই নাটকীয় সংঘাত সুস্পষ্ট।

এই ধরণের আরও একটি দীর্ঘায়ত অথচ গহীন একাঙ্কিকা অনিল চৌধুরীর 'চিরন্তন'। এতেও সংঘাত কম তীব্র নয়। এই সংঘাত একদিকে দারিদ্র্য ও ব্যর্থতার মধ্যে, অন্যদিকে বিবেক এবং মানুষের আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে। ঘটনাক্রমের দৈর্ঘ্যের জন্যে নাট্যদৃশ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বিভাগ দুটিকে লেখক আখ্যা দিয়েছেন 'দর্শন'। মূল নাটকে প্রথম দর্শন-এর ভেতরে প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা 'স্বপ্ন' আছে ; নাট্য-পরিবেশে, এই স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নেই যে তা নয়। কিন্তু নাট্যকারের নির্দেশ—অসুবিধে হলে, এই স্বপ্ন দৃশ্য বাদ দেওয়া যেতে পারে। এবং স্বপ্নকে বাদ দিলে, গঠনের দিক থেকে, নাটকটিকে একাঙ্কিকা না বলে পারা

যায় না। এর ঘটনা-স্থল একটা ; ঘটনাগুলো ঘটছে অপরাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ; চরিত্রের সংখ্যাও খুব কম।

চৌধুরীর নাটকটি 1953 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গৌহাটিতে পরপর দু'রাত অভিনীত হয়েছিল। বেতার-কেন্দ্রও 'সংঘাত' নাম দিয়ে এটি প্রচার করেছিল 1954 খ্রীষ্টাব্দে। বীণা দেবীর 'এবেলার নাট' এবং চৌধুরীর 'চিরন্তন' নাটক হিসেবে অনাকর্ষণীয় বা ব্যর্থ না হলেও দৈর্ঘ্য এবং বিষয়বস্তুগত গুরুত্বের দিক থেকে এদের কাছাকাছি আসতে পারে। এমন নাটক বেশ কিছুদিন আর লেখা হল না। বলতে গেলে, বর্তমান আসামের একাঙ্কিকা নাট্য-আন্দোলনে এ দুটির আদর্শ ও প্রভাব অধিক নয় বলেই যেন মনে হয়। সে-আলোড়ন নিয়ে এল ভোলা কটকীর 'বিভ্রাট' এবং শ্রীঘন শইকীয়ার 'মহাসমর' আদি নাটিকা।

কটকীর 'বিভ্রাট' 1956 খ্রীষ্টাব্দের সর্বভারতীয় যুব উৎসবে প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এটি 'চিত্রবন'-এ (1956) ছেপে বেরিয়েছিল। তফজ্জুল আলির 'নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ' (না ক'রে থাকি কিভাবে), অতুল বরুয়ার 'ছকুরি বুকুর একুরি' (ছকুড়ির মধ্যে এককুড়ি) প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখনীয় একাঙ্কিকা। যেসব নাট্যকার পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার জন্যে সুবিখ্যাত—যেমন, প্রবীন ফুকন, ফণী শর্মা, ফণী তালুকদার—এঁরাও সুযোগমতো দু-একখানা একাঙ্কিকা লিখেছেন। বর্তমানে, প্রতি বছরই, বিভিন্ন দল আয়োজিত নাট্য-উৎসবগুলিতে, বিশেষভাবে, একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করা হয়। এগুলির বেশির ভাগই অপ্রকাশিত, দু-একখানা কদাচিৎ কোন আলোচনায় উদ্ধৃত। এমন কি, ভবেন শইকীয়ার 'পুতলা নাচ' (পুতুল নাচ) ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় একাঙ্কিকাও মুদ্রিত রূপে পাওয়া যায় না। এইসব কারণে একাঙ্ক নাটকের একটা সুচারু সংকলন প্রস্তুত করা রীতিমতো কষ্টকর।

'এবেলার নাট' কিংবা 'চিরন্তন'-এ যে উচ্চবিত্ত চিন্তা ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন আছে, ভোলা কটকীর 'বিভ্রাট'-এ তা অনুপস্থিত। তবে, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে এটি রচিত। গ্রাম্য-জীবনে প্রায়শ দৃশ্যমান স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যকে কেন্দ্র ক'রে লেখা এই নাটিকাটি 'রঙ্গনাট' শ্রেণীভুক্ত হলেও সমস্যার গুরুত্বের জন্যে একে প্রহসন বলা যায় না। অন্যদিকে অতুল বরুয়ার 'ছকুরি বুকুর একুরি' গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে ওঠা প্রহসন (প্রথম মুদ্রণ 1960)। তফজ্জুল আলির 'নেপাতি কেনেকৈ থাকোঁ', যোগেন বায়েনের 'বেজর নাকত ধরে খালে' (বদ্যির নাকে দাদ) ইত্যাদি নাটিকাও গ্রাম্য পরিমণ্ডলের কলহ দলাদলি অবলম্বনে লেখা। এই ধরণের ভুল-বোঝাবুঝি, উত্তেজনার উত্তাপ, শেষে মিটমাট, বেশ কয়েকটি একাঙ্কিকার উপজীব্য। এগুলি প্রহসন অথবা প্রহসন-কল্প রচনা। কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ অথবা স্বল্প-ব্যাপক সার্থকতাসম্পন্ন নাটিকার সংখ্যা কম। তফজ্জুল আলির 'হে যুদ্ধ বিদায়', ফণী তালুকদারের 'ছাঁ' (ছায়া) অবশ্য এর ব্যতিক্রম। প্রবীন ফুকনের 'চকরি' (চক্র), ফণী শর্মার 'ক'লা বজার' (কালো বাজার) আদি নাটিকা ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এগুলির সামাজিক মূল্য নেই যে তা নয় ; অভিনয়

ভালো হলে এগুলি উপভোগ্যও হয়। বিদ্রূপ এবং লাল-ঝাণ্ডা-ওড়ানো বিপ্লবী চিন্তা যদি নাটিকার বিষয়বস্তু হয়, আপত্তি করার কিছু নেই ; শুধু, নাটকীয় সামগ্রীকে কিভাবে রূপ দেওয়া হচ্ছে, তার ওপরে নির্ভর করে অনেকখানি। অতি নাটকীয় উত্তেজনার মূল্য সাময়িক এবং ক্ষণিকের। দুটো পরিবারের ভুল বোঝাবুঝিকে অবলম্বন ক'রে অতুল বরদলৈ 'এখন দুয়ার লাগে' (একটা দরজা চাই)-র মতো আকর্ষণীয় নাটিকা লিখতে সক্ষম হয়েছেন। সবই নির্ভর করে নাট্যকারের শক্তির ওপর।

ভবেন শইকীয়া সুপ্রতিষ্ঠিত গল্পলেখক। শইকীয়ার একাঙ্কিকাগুলিতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এঁর 'পুতলা নাচ' একদিকে টাকা-পয়সার লেনদেন করা এক অফিসের একমুঠো কর্মচারীর বিশ্বস্ততার পরীক্ষা, অন্যদিকে প্রলোভনের ছোঁয়া লেগে অভাবগ্রস্ত মানুষের মন কিভাবে বিচলিত হয়, তার পরিচয়। 1961 খ্রীষ্টাব্দ থেকে নাটিকাটি একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। শইকীয়ার অন্যান্য একাঙ্কিকা 'বাওনা' (বামণ), 'অবরোধ' ইত্যাদি। 'অবরোধ'-এ রাজনৈতিক আদর্শের নামে চালু কতিপয় হঠকারী আন্দোলনের স্বরূপ উন্মোচন ক'রে দেখানো চেষ্টা হয়েছে। উদ্দেশ্য—ব্যঙ্গাত্মক।

একাঙ্কিকার ক্ষেত্রে চিন্তার সামগ্রী জুগিয়েছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার সত্যপ্রসাদ বরুয়া। বরুয়ার 'শাশ্বতী'তে তিনটি নাটিকা আছে—'শাশ্বতী', 'দুপর নিশা' (মধ্যরাত্রি), এবং 'ভাস্বতী'। প্রথম ও শেষটি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মধ্যবর্তী সমস্যা নিয়ে লেখা ; দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু—অপরাধ। তৃতীয়টি প্রহসন জাতীয় ; কিন্তু অন্য দুটির স্বরূপ গভীরতা-দ্যোতক, এবং ট্র্যাজেডী-জাতীয়। বরুয়ার ভাষায় উত্তেজনা নেই ; কিন্তু যেহেতু প্লট সমস্যামূলক, তাই সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার আলোড়ন-বিলোড়ন নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনার চেষ্টা তিনি করেন। 'ভাস্বতী'-তে নাট্যকার, একাঙ্কিকার ঐতিহ্যের একটি বিশেষ লক্ষণ যে পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'নাটকটিতে একমাত্র লেখক ছাড়া অন্য চরিত্রগুলি গতানুগতিক ভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। তারা অন্য নাট্য-চরিত্রদের মতো প্রবেশ প্রস্থান করে না। 'লেখকের' মনে যখন যার কথা ভেসে উঠেছে, তখনই সে সম্মুখে দেখা দিয়েছে। নাটকটির প্রকৃত অভিনয়স্থল 'লেখক'-এর মন-মঞ্চে।' নাট্যকারের এই প্রচেষ্টা ঈষৎ সুররিয়েলিস্টিক।

হিমেন্দ্র কুমার বরঠাকুরের 'দ্বীপ'-এর প্লট অদ্ভুত। এর মধ্যে দিয়ে সরকার ও সমাজের যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা কৌশলপূর্ণ। এই গহীন নাটিকার কেন্দ্রীয় চরিত্র এক আধ-পাগল সর্বহারা বৃদ্ধ, বিদ্রোহের প্রতীক হয়েও মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ। বরঠাকুরের 'রচনায়' জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করার মতো সামগ্রী থাকে, অথচ এই সামগ্রী বক্তৃতা-দোষে দূষিত নয়। বরঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বাঘ'-এ সুকৌশলী ব্যঙ্গ লক্ষণীয়। 'দ্বীপ' সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে।

দুর্গেশ্বর বরঠাকুর, রেডিওর দৌলতে, লঘু নাটক পরিবেশনে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। হাস্যরস এঁর রচনার বিশিষ্ট লক্ষণ। এক অভাবগ্রস্ত পরিবারের সমস্যা নিয়ে লেখা 'দৈনিক'। কিন্তু চরিত্র-ত্রয়ীর আশাবাদী মন এবং রঙ্গপ্রিয়তা একাঙ্কি-কাটিকে রঙ্গাত্মক করে তুলেছে। এতে দৈনন্দিন জীবনের অভাববোধ থাকলেও, নেই কোন দারিদ্র্যবিলাসী জীবন দর্শন বা রাজনৈতিক তথ্য পিপাসা।

বর্তমান সংকলনে, অসমীয়া একাঙ্কিকার বিভিন্ন ধরণ-ধারণের আভাষ দিতে পারে এমন কয়েকটি নাটিকা একত্রিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে বেজবরুয়ার 'গদাধর রজা'কে ঐতিহাসিক বিষয়-আশ্রয়ী বলতে পারা যায়। নতুবা, অসমীয়া ছোট গল্প এবং একাঙ্কিকা, দুই ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্য সর্বথা লক্ষ্যগোচর। যতদূর জানি, সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে কেউই ইতিহাসের সামগ্রী নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য একাঙ্কিকা সৃষ্টি করতে পারেন নি। গিরিশ চৌধুরীর 'আলেকজেণ্ডার-পুরু', 'ছাহজাহান' (শাহজাহান) ইত্যাদি নাটিকা ছাত্রছাত্রীদের জন্যে লেখা ; অপিচ, এদের বিষয়বস্তুও আসামের ইতিহাস থেকে নেওয়া নয়।

ছোটগল্পের মতো একাঙ্কিকাও সংক্ষিপ্ততার সৃষ্টি। প্লট, কাহিনীবিন্যাস, চরিত্র, সংলাপ, সবক্ষেত্রে যথেষ্ট মিতব্যয়িতার প্রয়োজন। এধরণের নাটিকায় চরিত্রের সংখ্যা যতো কম হয়, ততোই ভালো। চরিত্র, সংলাপ, ইত্যাদির দিক থেকে ভোলা কটকীর 'বিভ্রাট' উল্লেখযোগ্য। অনিল চৌধুরীর 'চিরন্তন'-এ, শ'র নাটকের মতো, দুটি কি তিনটি চরিত্র, দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে, নাট্যসূত্রকে রবারের মতো টেনে নিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সংলাপের মননশীল আকর্ষণ না থাকলে নাটক ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা। কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে পারাটা একাঙ্কিকায় বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। একাঙ্কিকার সামনে প্রচুর সম্ভাবনা। আশা করি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অসমীয়া নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর রচনায় আরও মূল্যবান অবদান রাখতে সমর্থ হবেন।

নগাওঁ নাট্য সমাজ প্রকাশিত (১৯৪৮) 'পিয়লি ফুকন' প্রকৃত অর্থে একাঙ্ক নাটক নয় ; যদিও এতে অঙ্ক-বিভাজন নেই, দৃশ্যই অঙ্ক'র কাজ করেছে। অন্যপক্ষে, 1830 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিতারণের একটি প্রয়াসকে আশ্রয় করে রচিত এই নাটক অসমীয়া নাট্যজগতে আলোড়ন আনতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতা-প্রয়াসী অভিজাত শ্রেণীর যুবক পিয়লি ফুকন। তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। এই প্রেরণাদায়ক অথচ শোকাবহ ঘটনার নাটকীয় রূপ, পিয়লি ফুকনের বীরোচিত চরিত্র-চিত্রণ ইত্যাদি গুণের জন্যে নাটকটি উল্লেখযোগ্য। সেই কারণে 'পিয়লি ফুকন' সংকলনের অতিরিক্ত রূপে সংযোজিত হল।

প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী

অনুবাদ-প্রসঙ্গে

গ্রাম্য সংলাপগুলির অনুবাদে অসমীয়া এবং বাংলা উপভাষা সমূহের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। অনেক অসমীয়া অব্যয়, সম্বোধন পদ, নাম-বস্তু-বাচক শব্দ, ইত্যাদির যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব বিধায় কয়েকটি বর্জন করতে হয়েছে, কয়েকটির মূলসহ অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েকটির যথাসম্ভব-নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। পাদটীকার তাবৎ দায়-দায়িত্ব সম্পাদকের বা নাট্যকারগণের নয়, অনুবাদকের।

—গুরুদাস ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

গদাধৰ ৰজা

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

চরিত্রাবলী ঃ

শ্রীমতী কমলা, বয়স 18 বছর, শিমলুগুরীয়া বরুয়ার কন্যা
শ্রীমতী বিমলা, বয়স 16 বছর, শিমলুগুরীয়া বরুয়ার কন্যা
শ্রীগেন্ধেলা দাস, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি
শ্রীমঙ্গলা, শিমলুগুরীয়া বরুয়ার গৃহভৃত্য

প্রাসঙ্গিক

'বাঁহী' 9/3—4 সংখ্যা, 1918। গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রণ 1936। মূল স্বত্ব—শ্রীমতী রত্নাবলী বরুয়া, ডিব্রুগড়, আসাম।
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া (মৃত্যু 1937) এই শতকের প্রভাবশালী লেখক। সাংবাদিকতা, ব্যঙ্গ রচনা, ছোট গল্প, নাটক ('জয়মতী', 'বেলিমার' ইত্যাদি), কবিতা এবং আসামে বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিখ্যাত।

[**সময়** : আসামে রাজসিংহাসনে ল'রা রাজা, গদাপাণির পলায়ন অন্তে।

সাজসজ্জা : কমলা ও বিমলার পরিধানে পাটের 'রিহা-মেখলা'—চাদর ও অধোবাস ; মাথায় বড়ো খোঁপা, কপালে চন্দনের রেখা এবং সোনারং টিপ। গেন্ধেলার পরণে হেঁটো-ধুতি, গায়ে হাতকাটা জামা, কোমরে সুপুরির বটুয়া, কানে জাংফাই গাছের আঠায় তৈরি পাশা, দাড়ি কামানো, গোঁফ আছে ; হাতে মোটা শক্ত বাঁশের লাঠি, মাথায় চাপড়া-খোঁপা, দুপাশ-কাটা চুল ; মুখভর্তি সুপুরি—ঠোঁটে মাখামাখি তার রং-রস।

দৃশ্য : শিমলুগুরীয়া বরুয়ার বাড়ির একটা ঘর—তাঁতশাল। তাঁতশালে বসে কমলা একটা মুগার চাদর বুনছে। কাছে ব'সে বিমলা লাটাইয়ে সুতো গোটানো শুরু করেছে। কিন্তু তার মন লাটাইয়ের দিকে নেই, উশখুশ-উশখুশ করছে]

কমলা : বিমলা! লাটাইটা নিয়ে কী উশখুশ করছিস! সুতো গোটাচ্ছিস না ক্যানো? হয়েছে কী তোর?

বিমলা : হয়েছে অনেক কিছু। ছ্যা, মেয়ে হয়ে জন্মানোর কোন মানেই হয় না! কোন্ পাপে বিধাতা যে আমায় মেয়ে করে পাঠালে, বলতে পারি না!

কমলা : (মুচ্‌কি হেসে) সঙ্! বলি—মেয়ে যদি না হতিস, তাহলে কি তুই হাতি-ঘোড়া মারতিস নাকি?

বিমলা : মারতুমই তো...হাতি-ঘোড়ার চেয়ে অনেক বড়ো-কিছুই মারতুম! ...প্রথমেই, সেই পাপিষ্ঠ ল'রা রাজার মুণ্ডুটা কেটে এনে শ্যাল-কুকুরদের দিতুম ; তার ছাল ছাড়িয়ে তাই দিয়ে ঢোল বাজাতুম। ...তারপরে অন্য কথা।

কমলা : উঃ, কী আমার বীরাঙ্গনা রে! ...নে, সুতো গোটা দিকি। ...মুখ না চালিয়ে সুতো গোটা।

বিমলা : মুখ চালাচ্ছি না দিদি, সত্যি কথাই বলছি। আমার কথার প্রমাণ খুব শীগ্‌গিরই পাবে।

কমলা : দ্যাখ্ বিমলা! আজেবাজে কথা বলিস নি। ...বাবা গেছেন গদাধর রাজার হয়ে গোপনে কাজ করার জন্যে। তাঁর গতি-গোত্র দেখে মন্ত্রীমশাই এ্যাকেই আমাদের সন্দেহ করছে, সুযোগ পেলেই সব্বাইকে সাপ্‌টে পিষে মেরে ফেলবে। তার ওপরে, তুই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস নি বোন। ...মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের মতোই থাক।

বিমলা : সেই জন্যেই তো বলছি—কোন্ দেব্‌তার শাপমন্যিতে যে আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি, জানি না। ...তবে, এটা ঠিক জেনো দিদি, যে, আমি আর

মেখলা পরে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকব না—সতী জয়মতীর[1] শাস্তির শোধ নোবই—মরি-বাঁচি, সেও আচ্ছা।

কমলা : ক্যামোন করে নিবি শুনি?

বিমলা : ক্যানো—পুরুষের পোষাক প'রে, হাতে নিয়ে ধনুর্বাণ! আমি গদাধর রাজার পাশে দাঁড়িয়ে, পাপিষ্ঠ ল'রা রাজাকে মেরে, সত্যিকারের রাজা গদাধরকে সিংহাসনে বসিয়ে, দেশহিতের কাজ করব।

কমলা : আহা! কী আমার দেশ-উদ্ধারকারিণী! দেখি, দেখি মুখখানা—

বিমলা : আজই দেখে নাও; কীজানি, কাল হয়তো আর দেখতে পাবে না।

কমলা : দ্যাখ্ বিম্লি! তোর উল্টোপাল্টা মেয়েলী বুলি আমার খুব জানা আছে। ...বাবা ঘরে নেই, এই সময়ে তুই আবার এ্যাকটা কাণ্ড বাধিয়ে বসিস নি, লক্ষ্মী বোনটি আমার! মিনতি করছি তোকে।

বিমলা : কাণ্ডটাণ্ড কিচ্ছু না দিদি! আমি পষ্টাপষ্টি গদাধর রাজার পক্ষ নোব; আমাকে দিয়ে তাঁর যে কাজ হ'তে পারে, তা আমি করব। বাবার পথই আমার পথ।

কমলা : শোন্ বিম্লি! যাবার সময়ে বাবা বলে গিয়েছিলেন—গদাধর রাজা ছদ্মবেশ ধ'রে এইদিকেই, কাছেটাছে হয়তো, ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ এ্যাকদিন আমাদের বাড়ি এসে পড়তেও পারেন। যদি আসেন, তাহলে ভালভাবে তাঁর সেবা করতে হবে আমাদের। কাজেই, তুই অধৈর্য হয়ে, খপ্ ক'রে কোন কাজ করে বসিস নি। কোথাকার জল কোথায় যায়, কে বলতে পারে!

[মঙ্গলার প্রবেশ]

মঙ্গলা : দিদিমণি গো! কুথাকার গাইয়াঁ মানুস এ্যাট্টা এয়েস্ছে; আপোনাদের সাথে দ্যাহা করতি চাইস্ছে; সে চিঠি এ্যাক্খান নাকি আনিস্ছে।

বিমলা : (মৃদুকণ্ঠে) দিদি, সাবধান! নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী গদাধর রাজা! আমাদের সাধ্যমতো তাঁর সেবা করতে হবে; খুব সাবধানে রাখতে হবে—যাতে কোন ত্রুটি না হয়, কেউ য্যানো আঁচটুকুও না পায়।

কমলা : হ্যাঁরে মঙ্গলা! লোকটা কি? দেখতে ক্যামোন?

মঙ্গলা : কে সেইটে, ক্যাম্নে ক'ব? ...সেইটে দেখতে ক্যামন...সেই প্যাঁচামুণ্ডটা? চাপ্ড়া-চুল আর হেঁটোধুতি-পরা সেই হেজোটার রূপের কথা শুধিস্ছেন? ...হা দিদিমণি গো! আপোনিও ভাল যায়েন। সিদিন...মোদের সেই হাঁড়ি-খেকো শ্যালটা য্যামন দেখেস্ছিলেন। এইটাও তেমনি।

বিমলা : (কমলার কানে কানে) এ্যাক্কেবারে ঠিক, দিদি। গদাধর রাজাই

1. গদাধর রাজার স্ত্রী। স্বামীর খবর বার করার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষ এঁকে অনেক যন্ত্রণা দেয়। ইনি মৃত্যু বরণ করেন, তবু শত্রুকে সাহায্য করেন না।

ছদ্মবেশ ধ'রে এসেছেন। আজ আমাদের অনেক ভাগ্য বলতে হবে। আর দেরি ক'রে লাভ নেই, দিদি, ওঁকে ভেতরে আনা যাক।

কমলা : মঙ্গলা, যা—লোকটাকে এখানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান]

—আমারও মনে হচ্ছে বিম্‌লি—ইনি আমাদের গদাধর রাজাই। ...যা, যা, রাজার বসার জন্যে একটা জলচৌকি দে। আহা, কতো পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে ঘুরে হয়তো ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত হয়ে এসেছেন! রাজার জন্যে ভালো ক'রে এ্যাকটা জলখাবারের ব্যবস্থা কর্।

[গেন্ধেলা ও মঙ্গলার প্রবেশ। কমলা ও বিমলা সসম্ভ্রমে উঠে একটা জলচৌকি পেতে দেয়। গেন্ধেলা বসতে ইতস্তত: করে]

বিমলা : মঙ্গলা, তুই যা এখান থেকে।

[মঙ্গলার প্রস্থান]

—স্বর্গদেব![1] আপনি এই জলচৌকিতে ভালো ক'রে বসুন। আমরা অল্পবুদ্ধি নারী, আমাদের দোষ-ত্রুটি ধরবেন না।

গেন্ধেলা : (করজোড়ে) মা জননীগণ! মুই মুরুখখু-সুরুখখু পাইক; আপোনাদের সম্মুখে মুই বড় পিঁড়াতে বস্তি পাইরব না মোকে ক্ষমা করুন ঈশ্বর, মুই এই মাটিতেই বহি।

[গেন্ধেলা মাটিতে বসে]

বিমলা : সর্বনাশ, সর্বনাশ! কী করছেন স্বর্গদেব? আপনাকে আমরা চিনতে পেরেছি। ...আপনার কথা বাবা আমাদের সব বলে গেছেন। আমাদের কাছে আপনি কোন সংশয় করবেন না...আমরা আপনার দাসী...আপনার কাছে আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি। ...দাদা একটু বেরিয়েছেন, এ্যাখনই ফিরে আসবেন। আমাদের গোটা পরিবারকেই মহারাজের অনুগত বলে জানবেন।

গেন্ধেলা : (স্বগত) এইসব কী বটে? মুই কুথায় পইড়লম? ঈঁয়ারা ঈসব কী করত্যাসেন? এইটা শিমলুগুরীয়া বরুয়ার বাড়ি তো! মুই কার ঘরে ঢুইকলম। মোকে ডাইনীতে পাইল নাকি?—(প্রকাশ্যে) মা জননীগণ! এইটা কি শিমলুগুরীয়া বরুয়ার বাড়ি?

বিমলা : হ্যাঁ রাজা।

গেন্ধেলা : তবে আপোনারা মোকে কি ভেলকীবাণ মাইরতিসেন? রাজা বানাই পরিহাস কইরতিসেন? মুই দুখীরাম মেধির পুত গেন্ধেলা বায়েন—স্বগদেব-ফর্গদেব কিসসু নই।

কমলা : (করজোড়ে) মহারাজ! আপনি আমাদের সন্দেহ করবেন না—আমরা

1. রাজা।

দুজনে শিমলুগুরীয়া বরুয়ার মেয়ে। আমাদের দাদা এখনই এসে পড়বেন। ...তা, হ্যাঁ—রাজন্যদেবের ওপর শত্রুদের যেরকম নজর, সে হিসেবে ছদ্মবেশটা খুবই ভালো হয়েছে। রাজা! অনুগ্রহ করে আমাদের পিতৃদেবের খবর বলুন।

গেন্ধেলা : শিমলুগুরীয়া বরুয়া মশাইর খবর? তাঁর খবর মুই এইমাত্র জানি—তিনি কাইল মোকে পথে পাই আপোনাদের দিবার জন্যি এই চিঠিখান মোর হাতে দিসিলেন।

[গেন্ধেলা ধুতির খুঁটে চিঠি খোঁজে। না পেয়ে—হাউহাউ ক'রে কেঁদে ওঠে]

বিমলা : শান্ত হোন রাজা, শান্ত হোন! চিঠি হারিয়েছে তো কী হয়েছে? আপনি উতলা হবেন না। আপনি তো বাবাকে সুস্থ দেখে এসেছেন?

গেন্ধেলা : আহিসি নাতো কী? সুস্থ না থাকেন যদি, তিনি মোকে চিঠিখান দ্যান ক্যাম্‌নে? (ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে, স্বগত) ডাইনীগণ বাণ মারি হাত থিক্যা চিঠিখানা ক্যামনে উড়াই নিলে, দেহিছ! মা জননীগণ! আপোনারা যেঁয়েই হউন না ক্যানে, মুই নিশ্চয় করি কৈসি—মুই রাজা-পরজা কিসসু নই। মুই দুখিয়া সরল মানুস; মোকে আপোনারা পরিহাস করেন না।...(কপালে হাত দিয়ে) উশ্‌স্‌! মোর মাথা কামোড় ধরসে!

কমলা : বিমলা, তুই যা—তাড়াতাড়ি ক'রে রাজার জন্যে এ্যাকটা জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে যায়। আহা, বনে-জংগলে ঘুরে ঘুরে রাজা আমাদের ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।...হ্যাঁ, আগে পাখাটা এনে দে,...রাজাকে একটু হাওয়া করি।

[বিমলা দৌড়ে গিয়ে একটা পাখা এনে কমলাকে দিয়ে, খাবার আনতে যায়। কমলা গেন্ধেলার মাথায় পাখার বাতাস করে। একটু পরে—বিমলা রসপিঠে, গুড়, এবং একবাটি গরম দুধ এনে গেন্ধেলার সামনে রাখে]

বিমলা : (করজোড়ে) মহারাজ! মাটি থেকে উঠে জলচৌকিতে বসুন,...খাবারটা খেয়ে একটু সুস্থ হোন।

গেন্ধেলা : (স্বগত) ক্ষুধা তো পাইসেই। যি সি হউক, খাবারটা খাই লই।...ডাইনদিগের আর সব ধেমলীর মদ্যি এইটাই ভাল হৈসে দেহি!

[গেন্ধেলা পিঠের বাটি টেনে নিয়ে মুখ লাগিয়ে সপ সপ ক'রে খেতে থাকে; গোঁফে রসের পিঠে লেগে গোঁফের চুলগুলো সাদা হয়ে যায়]

বিমলা : (কমলার কানে কানে) দ্যাখ দ্যাখ—মহারাজ ঠিক গাঁইয়াদের মতো চুমুক দিয়ে রসপিঠে খাচ্ছেন।...সত্যি, এরকম অবিকল ভাল মানুষের ছদ্মবেশ না ধরলে চলবেই বা ক্যানো? চারপাশে গুপ্তচররা যেভাবে ছড়িয়ে রয়েছে!

কমলা : বিমলা, তুই একঘটি জল আর সিলফচীটা[1] নিয়ে আয়, যা। মুখ ধুয়ে রাজা একটু বিশ্রাম নিন।

1. হাত মুখ ধোবার পাত্র।

গেন্ধেলা : উঁহুঁ ! মোকে সিলফচী লাগবে না, মোর সোনামুখী ডাইনীগণ ! কুথা পুখর আছে, মোকে দিখাই দিতি কয়েন, মুই মুখখান ধুই আহি গিয়া ।...বলে— 'সাতপুরুষে না হ'ল গাই, দোনা[1] হাতে দুইতে যাই ।' সিলফচী লাগবে না সোন-পাপড়িগণ । এই গামছা দিয়াই আইজের মত মুখখান মুছি নিতি পারি ।

[গেন্ধেলা সুপুরি-বাঁধা গামছায় হাত-মুখ মোছে]

কমলা : বিমলা ! তুই যা না, সিলফচী একটা আর জল একঘটি নিয়ে আয়, মহারাজ মুখ ধোবেন ।

[বিমলা চলে যায়]

গেন্ধেলা : দিতি চায়েন যদি, তামোল-ছালি[2] এ্যাট্‌টা দিয়েন, তাতেই মুখশুদ্ধি করি ।...দেহি, মোর বটুয়াতে তামোল-ছালি আছে বোদয় ।

কমলা : বিমলা ! সুপুরির বাটাটাও নিয়ে আসবি, রাজাকে সুপুরি কেটে দোব ।...মহারাজ ! ক্ষমা করবেন, যদি গান শুনতে ভালবাসেন, দাসী এ্যাকটা গান গেয়ে শোনাতে ইচ্ছে করে ।

গেন্ধেলা : মহারাজ শুনতি ভালবাসেন বা না বাসেন, এই ফোঁপরাধরা শরীরে গেন্ধেলা গায়েন নিশ্চয় শুন্‌তি ভালবাসে । তা, গাতি চায়েন যদি, গুরুজনে করা এ্যাটটা বরগীত[3] গায়েন তবে । মোর গা থিক্যা ডাইনী পালায় যদি, পালাক ।

কমলা : (গান) মোরা পিয়া বিন কৈসে রহঙ্গী, সজনি,
বহুত দিন পর নাহি আওয়ে মেরো ।
নিশি-দিন জাগত, নিঁদ নাহি আওয়ত,
পিয়াকো সন্দেশ কহিঁ নাহি পাওয়ে মেরো ।

গেন্ধেলা : মা জননীর কণ্ঠটি বড় সুরেলা । হবে নাইবা কেনে ?...কিনতুক, কী-যে এ্যাক্‌খান বিদিশি গীত গা'লেন, মুই মহা মুরুখখু—বুইতেই পাইরলম না ।...তা, হ্যাঁ মা জননী ! গীতটিতে সন্দেশের কথা কৈছে, তাই না ? আ ! ...অধমের উদরে রসপিঠাগুলি মাত্র প'ড়ছে ; তার উপরে সন্দেশ এ্যাকবাটি পড়ে যদিবা ; কুথা সামাল দিব মোর ঈশ্বর !...এই (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে) নিঃস্ব নিষ্কিঞ্চনও যে দুই-চারিটা বরগীত না জানে, এ্যামন নয় । ...মা জননী ! এই অকপটিয়া মানুষটাকে গেরামের দশজন গেন্ধেলা গায়েন বুলি বড়-সভায়, বড় পাত্রটি, বড় ডালিটি আগায়ে দ্যায় ।

[গেন্ধেলা সুর-সহযোগে গান ধরে]

1. দুধ দোয়াবার পাত্র ।
2. সুপারি, এবং তার সঙ্গে বা তার বদলে ব্যবহৃত একরকম গাছের ছাল ।
3. শংকরদেব রচিত শাস্ত্রীয় গীত ।

রামকো গোঁসাই করিছে গোহারি।
বহু হৃদি-পঙ্কজ ধাম হামারি ॥

[বাইরে কোলাহল]

কমলা ঃ সর্বনাশ! সর্বনাশ !! স্বর্গদেবের এখানে আসার খবর ল'রা রাজার লোক নিশ্চয় কোনরকমে জানতে পেরে ওঁকে ধরতে আসছে।

[উর্ধ্বশ্বাসে বিমলার প্রবেশ]

বিমলা ঃ কী হবে দিদি! আমরা কী করব? কোথায় যাব এ্যাখন? রাজাকে কোথায় লুকোব?

কমলা ঃ মহারাজ! উঠুন...উঠুন...তাড়াতাড়ি উঠুন। আমাদের এই তাঁতের পাটার তলায় লুকোন।

গেন্ধেলা ঃ মা জননীগণ! এ্যাতো হুড়ুম-দাড়াম লাগাইসেন ক্যান? ভয়ডরে এ্যাতো কাঁপেনইবা ক্যান? রাজার প্যাদা আইসছে তো আইসছে, সে মোর কী-টা কইরবে? মুই কোন দায়-দোষ করি নাই। মুই তো মাত্র গুরুজনে-রচা, গীত-পদ এ্যাট্‌টা গাতিসিলিম; তাতে কার কী অপরাধ হ'ল?...না—মুই তাঁতের পাটার তলে ঢুকতি পাইরব না; তথা, সিখানে পোকা-মাকড়ের কামোড় খাই মর্‌তি পাইরব না—সি তোমাদের ভালো লাগোক অথবা মন্দই লাগোক।

বিমলা ঃ মহারাজ! আমরা জানি, আপনার খুব সাহস। তবু, আমরা অবলা দুই বোন হাতজোড় ক'রে বলছি—আপনি তাড়াতাড়ি তাঁতের পাটার নীচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ুন!···লুকোন!...দেরি করবেন না।

[বিমলা গেন্ধেলাকে হাত ধ'রে টানে]

গেন্ধেলা ঃ এইটা আবার কী উৎপাত! মোকে আজি কিসে পাইছে? ক্যান যে মুই গরুর সদৃশ লোকের চিঠি ব'য়ে আনতি গিসলম—! হে মোর ঈশ্বর! আজি মোকে তুমি কী দুর্গতি কইরলে?

[অতি অনিচ্ছায় গেন্ধেলা তাঁতের পাটার তলে গিয়ে লুকোয়]

কমলা ঃ যা বিমলি, দৌড়ে যা—আমার এণ্ডির বড়ো থানটা নিয়ে আয়; সেইটে তাঁতের পাটার ওপরে দিয়ে রাজাকে ঢেকে রাখি।

[বিমলা দৌড়ে এণ্ডীর একটা বড়ো কাপড় আনে; তাই দিয়ে কমলা গেন্ধেলাকে ঢাকে]

গেন্ধেলা ঃ (তাঁতের পাটার তলা থেকে) মা জননীগণ! মুই যে এ্যাহন সর্দী-গর্মী হয়্যা মরি।...মোকে এইভাবে দম বন্ধ করি মারিয়েন না। নির্ঘাৎ কৈসি—মোকে বধের দায়ীক হ'বেন আপোনারা।...হেই মানুসজন! কে কুথা আসেন, শীঘ্র আইসেন।...এই ডাইনীরা মোকে দমবন্ধ করি মারি ফেলাইসে।

বিমলা ঃ চুপ, চুপ, রাজা! আমাদের মাথা খান...আপনার পায়ে পড়ে বলছি—

[দৌড়ে মঙ্গলার প্রবেশ]

—মঙ্গলা! বাইরে, কতো সৈন্য, কতো লোক আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে?

মঙ্গলা : দিদিমণি গো!...আঁ্যা—কুথাকার সৈন্ন! কার বাড়ি ঘেরাও!...দিদিমণি! এই হেজোটাকে ঘরের ভিতর ঢুকাই কিবা ধেমালিখান পাতিসছেন? এইসব ভালো কথা নয় কিনতুক। বড় দাদাবাবু আহি শুনেন যদি, আমাদের সকলকেই মন্দ বুলবেন—মুই—কিনতুক কৈ দিসছি!

কমলা : তাহলে বাইরে ওটা কিসের গণ্ডগোল?

মঙ্গলা : অ' দিদিমণি! সেই-যে রাতিয়া নামের সেই চোরটা...এই দিনদুপুরে... তোলান শইকীয়ার বাড়িতে সেঁধুই, তোলানের জলখাবার ঘটিটা চুরি করি দৌড় মারিস্ছিল। তাকে ধরবে বুলি গাঁয়ের লোকে সচিৎকারে দৌড় ধরিসছিল।... তাকে ধরলে, আর ধরি, কিলোতে-কিলোতে গুঁড়া করতি লাগিসছে।

গেন্ধেলা : (তাঁতের পাটার নীচে থেকে মুখ বার ক'রে) মা জননীগণ! মুই যে পাচ গে'লম! মুই হেথা আর থাকতি পাইরব না—তা তোমোরা মোকে মারো আর কাটো!

[গেন্ধেলা তাঁতের পাটার নীচে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে]

মঙ্গলা : হেই ভালমানসের পো, বা'র হ'স।...হা দিদিমণি! আপোনারা এই হেজোটাকে এইভাবে শাস্তি-পেহাড করেন ক্যানে?

গেন্ধেলা : মুই আর কী কইব, কী শুইনবা দিদি? শাস্তি-পেহাড বুলি শাস্তি-পেহাড়! ত্যাখন থিক্যা এই দুইজনে মিলি মোকে কী নাজেহাল যে কইরতিসেন—মোকে রাজা বানাইসেন জলচৌকিতে বসাইসেন...। অবশ্যে, জলখাবারটা পেট ভরাই খোয়াইসেন—মিছা কথা ক'ব ক্যান। হ্যা দিদি, ইনিদের ধেমালির ভিতর সেইটাই বেশ ভাল হৈসে!

[গেন্ধেলার গোঁফের গোছা রসপিঠে লেগে শাদা হয়ে রয়েছে দেখে মঙ্গলা হাসে]

মঙ্গলা : বেশ ভাল হইসছে সেই ধেমালিটা—না? বলি, এ্যাই বাঘে-খাওয়া! রসপিঠে লেপটেই ত'র গোঁফ গোছা যে আরও ভাল করি খাড়া হইসছে!

গেন্ধেলা : মা জননীগণ! এইয়া—সেই হেরানো চিঠিখান—!

[হাত বাড়িয়ে বিমলাকে দেয়]

—মোর ধুতির বাম খুঁটেতে ছিল, আর মুই ডাইন খুঁট খুঁজি হয়রান হয়্যা মইরলম!

[কমলা ও বিমলা দুজনে শশব্যস্তে চিঠিটা পড়ে]

কমলা ও বিমলা :

"কল্যাণীয়াসু,

আমি আমাদের রাজা গদাধর স্বর্গদেবের সন্নিকটেই আছি। দুই-একদিনের ভিতরে গৌহাটির দিকে যাইব। সেখানে, বড় ফুকনের[1] নিকটে

1. প্রধান রাজকর্মচারী

সাহায্যের প্রত্যাশায় যাইব। যদি প্রাপ্তিযোগ ঘটে, তাহা হইলে অচিরে তোমরা আমাকে পুনরায় এখানে দেখিতে পাইবে। সকলই ঈশ্বরের উপর নির্ভর।

তোমরা সাবধানে থাকিবে। এই পত্রবাহককে একটি টাকা দিয়া বিদায় করিবে।

ইতি—
তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,
পিতা।

[পত্র-পাঠ কমলা ও বিমলা দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে]

॥ যবনিকা ॥

চিরন্তন

অনিল চৌধুরী

চরিত্রাবলী ঃ

অঞ্জন

প্রকাশ

নেওগ

দীপ

জেউতি

প্রাসঙ্গিক

1952। মূল স্বত্ব—শ্রীঅনিল চৌধুরী, উলুবাড়ি, গৌহাটি-৮। চৌধুরীর অন্য নাটক 'প্রতিবাদ', 'মানিক রাইটিং' ইত্যাদি। শেষেরটি একজন খাসিয়া সাধুকে অবলম্বন ক'রে লেখা। লেখক অভিনয় করেন।

প্রথম দর্শন

[অঞ্জনের বাড়ি। ভাড়া-বাড়ি। সময় অপরাহ্ন। পট উঠতে দেখা যায়— অঞ্জনের বাড়ির একটা ঘর ; অতি সাধারণভাবে সাজানো। অতিথি-সজ্জন এলে এইটেতে বসানো হয়। আসবাবপত্র যদিও দারিদ্র্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তবু ঘরটির সাজ-সরঞ্জামের পারিপাট্য সুরুচির পরিচায়ক। এই ঘরের পেছনে আর একটা ঘর দেখা যায়। একপাশে বারান্দা। মাঝের দরজা খোলা থাকায় দ্বিতীয় ঘরটির ভেতরের অনেকখানি অংশ দেখা যায়—একটা বিছানা, গুটিয়ে-রাখা মশারী, একটা আলনায় দু-একখানা কাপড, দুটো পুরনো ট্রাঙ্ক।

বাড়িটীর তিনখানা ঘর। সামনের ঘরের বাঁদিক (দর্শকের বাঁদিক) ঘেঁষে আরও একটা ঘর আছে ; তার দরজা ছাড়া, বাইরে থেকে, আর কিছুই দেখা যায় না। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রম-অন্বয়ে বিকেলের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পরে রাত হবে। (আলোক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দেখানো যেতে পারে)

দ্বিতীয় ঘরটির পেছনের দরজা আর খিডকী দিয়ে বৈকালী সূর্যের শেষ রক্ত-রশ্মি এসে মেঝের উপর পডেছে। বিছানার ওপর জেউতিকে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। কোথা থেকে ভেসে আসা বেহালার একটা মৃদু করুণ সুর শোনা যায়। সেই আবহ-সংগীতের সুর পরিবেশকে করে তুলেছে গম্ভীর।

একটু পরে, বাঁ পাশের ঘর থেকে অঞ্জন সন্তর্পণে প্রথম ঘরটিতে প্রবেশ করে। একপা-দুপা ক'রে বিছানার মাথার দিকে, জেউতির কাছে যায়। অঞ্জন অসুস্থ। চুল এলোমেলো। জেউতির মাথার কাছে এসে তার মুখের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই জেউতি মুখ থেকে আঁচলটা টেনে এনে বুকের মধ্যে গুঁজে দেয়। অঞ্জন চমকে ওঠে তাই দেখে, সভয়ে এক পা পিছিয়ে যায়। নেপথ্যে বেহালার সুর তীব্র হয়ে ওঠে। অঞ্জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ধীরে ধীরে এসে, প্রথম ঘরের বারান্দার দিকের দরজার কাছে দাঁড়ায়। অঞ্জনের শরীরের পাশ দিয়ে বাইরের এক অংশ দেখা যায়।

ঘুমন্ত জেউতি 'উঃ আঃ' ব'লে ছটফট ক'রে ওঠে। অঞ্জন দ্রুত জেউতির কাছে আবার আসে। অঞ্জন জেউতির মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার কপালে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে থমকে যায়। বেহালার তীব্র সুর মাঝপথে হঠাৎ থেমে যায়। অঞ্জন জেউতিকে ডেকে তার ঘুম ভাঙাতে চায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে, জেউতির কপালের কাছে নিজের মুখখানা নিয়ে গিয়ে আকুলভাবে চেয়ে থাকে। ঘুমের মধ্যেই জেউতি কী-যেন ব'লে ওঠে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অঞ্জন জেউতির মুখের কাছ থেকে নিজের মুখখানা ধীরে

ধীরে সরিয়ে আনে। এইবার জেউতি হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার ক'রে উঠে বসে। পাগলের মতো ইতি-উতি চায়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে—]

জেউতি : না, না,—হতে পারে না।

অঞ্জন : কী হতে পারে না, জেউতি ?

জেউতি : (অঞ্জনকে দেখতে পেয়ে ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধ'রে বুকে মাথা রেখে শুধু উচ্চারণ করে—) অঞ্জন !

অঞ্জন : জেউতি—

[বুকের মধ্যে থেকে জেউতিকে প্রায় জোর ক'রে সরিয়ে দিয়ে অঞ্জন, প্রথম ঘরে চ'লে আসে। জেউতি ব্যাকুল হ'য়ে অঞ্জনকে অনুসরণ করে]

জেউতি : অঞ্জন...স'রে যেও না। আমার...আমার (অঞ্জনের হাত ধরে)—কী ব্যাকুলতায় যে আমার বুক কেঁপে উঠছে।

অঞ্জন : ডাক্তারে বলেছে, আমার টি-বি হয়েছে। এতো কাছে এসো না, সোনা !

জেউতি : আমার স্বপ্ন যদি সত্যি হয় ?

অঞ্জন : কী স্বপ্ন জেউতি ? (হাসার চেষ্টা ক'রে বলে) সারাটা রাত আমার জন্যে জেগে থেকে এই অবেলায় শুয়েছো। ভালো ঘুম হয়নি। সেই জন্যেই স্বপ্ন দেখেছো। সে-স্বপ্ন আবার সত্যি হতে যাবে কেন জেউতি ?

জেউতি : তুমি তো সবই জানো। তবু কেন প্রকাশকে ডেকে পাঠালে ?

[অঞ্জন প্রথমে কোন উত্তর না দিয়ে জেউতির কাছ থেকে সরে যায়, তার পরে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করে]

অঞ্জন : কেন আমি প্রকাশকে ডেকে পাঠালাম ? ...কেন ডেকে পাঠালাম প্রকাশকে ?

জেউতি : অঞ্জন !

অঞ্জন : আজ ন' বছর তোমার সঙ্গে সংসার করছি। এই ন'টা বছর প্রকাশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিনি। অথচ, আজ আমি নিজেই প্রকাশকে কেন ডেকে পাঠালাম—কেন !!

জেউতি : (কাছে এসে) অঞ্জন !

অঞ্জন : শুনবে জেউতি, প্রকাশকে কেন আমি ডেকে পাঠালাম ? শুনবে ?

জেউতি : অঞ্জন !

অঞ্জন : মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি বুঝেছি—হ্যাঁ জেউতি, আমি বুঝেছি—নিজেকে আমি ভালবাসি।

জেউতি : অঞ্জন !

অঞ্জন : তিনটে জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমার ওপর। জেউতি—আমার তো মরলে চলবে না। আমি চিকিৎসা করাব। ভাল হব। সেই জন্যেই প্রকাশকে—

[উত্তেজনার বশে অঞ্জন কেশে ওঠে। অঞ্জনের কাশির মধ্যেই জেউতি আকুল হয়ে বলে—]

জেউতি : তুমি ভালো হবে—তুমি ভালো হবে অঞ্জন—

অঞ্জন : ডাক্তার বলেছে—অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এবং উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আমার টি-বি হয়েছে। কিন্তু কেন—কেন আমার এমন হতে যাবে?...এই কেন'র উত্তর আমার চাই, জেউতি।

জেউতি : আমাকে ক্ষমা করো অঞ্জন। এ হয়তো আমার দুর্বলতা। হয়তো সেই দুর্বলতার জন্যেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।...কিন্তু তবু, আশ্চর্য সেই স্বপ্ন!

অঞ্জন : জেউতি!

জেউতি : সেই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে দেখলাম, আমাদের প্রত্যেকের অবচেতন মনের উৎকট প্রকাশ!...এবার যেন প্রকাশ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে—

অঞ্জন : প্রকাশ!

জেউতি : হ্যাঁ, প্রকাশ—ঠিক সেই সময়েই বাধা জন্মাল—

অঞ্জন : হুঁ—তারপরে জেউতি? বলো, তারপরে—

জেউতি : অঞ্জন, আমি যে—না না অঞ্জন, আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না—সেই ভয়ংকর স্বপ্নের কথা আমি বলতে পারব না। সে যে আমার—না না অঞ্জন, আমাকে ক্ষমা করো।

[হঠাৎ উত্তেজনায় দুহাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। জেউতির যাবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অঞ্জন বলে—]

অঞ্জন : মিথ্যে,—মিথ্যে, সব মিথ্যে। তুমি স্বার্থপর। সেই স্বার্থপরতাই তোমার চিন্তাধারাকে বিকৃত করে তুলেছে; আর সেই বিকৃত চিন্তাধারা থেকেই তোমার এই স্বপ্নের সৃষ্টি। (কাশে) তুমি—স্বার্থপর না হলে, আমার বেঁচে থাকার চেষ্টায় ভয় পেয়ে এই স্বপ্ন দেখতে না। আমি তো কোন অন্যায় করিনি, আমি—আমি—

[জোরে কেশে ওঠে। কাশতে কাশতে ভেঙ্গে পড়ে। এই সময়ে 'মা মা' বলে ডাকতে ডাকতে বাইরে থেকে আট বছরের দীপ প্রবেশ করে। হাতে একখানা দরখাস্ত]

দীপ : মা, মা! (বাবাকে দেখে) বাবা—বা—বা—!

অঞ্জন : (প্রকৃতিস্থ হয়ে দীপের দিকে ক্ষণেক চেয়ে) হুঁ—কিছু হয়নি। তুই যা এখান থেকে।

[দীপ অবাক হয়—এদিক-ওদিকে নিরুপায়ভাবে চেয়ে একপা-দুপা ক'রে ভেতরের দিকে এগোতে থাকে]

অঞ্জন : দীপ!

[দীপ থমকে দাঁড়ায়, বাবার দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। অঞ্জন দীপের কাছে এসে বলে—]

অঞ্জন : ওটা কী ?

[জেউতি গম্ভীরমুখে প্রবেশ করে। পরনে সেই আগেরই সাজ]

জেউতি : দীপ, এদিকে আয়।

দীপ : (কাছে গিয়ে, ভয়ে-ভয়ে একবার বাবার দিকে চেয়ে) মা, এই টাকা একটা দিয়েছে। আর এই দরখাস্তটা। নিলে না, বললে যে—

জেউতি : (বাধা দিয়ে) ভেতরে আয়।

[টাকাটা নেয়। দীপকে টেনে ভেতরে নিয়ে যাবার উপক্রম করে]

অঞ্জন : জেউতি, ওটা কিসের দরখাস্ত ?

জেউতি : জেনে কী লাভ ?

অঞ্জন : দীপ !

[দীপ কিংকর্তব্যবিমূঢ়]

জেউতি : দীপ, আমি ওই ঘরে আছি, তুই আয়।

[জেউতি চলে যায়]

দীপ : বাবা, মা কি রাগ করেছে ? আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি মিছে কথা বলিনি। তুমি বিশ্বাস করো। আমি রমেনের বাবাকে দিয়েছিলুম।

অঞ্জন : (সস্নেহে হাত বুলিয়ে) কী দিয়েছিলি দীপ ?

দীপ : মার দেওয়া এই দরখাস্তটা।

অঞ্জন : (দরখাস্তে চোখ বুলিয়ে) হুঁ ! রমেনের বাবা কী বললেন ?

দীপ : বললেন—এখন তো তাঁর অফিসে মেয়েদের কাজ খালি নেই। রাগ ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অঞ্জন : আর পয়সা ?

দীপ : রমেনের মা দিয়েছে। বুলুর ফ্রক সেলাই করে দেওয়ার জন্যে। কেন বাবা, তুমি জানো না, মা ফ্রক সেলাই করে দিয়ে পয়সা নেয় ! আমরা খুউব গরীব, না বাবা ?

অঞ্জন : দীপ, তুই যা সোনা, ভেতরে যা।

দীপ : বাবা, তোমার নাকি খুব খারাপ অসুখ করেছে ? মার স্কুলের চাকরিটা নাকি সেইজন্যেই গেছে ?

অঞ্জন : কে বলেছে—মিছে কথা !

[অসুখের কথা বলায় অঞ্জন যেন নিজের অজ্ঞাতেই ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে]

দীপ : আমিও বলেছি, মিছে কথা। কিন্তু রমেন বললে—তোমার নাকি খুব খারাপ অসুখ হয়েছে—তোমার থেকে নাকি আমারও হবে।

অঞ্জন : (চেঁচিয়ে ওঠে) মিছে কথা—মিছে কথা। রমেন নিশ্চয়ই ওর মা-বাবার কাছ থেকে এইসব শুনেছে। সব মিথ্যে কথা—

[উত্তেজনায় কেঁদে ওঠে, কথা বলতে পারে না]

দীপ : (অঞ্জনের কাশির মাঝখানে ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকে) বাবা ! বাবা !!

অঞ্জন : (দীপকে চোখ রাঙিয়ে) রমেন কি ক'রে জানলে ?

[আবার কাশে]

দীপ : (কাঁদ কাঁদ মুখে) বাবা। তুমি রেগে গ্যাছো। আমি তো বলিনি।

অঞ্জন : (প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করে) হুঁ ! না, না—আমি তোর ওপর রাগ করি নি সোনা। ভেতরে যা। আমার সত্যিই খুব খারাপ অসুখ করেছে। সেই জন্যেই তো আমি তোকে আমার ঘরে যেতে বারণ করেছি। তোর মাকেও বলেছি আমার কাছে না আসতে। যা, তুই যা।

[গায়ে হাত দিয়ে ঘর থেকে প্রায় বারই করে দেয়। দীপ চলে যায়। নিজের শরীরে একবার চোখ বুলিয়ে বলে—]

—খারাপ অসুখ—আমি মরব—আমি মরে যাব। না—না—(হঠাৎ কী ভেবে ডাকে)—দীপ, দীপ।

[দীপ, আবার আসে। দীপের একটা হাত ধরে মঞ্চের একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—]

—ওরা তোকে আর কী-কী বলেছে ?

দীপ : (বিমূঢ় হয়ে পড়ে যেন) রমেন আর বুলুর সঙ্গে আমাকে খেলতে মানা করেছে ; খেললে, ওর বাবা নাকি রাগ করবেন।

অঞ্জন : (আবার উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে) কেন—কেন রাগ করবে ? —কেন খেলতে দেবে না ? —কেন, বলছ না কেন ?

দীপ : (ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে) বাবা !

[জেউতি দৌড়ে আসে]

জেউতি : দীপ।

দীপ : মা—

[দীপ ছুটে গিয়ে মার বুকে আশ্রয় নেয়। জেউতিকে দেখে অঞ্জন দীপকে ছেড়ে দিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে শূন্যতা। জেউতি দীপকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আদর করতে গিয়ে হঠাৎ হু-হু করে কেঁদে ফেলে। পর-মুহূর্তে সংযত হয়ে দীপকে বলে—]

জেউতি : দীপ, ভেতরে চল—

[পা বাড়ায়]

অঞ্জন : জেউতি—

জেউতি : দীপ, তুই ভেতরে যা, আমি আসছি।

[দীপ যায়। জেউতি ঘুরে অঞ্জনের দিকে চায়—চোখে-মুখে, কান্নার বদলে, ফুটে ওঠে কঠোর ভাব]

অঞ্জন : প্রকাশকে ডেকে আমি কোন খারাপ কাজ করিনি। মানুষের দোষ-ত্রুটি ভুলে গিয়ে কাছে টেনে নেওয়া অন্যায় হতে পারে না।

জেউতি : অঞ্জন! জীবনকে তুচ্ছ ক'রে তুমি যদি অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিতে, তখনও আমি কাঁদতাম ; কিন্তু সেই কান্নায় থাকত—

অঞ্জন : (জেউতিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে, চেঁচিয়ে ওঠে) তুমি স্বার্থপর !

জেউতি : হ্যাঁ—আমি স্বার্থপর।

অঞ্জন : হ্যাঁ—তুমি দুর্বল, সেন্টিমেন্টাল—

জেউতি : স্পর্শকাতরতা বড় পবিত্র অনুভূতি অঞ্জন। বেঁচে থাকার মোহে সেকথা তুমি ভুলে গ্যাছো। আশীর্বাদ করো, আমি যেন আমার ভাবপ্রবণতা নিয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারি।

অঞ্জন : খুব হয়েছে! তোমার নাটকীয় সংলাপ আমি শুনতে চাইনি। শুধু এইটুকু জেনে যেও—আমি কোন অন্যায় করিনি। ...আজ না হলেও, একদিন প্রকাশ আমার বন্ধু ছিল। অতীতের সেই দাবির জোরে আমি যদি তার কাছ থেকে একটু সাহায্য নি, কোন অন্যায় হয় না। অন্তত ধার হিসেবেও—

জেউতি : হৃদয়ের বিচারে যুক্তি দিয়ে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়, অঞ্জন। প্রকাশের কথা তুমি ভালো করেই জানো।

অঞ্জন : জানি, জানি, সব জানি। (হঠাৎ থেমে গিয়ে, যেন হতাশ হয়ে ধীরে ধীরে স্বগত উক্তি করে) হুঁ, জানলে কী হবে! সমাজ তৈরি করে নীতি কথার, কিন্তু মেনে চলার উপায় রাখে না। কেন তুমি আমার জন্যে অতো চেষ্টা করেও একটা 'সীট' পেলে না? কেন তোমার বিদ্যে থাকতে, খাটবার ক্ষমতা থাকতেও দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পাও না? কেন অতিরিক্ত পরিশ্রমে, আর প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে আমার অসুখ করে? কেন? (আবার উত্তেজিত হয়) কেন বেঁচে থাকার জন্যেও অন্যায় ব্যাকিং-এর দরকার হয়?...নীতিকথা...তার পরেও নীতিকথা?

জেউতি : তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।...দুর্নীতিকে ঠেকাবার জন্যেই নীতির দরকার—বেঁচে থাকার মোহে এই সত্যটা তুমি ভুলে গ্যাছ।

অঞ্জন : বেশ, বেশ—পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবী পরিবর্তনশীল।

জেউতি : আমার আজকের এই বিশ্বাস তোমারই দান, অঞ্জন।

অঞ্জন : সেকথা আজ মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।

জেউতি : আমার দুর্ভাগ্য!

অঞ্জন : (জেউতির কাছে গিয়ে বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে) জেউতি, তুমি কি আমার বিবাহিতা স্ত্রী নও? অথচ তুমি আজ আমার মৃত্যু কামনা করছ!

জেউতি : অঞ্জন! অঞ্জন! তুমি!!—বেশ (অসীম ক্লান্তিভরে) ঠিক আছে অঞ্জন, আমার ঘাট হয়েছে, ক্ষমা চাইছি। তুমি—হ্যাঁ—তুমি যা ভালো বোঝো, করো।

আমি আর বাধা দেব না। শুধু, একটা অনুরোধ অঞ্জন, প্রকাশ যদি আসে, আমাকে সামনে ডেকো না। বোলো—

অঞ্জন : কেন, তার সামনে এলে কী হবে? মিষ্টি করে হেসে কথা বলবে...অথচ দূরত্বটুকুও বজায় রাখবে।...আমার কাজ হলেই হলো।

জেউতি : তাই বুঝি?...যে মানুষ জীবনকে সত্যিই ভালবাসে, তার প্রকাশ কি এইরকম হতে পারে! এ তোমার জীবনের প্রতি মমতা, নাকি সম্পূর্ণ উলটো প্রবৃত্তি? বলো অঞ্জন, আজ তোমায় আমাকে বলতেই হবে—

[অঞ্জনের বাহু ধরে উত্তেজনায় ঝাঁকি দেয়; অঞ্জন জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নেয়]

অঞ্জন : ছাড়ো—তোমার হাই ফিলজফী আর ভালোলাগে না।

[রাগান্বিতভাবে প্রস্থানোদ্যত]

জেউতি : কোথায় যাচ্ছ অঞ্জন?

অঞ্জন : ডাক্তারের কাছে।

জেউতি : তুমি! হেঁটে?

অঞ্জন : আমার যে পয়সা নেই, আমি যে গরীব, সেকথা নতুন করে বলতে হবে নাকি?

[অঞ্জনের কথার খোঁচার আঘাত জেউতি সহজভাবে হজম করার চেষ্টা করে; অঞ্জনের পথ আগলে মিনতির সঙ্গে বলে—]

জেউতি : তুমি যাবে কেন? আমি যেমন যাই, তেমনি যাব।

অঞ্জন : সরে যাও দেখি, ভালো লাগছে না। দুনিয়ায় আমি যখন একলা, তখন নিজেকেই নিজের কাজ করতে হবে। (প্রায় জোর করেই চলে যায়। বলতে বলতে যায়)—হ্যাঁ, যে কদিন বেঁচে আছি, নিজেই নিজের কাজ করব।

[জেউতি ক্ষণকাল তন্ময় হয়ে থাকে। নিজের অজান্তেই 'হুঁ' বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তারপরে, হঠাৎ কী-যেন মনে পড়ায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ডাকে—]

জেউতি : দীপ! দীপ!

[দীপ আসে]

দীপ : কী মা?

জেউতি : দীপ, সোনা, যা তো, তাড়াতাড়ি যা। পথে বাবাকে দেখতে পাবি। এই টাকাটা দিয়ে বলবি—মা তোমাকে রিকসা ক'রে যেতে বলেছে। মাথার দিব্যি দিয়েছে। যা, তাড়াতাড়ি যা।

[আঁচল থেকে টাকাটা বা'র ক'রে দীপের হাতে দিয়ে অধীরভাবে তাকে এগিয়ে দেয়। দীপ চলে যায়। ফিরে এসে জেউতি ক্ষণকাল নিশ্চল হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার কাছে ; নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করার চেষ্টা করে ; পারে না। বিছানায় মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে ওঠে। সে-কান্না যেন আজ আর থামবে না। এইভাবে কিছু সময় পার হয়ে যায়। আস্তে আস্তে কান্নার শব্দ কমে আসে ; ফোঁপানীর শব্দ শোনা যায়। গোটা দেহটা কেঁপে কেঁপে ওঠে]

দীপ : (বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে) —মা-মা !

[দীপের গলা শুনে জেউতি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। পাছে দেখে ফেলে, তাই দীপের দিকে পিছন ফিরে চোখের জল মোছে। সঙ্গে সঙ্গে দীপ আসে]

জেউতি : (সংযত হবার চেষ্টা করতে করতে) দিলি দীপ ? পয়সাটা দিলি— ?

দীপ : দিয়েছিলুম মা, বাবা নিলে না।

জেউতি : নিলে না ?

দীপ : আমাকে ধমকে পাঠিয়ে দিলে। এই যে—

[টাকাটা ফিরিয়ে দেয়। জেউতি নেয়। জেউতি আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দীপ ভেতরে যাবার জন্যে ইতস্ততঃভাবে এগিয়ে গিয়ে, আবার ফিরে এসে ভয়ে ভয়ে বলে—]

দীপ : মা !

জেউতি : (ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার মতো) অ্যাঁ—কী ?

দীপ : ছটা পয়সা দেবে ? সদর দরজার কাছে আখের রস বিক্রী করছে, আনব।

জেউতি : এই নে।

[টাকাটাই দিয়ে দেয়। খুশিতে ডগমগ দীপ গ্লাশ আনতে ভেতরে দৌড়য়। জেউতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দীপ ভেতর থেকে গ্লাশ এনে মার কাছ থেকে স'রে বাইরে বেরিয়ে যায়। হঠাৎ কী একটা লক্ষ্য ক'রে জেউতি ছটফট ক'রে ওঠে, দরজার দিকে মুখ ক'রে ডাকে—]

—দীপ ! দীপ !

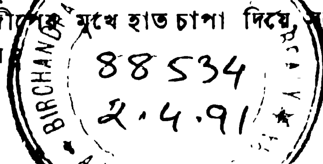
[দীপ ফিরে আসে। জেউতি দীপের হাত থেকে গ্লাশটা ছিনিয়েই নেয়]

এটা তোর বাবার গ্লাশ। অন্য একটা নিয়ে যা।

[জেউতি দীপকে অন্য গ্লাশ আনতে ব'লে নিজেই ভেতরে গিয়ে আর একটা গ্লাশ এনে দীপকে দেয়। বাইরের দিকে পা বাড়িয়েও, হঠাৎ কী ভেবে দীপ দাঁড়িয়ে পড়ে ; একটুক্ষণ ভাবে ; মার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে—]

দীপ : মা, বাবার কী অসুখ করেছে ? বাবার গেলাসে খেলে আমারও হবে ?

জেউতি : (তাড়াতাড়ি দীপের মুখে হাত চাপা দিয়ে, সস্নেহে) ছিঃ দীপ, বলতে নেই। তোর কেন হবে



দীপ ঃ মা, বাবা যদি আর ভালো না হয় ?

জেউতি ঃ দীপ !

দীপ ঃ বাবা আমাকে কাল কী বলছিল, জানো মা ? বলছিল—বাবা মরে গেলে তোমাকে যেন খুব যত্ন করি ; আর আমি যেন খুব মন দিয়ে পড়াশোনা ক'রে বড় মানুষ—ডাক্তার—মা, ডাক্তার হতে বলেছে। ডাক্তার হয়ে রোগীদের খুব যত্ন করতে বলেছে।

জেউতি ঃ (কোনরকমে কান্না রোধ ক'রে, সস্নেহে) দীপ, সোনা আমার, যা, কিনে আন গিয়ে। দেরি হলে লোকটা চলে যাবে।

দীপ ঃ দাঁড়াও না, যাচ্ছি। ...মা, তুমি রাজার কাছে যাওনা কেন ?

জেউতি ঃ (বিস্মিত হয়ে) রাজা !

দীপ ঃ আমরা খুব গরীব, না মা ?

জেউতি ঃ হ্যাঁ সোনা, আমরা গরীব।

দীপ ঃ তাহলে ঠিক হবে মা। আমাদের দেবে।

জেউতি ঃ (বিস্মিত হয়ে) কী দেবে ?

দীপ ঃ টাকা-পয়সা দেবে। ...জানো মা, আমাদের বইয়ে লেখা আছে—রাজা অশোক ছদ্মবেশ ধ'রে এক দুঃখীর ঘরে গিয়েছিলেন। আর তাদের দুঃখ দেখে রাজা অনেক ধনরত্ন দিয়েছিলেন। মা, তুমিও আমাদের রাজাকে বাবার অসুখের কথা বলো না কেন ?

জেউতি ঃ (ম্লান হেসে) রাজাকে ?

দীপ ঃ তুমি বিশ্বাস করো মা, আমি মিথ্যে বলিনি। আমি এখনই বই এনে তোমাকে—

জেউতি ঃ (বাধা দিয়ে) বই আনতে হবে না, দীপ। আজকাল ও সেরকম রাজা নেই যে ! এখনকার রাজারা অন্য ধরণের। ...সেইরকম অন্য ধরণের একজন রাজা হয়তো আমাদেয় বাড়ি আজই আসবে।

দীপ ঃ আসবে। খুব ভালো হবে (খুশিতে জোরে হেসে ওঠে) মা—ডেকেছো রাজাকে ? রাজাকে তুমি কী বলবে মা ?

[জেউতি ক্ষণকাল দীপের মুখের দিকে বেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। একটু-একটু ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। নিজেকেই যেন বলে—]

জেউতি ঃ বলব—আমি কর্তব্যে অবহেলা করিনি, কোন অন্যায় করিনি।

দীপ ঃ টাকা চাইবে না কেন মা ! অন্তত আমার জন্যেও চেয়ো। ...জানো মা, রমেনকে ওর বাবা কাল একটা নতুন শার্ট দিয়েছে। এ্যা—তো সুন্দর !

[দীপের কথায় জেউতি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ; গম্ভীরভাবে বলে—]

জেউতি ঃ তুই যা দীপ, পা চালিয়ে যা।

দীপ ঃ দাঁড়াও না, যাব তো। ...রাজার কথা বলো না, মা।

জেউতি ঃ যা দীপ, লোকটা বোধহয় চলেই গেল।

[দীপ বাইরের দিকে একবার চায়, তারপর বলে—]

দীপ ঃ এঃ, চলে গেছে বোধহয়। যাক্ গে! ...মা, রাজা দেখতে কিরকম? কী নাম? তোমাকে চেনে?

[দীপের প্রশ্নে জেউতি ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ে। আত্মগোপন করার জন্যে, কাজের অজুহাতে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। পিঠের দিক থেকে মার কাছে গিয়ে আঁচল ধ'রে মাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দীপ বলে—]

—বলো না মা, আর কী দেবে?

জেউতি ঃ উঃ! ...আমার...আমার মাথা দেবে। যা বলছি এখান থেকে, যা।

[ধৈর্য হারিয়ে চড় মেরে দেয় দীপকে। হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে মার খেয়ে দীপ বোবা হয়ে যায়, মার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুহূর্তপরে কেঁদে ওঠে]

—দীপ! দীপ!

[ব্যাকুলভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরে দীপকে। স্নেহের স্পর্শ পেয়ে দীপের মন অভিমানে উথলে ওঠে। মার বুক থেকে নিজেকে জোর ক'রে ছাড়িয়ে সরিয়ে নিয়ে সেইভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে—]

দীপ ঃ থাক, আমাকে আর তোমার আদর করতে হবে না।

[ব'লেই, দীপ চলে যায়]

জেউতি ঃ দীপ।

[দীপের যাওয়ার দিকে জেউতি তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে। দুঃখে তার বুক ফেটে যায়; বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়; দুচোখ বেয়ে নেমে আসতে চায় জল। তবু জোর ক'রে সংযত হতে চায়। মুখটা বিকৃত হয়ে পড়ে। কণ্ঠ দিয়ে বিড়বিড় ক'রে বেরোতে থাকে—]

—অভিমান! হতভাগী! কিন্তু কার ওপর? (বলতে ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে) রাজা! অ—শো—ক রা—জা...আর, প্রকাশ রা—জা...রা—জা...

[সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে অঞ্জন, প্রকাশ আর নেওগ আসে। অঞ্জন বলতে বলতে ঢোকে]

অঞ্জন ঃ জেউতি, প্রকাশ এসেছে। জেউতি, প্র—

জেউতি ঃ অ্যাঁ! রাজা এসেছে? দীপ—দীপ—রাজা—

[অঞ্জন ভয় পায়]

অঞ্জন ঃ জেউতি! জেউতি! তুমি কী বলছো?

জেউতি : (অঞ্জনের ডাক শুনে প্রকৃতিস্থ হয়) অ—তোমরা ? ব'স...ব'স। আমি এখনই আসছি।

[বেগে প্রস্থান]

প্রকাশ : অঞ্জন। জেউতির—

অঞ্জন : হ্যাঁ প্রকাশ, অভাব অনিদ্রা ভাবনা চিন্তা, সব একসঙ্গে যেন জেউতিকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে। সেইসব নিয়েই কিছু ভাবছিল হয়তো। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) হয়তো ও নিজেকে সামলে নেবার জন্যেই একটুক্ষণের জন্যে আড়ালে গেছে।

প্রকাশ : ঠিক—অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট করে।

[জেউতি ফিরে আসে। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নেওগকে হাত তুলে নমস্কার জানায়। নেওগ, তার সঙ্গে প্রকাশও নীরবে হাত তোলে]

জেউতি : বসুন।

নেওগ : বসব বৈকি ! আপনি ব্যস্ত হবেন না।

[প্রকাশ ও নেওগ বসে। অভিনয়ের সুবিধা অনুযায়ী দাঁড়াবে মাঝে-মধ্যে। জেউতির সামনে অঞ্জন অস্বস্তি বোধ করে, কৈফিয়ৎ দেবার মতো ক'রে বলে]

অঞ্জন : জেউতি, এঁরা মা—নে, মিঃ নেওগ আর প্রকাশের সঙ্গে পথে দেখা হল।

নেওগ : হ্যাঁ—পথেই দেখা হল। অবশ্য, আমরা আপনাদের এখানেই আসছিলুম। এখানে আসার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিলুম।

প্রকাশ : (নেওগের দিকে তির্যক চেয়ে) হ্যাঁ জেউতি, নেওগ ঠিকই বলেছে—অঞ্জনের অসুখের খবর পেয়ে বাড়িতে থাকতে পারলুম না।

জেউতি : ধন্যবাদ !

নেওগ : ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে, মিসেস ? এ হল মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য। তার ওপর, অঞ্জন ছিল প্রকাশের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভাগ্যবিপর্যয়ে যদিও আজ দুজনের মধ্যে—

জেউতি : সে সব কথা থাক। আমি জানি। আচ্ছা, আপনারা বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা—

[জেউতি ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়]

অঞ্জন : জেউতি !

[জেউতি দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রকাশ জেউতির কাছে গিয়ে গভীর সুরে বলে]

প্রকাশ : থাক জেউতি, চা আনার নাম ক'রে তোমার অড়ালে যাবার দরকার নেই। তাছাড়া, আমরা পথে রেস্তোরাঁয় খেয়ে এসেছি।...জেউতি, অঞ্জনের

শক্ত অসুখ। এই দুর্যোগের সময়ে নানান ছলে দূরে না গিয়ে শত্রু-মিত্র একজোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

[জেউতি কোন উত্তর দেয় না। প্রকাশ হাসবার চেষ্টা করে। আবার নিজেই বলে—]

—জেউতি, আমাদের সহজ হবার চেষ্টা করা উচিত। আমার বিশ্বাস—আমরা অতীতের সব তিক্ততার কথা ভুলে গিয়ে আবার মিলেমিশে চলতে পারব। পারা উচিত। আর, সেই আশা করেই আমরা আজ এসেছি। এই বিপদের দিনে যে-অধিকারের দাবি নিয়ে আমি এসেছি, তুমি নিশ্চয়ই তাতে বাধা দেবে না। অবশ্য, সে-অধিকার তুমি না দিলেও অতীতের বন্ধুত্বের সূত্রে, তা আমি আদায় করে নোব। কারণ, অধিকার অনেকখানি নির্ভর করে যে দাবি করছে তার ওপর।

[জেউতি এতক্ষণ সংযত হয়েছিল, এবং থাকার চেষ্টাও করছিল। কিন্তু প্রকাশের মুখে অতি-অন্তরঙ্গতার কথা শুনে হঠাৎ যেন অস্বস্তি অনুভব করে, তার কথার মধ্যে প্রকাশ পায় উষ্ণতা]

জেউতি : আরও একটু স্পষ্ট ক'রে বলো। মনোহরণ শব্দ বড় অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে।

[জেউতির কথায় আঘাত পেয়েই যেন অঞ্জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে এসে বসে। প্রকাশ বলে যেতে থাকে অনুযোগের সুরে]

প্রকাশ : হুঁ! ইচ্ছে করে অবুঝ হলে উপায় কী? আমি কিন্তু সরলভাবেই—

অঞ্জন : মানে, মা—নে জেউতি, তুমি বুঝতে পারছ না? মানে—প্রকাশ আমাকে ভালো করে তোলার সব দায়িত্ব নিতে চাইছে।

জেউতি : আমার পক্ষে তার চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে অঞ্জন? তাছাড়া, ডেকে এনে বাধা দেওয়ারও কোন অর্থ হয় না।

প্রকাশ : (বসা-অবস্থায় মুখ নীচু ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তির মতো আস্তে আস্তে বলে) হায়, অতীতকে তুমি ভুলতে পারো নি। এতো ক'রে বলা সত্ত্বেও অতীতের তিক্ততাটাকেই তুমি বড় ক'রে তুলতে চাইছো।

জেউতি : অতীতকে ভুলতে না-পারাটা কি খুব অন্যায়?

অঞ্জন : জেউতি—তুমি! তুমি!!

জেউতি : ঠিক আছে; আমি ক্ষমা চাইছি।

[প্রকাশ উঠে জেউতির কাছে যায়]

প্রকাশ : জেউতি, তুমি তোমার স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করো না?

জেউতি : (হঠাৎ মার খেয়ে চমকে ওঠার মতো)—প্রকাশ, মাত্রাজ্ঞান—(কী ভেবে হঠাৎই থেমে যায়। অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বলে) দুর্বলতাকে, মরে বেঁচে থাকাকে, আমি ঘৃণা করি।

প্রকাশ : (প্রকাশ যেন হঠাৎ জ্বলে ওঠে। তবু সংযতভাবেই বলে) কিসের দুর্বলতা ? আমাকে অঞ্জনের ডেকে আনার ? দুর্বল তুমিই জেউতি। অতিমাত্রায় যে কোনো কথার বশবর্তী হওয়াটাই দুর্বলতা। তোমার এই মাত্রাধিক আদর্শের অহংকার—দুর্বলতারই নামান্তর। কথাগুলো তুমি বলছ স্বার্থপরের মতো।

জেউতি : স্বার্থপর ? হুঁ—মেয়েদের স্বার্থপরতার উৎস কোথায়, পুরুষ—অন্তত তুমি বুঝতে পারবে না। জেউতির কথা শেষ না হতেই অঞ্জন চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। তাই দেখে জেউতি অধীরভাবে বলে) অঞ্জন, যেও না। (পথ আগলে) যাবার আগে বলে যাও—সত্যিই কি আমি স্বার্থপর ? বলো—জেউতি স্বার্থপর ?

অঞ্জন : (অত্যন্ত আহত হয়ে) আঃ—যাও, যাও।

[অঞ্জন চলে যায়। সেইদিকে চেয়ে জেউতি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পরে সেইভাবেই বলে—]

জেউতি : প্রকাশ! আমায় ক্ষমা করো। আমি তর্কের খাতিরেই তর্ক করছিলাম।

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : আমার পরম সৌভাগ্য, আমাদের বিপদের দিনে তোমরা এসেছো।... ব'সো, আমি এখনই আসছি।

[নিজেকে সংযত করার জন্যে অন্তরাল খোঁজে]

নেওগ : (এতক্ষণ ধ'রে অন্যমনস্কভাবে সব লক্ষ্য করছিল) ক্ষমা চাইল, আবার চলেও গেল!

প্রকাশ : সভ্য মানুষের মৃত্যুর আর একটা রূপ।

[প্রকাশের কথায় নেওগ যেন চমকে ওঠে। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরোয়]

নেওগ : অ্যাঁ ? হ্যাঁ—ঠিক—ঠিকই তো!

প্রকাশ : কী হল, চমকে উঠলে যে ?

নেওগ : (জোর করে হাসার চেষ্টায়) কিছু হয় নি বন্ধু! শুধু, মুহূর্তের জন্যে, জেউতি-অঞ্জনের মধ্যে দিয়ে নিজের মৃত্যুর রূপটা যেন হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।

প্রকাশ : ভুল শুধরে দেবার ক্ষমতা যেমন প্রকাশের আছে, তেমনি বিভ্রান্ত মানুষকে সরিয়ে আনার ক্ষমতাও প্রকাশের আছে।

নেওগ : জানি মোর অন্নদাতা।

প্রকাশ : (হাসে) নেওগ, তুমি বুদ্ধিমান। You know where the shoe pinches. Good.

[অঞ্জন প্রবেশ করে। তাকে দেখে প্রকাশ বলে ওঠে—]

—এসো অঞ্জন। কিন্তু বিশ্রাম নিতে গিয়ে আবার উঠে এলে যে ?

অঞ্জন : হ্যাঁ, মানে—

প্রকাশ : দ্যাখো অঞ্জন! তোমাকে সুস্থ করে তুলব ব'লে অনেক আশা নিয়ে, আগের সব দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে, আমি এসেছিলুম।...কিন্তু জেউতি আমাকে সহজভাবে নিতে পারেনি।

অঞ্জন : জেউতি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। ভেতরে গিয়ে সেই কথাই বলছিল আমাকে।...তোমরা অকারণ ভুল বুঝে ফিরে যেও না প্রকাশ।...প্রকাশ, বলো— আমি সত্যিই ভালো হব ?...আমাকে যে ভালো হতেই হবে! আমার যে কতো দায়িত্ব! আমি কেমন করে মরব ?

প্রকাশ : ছিঃ অঞ্জন, তুমি কেন মরবে ? আমরা সবাই মিলে তোমাকে ভালো করে তুলব। আজকাল টি-বি তো আর আগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। কতো নতুন ওষুধ বেরিয়েছে—কতো লোক ভালো হয়ে গিয়ে আবার কাজ-কর্ম-সংসার করছে। আসলে, ভালো চিকিৎসার দরকার—আই মীন, টাকার দরকার।

অঞ্জন : হ্যাঁ, টাকা...টাকা দরকার।

প্রকাশ : সেসব তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তার ওপর, জেউতি যখন মেনে নিয়েছে, আর কোন চিন্তা নেই।...এখন তুমি বরং তোমার ডাক্তারের কাছে যাও। কারণ, সময় একেই কম, ওদিকে রাতও হয়ে আসছে। কাল ভোরেই আমি শিলং যাব। তোমার চিঠি পেয়েই আমি স্যানাটোরিয়মে একটা সীট ঠিক করে রেখে এসেছি। সুতরাং যাওয়ার আগে, এই ক'দিনের মধ্যে, যে-ডাক্তার তোমার চিকিৎসা করছেন, তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার...তাঁর রিপোর্টগুলো তো শিলংয়ে দ্যাখাতে হবে।

[প্রকাশের ব্যবস্থাপনার, বিশেষত স্যানাটোরিয়মে সীট পাওয়ার কথা শুনে অঞ্জন অভিভূত]

অঞ্জন : প্রকাশ—!

নেওগ : প্রকাশ যখন একবার দায়িত্ব নেবে ব'লে স্থির করেছে, তখন কোন কথাই তোমাকে চিন্তা করতে হবে না অঞ্জন। স্যানাটোরিয়মে থাকাকালে তোমার দেখাশোনা করার জন্যে জেউতি যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে, তারও ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে ওর 'হ্যাপীভ্যালী'-র সুন্দর বাংলোয়। আর, দীপকে কনভেন্টের হোস্টেলে রেখে পড়াবার কথাও প্রকাশ ভাবছে। একে তো, দীপ বড় হচ্ছে, উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত। তাছাড়া, মার কাছে থাকলে এইসব অসুখ-বিসুখ টাকা-পয়সার কথা শুনে শুনে ছোটবেলা থেকেই ওর মনটা স্যাঁৎ-সেঁতে হয়ে পড়বে।...জানোই তো, প্রকাশের প্ল্যানে কোন খুঁৎ থাকে না।

অঞ্জন : স্যানাটোরিয়মের এই সীটের জন্যে কতদিন কী দৌড়-ঝাঁপই না আমি করেছি। জেউতিও নিজে গিয়েছিল খোঁজ নিতে। অথচ তুমি এককথায়— প্রকাশ, তোমাকে যে আমি কিভাবে ধন্যবাদ দেব।

প্রকাশ : ছিঃ, এসব কেন ভাবছ অঞ্জন?...তোমাকে আমি কেমন করে বোঝাব অঞ্জন, আজ আমি কতো শান্তি পেয়েছি! টাকার সৎ-ব্যবহার করতে পারার যে কী শান্তি—তুমি হয়তো অনুমান করতে পারবে না।...আমিই বরং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ।...ভালো কথা, নেওগ, তুমি অঞ্জনের সঙ্গে যাও। ডাক্তারের কাছে—

অঞ্জন : তুমি!

প্রকাশ : সারাটা রাস্তা গাড়ি চালিয়ে এসেছি। কাল রাতটাও, কতকগুলো অনিবার্য কারণে প্রায় জেগেই কেটেছে। বড্ড টায়ার্ড্ ফীল্ করছি। (একটা চেয়ারে বসে পড়ে) তাহলে তোমরা এসো...আমি হাত-মুখ ধুয়ে নি'।

[অঞ্জন ঈষৎ ইতস্তত: করে]

অঞ্জন : হ্যাঁ হ্যাঁ।...আমি বরং জেউতি আর দীপকে, মা—নে তোমাকে জল, গামছা দেবার জন্যে—

[ভেতরের দিকে গমনোদ্যত। প্রকাশ হা হা করে বাধা দেয়।]

প্রকাশ : কোনো দরকার নেই, অঞ্জন। এতসব তুমি ভাবছ কেন? এবাড়ি কি আমার পর? তুমি তাড়াতাড়ি এসো। রাত হলে ঠাণ্ডা লাগবে। নেওগ, যাও।...হ্যাঁ, আর—একটা কথা—বাড়িভাড়া নিশ্চয়ই বাকি পড়েছে?

অঞ্জন : তোমার অনুমান মিথ্যে নয়।

প্রকাশ : নেওগ, আসার সময় বাড়িওয়ালার সঙ্গে দ্যাখা ক'রে বাকীভাড়া সব দিয়ে আসবে। বলে আসবে, সামনের মাসের এক তারিখের পর থেকে এ-বাড়ির আর দরকার হবে না...কারণ, চিকিৎসার জন্যে অঞ্জনকে যে কতদিন শিলংয়ে থাকতে হবে, তার কোন স্থিরতা নেই।...এই নাও—

[নেওগের দিকে গাড়ির চাবি এগিয়ে দেয়। চাবি আর অঞ্জনকে নিয়ে নেওগ বেরিয়ে যায়। যাবার সময় অঞ্জনের মুখে একটা অসহায়ভাব ফুটে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ প্রকাশ চুপ ক'রে বসে থাকে। মঞ্চে একটা বেদনামথিত ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশ সৃষ্টিতে আবহ-সংগীত এবং নিয়ন্ত্রিত আলো সাহায্য করে। অঞ্জনের যাওয়ার দিকে প্রকাশ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। প্রকাশের মন যেন অনেকদূর চলে গেছে। যেন আপনমনেই বলে—ঠিক হাল্কাভাবে না বেদনাময় সত্যকে স্বীকার করে বোঝা যায় না—হয়তো, আংশিকরূপে দুটো ভাবই অভিব্যক্ত]

প্রকাশ : বেঁচে থাকার প্রশ্নই সবচেয়ে বড়ো। মহাপুণ্য!

[একটা সিগারেট জ্বালায়। প্রকাশ ধীরে ধীরে মঞ্চের এইপাশে চলে আসে। দাঁড়িয়ে, ভেতরের দিকে তাকায়। মুখে ফুটে উঠে অর্থপূর্ণ নীরব হাসি। মঞ্চ অন্ধকার হয়]

[বিরতি]

দ্বিতীয় দর্শন

[দৃশ্যসজ্জা পূর্বের মতো। প্রকাশ সেইভাবেই দাঁড়িয়ে, চিন্তান্বিত। জেউতি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেই চমকে উঠে বলে—]

জেউতি : কেন? তুমি! যাও নি?

[প্রকাশ কোন উত্তর না দিয়ে জেউতির দিকে নীরবে চেয়ে থাকে]

—কিন্তু গাড়ির শব্দ—

প্রকাশ : নেওগ আর অঞ্জন ডাক্তারের কাছে গেছে—পরামর্শের জন্যে। কাল ভোরেই শিলং যেতে হবে। স্যানাটোরিয়মে।

জেউতি : ওঃ।

[অন্দরে গমনোদ্যতা]

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : কী?

প্রকাশ : তখন অমন চমকে উঠেছিলে কেন? অতীতের কথা ভুলে যাবার জন্যে এতো ক'রে বলার পরেও—থাক, পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই।...কিন্তু সত্যিই কি আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করা যায় না?

জেউতি : পারছি না। কারণ...সহজভাবে তুমি আসো নি।

প্রকাশ : প্রমাণ?

জেউতি : নারীর এই বিচারশক্তি প্রকৃতির দান...বলে দেওয়ার দরকার হয় না।

প্রকাশ : বেশ, তাহলে তোমাকে সোজাসুজি বলাই ভালো।

জেউতি : নিশ্চয়। কারণ, তোমার এই ভালোমানুষের মুখোশ আরও ভয়াবহ।

প্রকাশ : (রেগে) জেউতি !!

জেউতি : (সমান ক্রোধের সঙ্গে) তুমি কী অভিপ্রায়ে অঞ্জনকে সাহায্য করার জন্যে এসেছো, স্পষ্ট ক'রে বলো।

প্রকাশ : এত উতলা হচ্ছ কেন?...তবে হ্যাঁ, তুমি যদি এতই—কিন্তু তার আগে—আমি যখন আবার এসেছি, সত্যি সত্যি অসুখ শুনে সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই—(কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে। তারপর) অমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন? বিশ্বাস হয় না? কী? (পাতলা হেসে) হাঁ, ভালো কথা—স্পষ্ট হতে বলেছো, না?... আচ্ছা, সংসারধর্ম কেমন লাগছে? (উত্তরের জন্যে ক্ষণেক অপেক্ষা ক'রে নিজেই বলে) অর্থাৎ এই বিবাহিত জীবন?

জেউতি : (বিরক্তির সঙ্গে) মধুর।

প্রকাশ : এই অভাব অসুখ অশান্তি, এইসব? (জেউতি নিরব। প্রকাশ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে পরে নিজেই বলে) বেঁচে থাকার মোহে অন্ধ হয়ে অঞ্জন যে তোমার ভালবাসাকে জেনেশুনে অপমান—

জেউতী : প্রকাশ।

প্রকাশ : (জেউতির দিকে ভ্রূকুটি করে) দুঃখিত। অপ্রিয় সত্যকে মানুষ চিরকাল—

জেউতী : অশান্তি চিরকাল থাকে না।

প্রকাশ : ভবিষ্যৎ বাণী না সান্ত্বনা?

জেউতি : দুই-ই। ষড়যন্ত্র কখনও স্থায়ী হয় না।

প্রকাশ : কোন্‌টা ষড়যন্ত্র? আমার এখানে আসা না অঞ্জনের ডেকে আনা? কার ষড়যন্ত্র?—আমার না অঞ্জনের?

[জেউতি কিছু না ব'লে প্রকাশের দিকে চেয়ে থাকে]

—জেউতি, কথাগুলো তুমি বড় একতরফা ভাবছ। অঞ্জনের এই বেঁচে থাকার মোহে, তোমাদের তথাকথিত সভ্যতার ক্রমবিকাশে, এইভাবে গোটা পৃথিবী যদি চাপা পড়ে? ষড়যন্ত্রর উৎস যদি নিহিত থাকে নিদারুণ সত্যের মধ্যে? প্রকৃতিকে অপমান করার জন্যে প্রকৃতি যদি প্রতিশোধ নেয়?

জেউতি : আলো আছে—এগিয়ে গেলেই দেখা পাব।

প্রকাশ : যথা?

জেউতি : তোমাদের প্রবৃত্তিকে হত্যা ক'রে।

প্রকাশ : প্রবৃত্তিগুলো কিন্তু অনুভূতিরই দান।...আচ্ছা, আজকের জটিলতাকে অস্বীকার ক'রে মানুষ প্রথম দিনের সরলতার দিকে ফিরে যেতে পারবে বলে তুমি বিশ্বাস করো?

জেউতি : করি না।...কিন্তু এও অস্বীকার করি না যে—জটিলতা দিয়েই জটিলতাকে জয় ক'রে মানুষ আবার সরলতার দিকে ফিরে যাবে।

প্রকাশ : তোমার যুক্তি আমিও মানি—তবে, অন্যভাবে।

জেউতি : হবে।...প্রথম দিনের মানবতার সন্ধানী ব'লে তুমি অহংকার করো—অথচ তুমি নিজেই জানো না, সেই আদিম মানবতার সঙ্গে মিশে আছে আদিম হিংস্রতা। আর সেই হিংস্রতার ওপর আধুনিক সভ্যতার প্রলেপ দিতে গিয়ে তোমরা হয়ে পড়েছো বিকৃত।···কিন্তু একদিন এই আদিম হিংস্র শব্দটার অর্থকে নেতিমূলক করে দিয়ে পৃথিবীর উন্নত মানুষ শুদ্ধ মানবতার জয়গান গাইবে। সেই সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরি নেই।

প্রকাশ : উদ্দেশ্য এক, সন্দেহ নেই...পথ আলাদা।

জেউতি : হবে। .. তোমার কাছে জটিলতা হচ্ছে উত্তেজনার নামান্তর। নির্মলতার অর্থও তোমার কাছে বিকৃত। নির্মলতা তুমি খোঁজো উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে; আর আমি খুঁজি উত্তেজনাকে—নির্মলতার ক্রমবিকাশে। তোমার-আমার অনেক পার্থক্য। আর...অঞ্জন সেদিন জয়ী হয়েছিল—এই কারণেই।

[অঞ্জনের নাম উল্লেখ করায় প্রকাশ যেন জ্বলে ওঠে]

প্রকাশ : আবার যদি শক্তি-পরীক্ষায় নামি? এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করি, যাতে তোমারই কথার অন্য অর্থ—

জেউতি : কোন-না-কোন উপায়ে পৃথিবীতে সমতা রক্ষা হয়—সেই বিশ্বাস আছে।

প্রকাশ : মিথ্যে, জেউতি, মিথ্যে। সমতারক্ষার মানদণ্ড তোমার নিজের হিসেব-মতো নাও হতে পারে। সেইখানেই তুমি ভুল করছো। ...আর নিয়ম? আচ্ছা বেশ—তুমি হলে খ্রীষ্টান, আর অঞ্জন হল হিন্দু, তোমাদের প্রগতিশীল ব্যবস্থা অনুসারে—আই মীন—তোমাদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম কী হবে?

জেউতি : ব্যক্তিগত কোন ধর্ম নয়,—সত্য সুন্দরই হবে ওদের ধর্ম। সেই মহান শিক্ষাই ওদের দেওয়া হবে।

প্রকাশ : অঞ্জন বোধহয় তোমার চেয়ে বয়সে ছোট। এ-বিষয়ে তোমার কী মতামত?

জেউতি : সেজন্যে আমি গর্ব অনুভব করি। মনের পরিধি যাদের সুবিশাল, তাদের কাছে বয়সের প্রশ্ন মিলনের অন্তরায় নয়। একথার প্রমাণ মণীষীদের জীবনীতেই আছে।

প্রকাশ : (হাসে) এক্ষেত্রে আমি তোমার সঙ্গে একমত। আমিও আমার মনের পরিধি অনুযায়ী বৃত্ত আঁকি। তুমি যুক্তি দিলে তোমার অনুকূলে—। আমিও একইভাবে বলতে চাইছি যে নিয়মের কোন স্থায়ী মূল্য নেই। মনীষীরা হচ্ছেন মহান ব্যতিক্রম। একথা সমাজের প্রত্যেকের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে যদি সহজ-সরলভাবে তারা তা স্বীকার করে নিতে পারে। সংসারে দশজনের সঙ্গে থাকতে গেলে প্রত্যেককেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। তোমার আর অঞ্জনের মধ্যেই তোমাদের সব অনুভূতি আবেগ সীমাবদ্ধ করে রেখে সমাধি রচনা করা ভুল। সেই সমাধিতে অন্য-দশজনের ন্যায্য অনুভূতিও যে সমাধিস্থ হতে পারে—একথাটা ভাবা উচিত, নইলে কিসের উন্নত মানুষ তুমি?

জেউতি : প্রকাশ!

[জেউতি চিৎকার করতে যায়, পারে না। কেঁপে ওঠে। প্রকাশ কাছে এসে জেউতিকে ভালো করে দেখে, তারপর বলে]

প্রকাশ : কুসংস্কার—কুসংস্কার, জেউতি। ...একলা ভোগ করতে চাওয়ার পঙ্গু প্রবৃত্তি থেকেই সমাজে যে অন্যায় নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে, সমাজের চাপিয়ে-দেওয়া সেই অর্থহীন কুসংস্কারে বিভ্রান্ত তুমি আজ তার বলি হলে...অঞ্জনকে ঠেলে দিলে আত্মদানের পথে। আমি তোমাকে হাজার হাজার প্রমাণ দেখাতে পারি। চক্ষুষ্মতী হলে তুমি নিজেই চারপাশে দেখতে পেতে। ...দুনিয়ায় এমন কে আছে, যার দেহে মনে আমার এই মতবাদ কখনও শিহরণ তোলেনি? স্বীকার করে না ভয়ে। (ক্রমেই উত্তেজিত হয়) আমাদের শেখাতে হবে মানুষকে নির্ভয় হতে। নইলে, সমাজ পৃথিবী আরও পঙ্গু হয়ে যাবে—যা স্বাভাবিক, তাকে স্বাভাবিক-ভাবে স্বীকার না করার ফলে...ঈশ্বর তথা প্রকৃতিকে অস্বীকার করার অপরাধে। ...জেউতি, ভ্রান্ত পথে সমাজের উন্নতিসাধন—অসম্ভব প্রস্তাব।

জেউতি : প্রকাশ...প্রকাশ—তুমি—তুমি কী বলতে চাইছো ?

[প্রকাশ জেউতির কাছে গিয়ে অতিশয় ঘনিষ্ঠ ও গভীরভাবে বলে]

প্রকাশ : জেউতি, দুনিয়ায় এমন একদিন ছিল, যখন সতীত্বের প্রশ্ন ছিল না...যখন স্বার্থান্বেষী মানুষ সতীত্বের দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মানুষের মনকে পঙ্গু করে দেয় নি—

জেউতি : প্রকাশ—

প্রকাশ : আমি তোমাকে ভালবাসি। অঞ্জনও বাসে। ...শিক্ষার অহংকার কর তুমি ; তাহলে কেন তুমি দুজনের হতে পারো না ? কেন স্বীকার করতে পারবে না সমভাগকে, সাম্যকে ?

[জেউতির মনের মধ্যে কী-যেন এক অভাবিত পরিবর্তনের ঢেউ আঘাত করে ; নরম সুরে বলে—]

জেউতি : প্রকাশ !

[প্রকাশ ক্রমশ কোন্ এক অতীন্দ্রিয় ভাবের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে]

প্রকাশ : সামাজিক মানুষ জাতি-ধর্ম নীতি-নিয়মের প্রশ্ন তোলে ; কিন্তু হৃদয়-দেবতার চিরন্তনী শক্তির ছোঁয়ায় সেসবও যুগে-যুগে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অনেক সময়, প্রকৃতিকে সহজভাবে স্বীকার না করলেও মানুষের প্রবৃত্তি ধর্মের মুখোশ প'রে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয়। এমন একদিনও গেছে পাঁচশো টাকা প্রণামী দিয়ে, ধর্মের নামে, বৌদ্ধ মন্দিরে, বৌদ্ধ পুরোহিতকে দিয়ে কুমারীত্ব হরণ না করালে সে-মেয়েকে সমাজ গ্রহণ করত না, তার বিয়ে হত না। একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক বলেছেন—

জেউতি : প্রকাশ !

প্রকাশ : এইতো সেদিন—১৯২০ সালে আর একজন পণ্ডিত মাদ্রাজের নানান জায়গা ঘুরে বলে গেছেন—পঞ্চম ব'লে এক জাতির—

জেউতি : প্রকাশ !

প্রকাশ : (নিজের মনেই বলতে থাকে) —দেবালয়ের দেয়ালের গায়ে দেখেছি মানুষের চিরন্তন প্রকাশ, শিল্পীর কল্পনায়। পাথরের বুকে খোদাই করা প্রথম ছবিটিতে দেখা যায়—মুনিবর জিজ্ঞাসা করছেন, নিজের রোয়া ফল খাওয়া যায়, না যায় না ? দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যাচ্ছে—খাওয়া যায় ব'লে জবাব দেওয়ায় নিজের সন্তানের শবদেহ দিয়ে সৃষ্টিকে পূজো দিচ্ছে। কিন্তু সমাজ-দৈত্যের কাছে শিল্পীকেও পরাজয় মানতে হল ; তৃতীয় ছবিতে দেখালে—এ পাপ। সমাজের শাসনের কাছে শিল্পীর অনুভূতি পরাভব বরণ করে নিলে। অপমান হল ঈশ্বরের তথা প্রকৃতির।

[প্রকাশ অভিভূত হয়ে পড়ে]

জেউতি ! এই নিয়মের মোহই মানুষকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তাই আমি খুঁজে

ফিরি সেই প্রথম দিনের নির্মলতা। ...কোন এক মহামিলনের যোগাযোগ উন্নত মানুষের সৃষ্টি করেছে বলে আজকের সমাজ গর্ব করে—কিন্তু আমার যদি তোমাকে ভালো লাগে, তাহলে কুসংস্কারের নামে ত্যাগের মুখোশ প'রে এই সুন্দর পৃথিবীতে কেন লোকসান দিয়ে যাব ? তিব্বতের পরিবার প্রথায়—থাক, দূরে যাবার দরকার নেই—দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব কেমন করে সুখী হয়েছিল ? জেউতি, নিয়ম অপরিবর্তনীয় হতে পারে না। হলে, মানুষের জীবনদেবতা অপমানিত হয়ে মহাপ্রতিশোধ নেবে। জেউতি, মানুষকে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করার এই বিধান, এই মহাপাপ আমি পিষে গুঁড়িয়ে ফেলব। আমরা নতুন যুগের উন্নত মানুষ—প্রাচীন মরচেধরা এই সমাজের তাবৎ সংস্কারকে ধ্বংস ক'রে সৃষ্টি করব নতুন স্বচ্ছ বাতাবরণ। বলো, বলো জেউতি, তুমি পারবে ? (প্রকাশের প্রশ্নে একটা নিষ্ঠার ভাব ফুটে ওঠে) জটিলতা দিয়ে জটিলতাকে আয়ত্ত ক'রে, আদিম হিংস্রতাকে বাদ দিয়ে, মানবতার মাধুরীখানি আমরা খুঁজে নোব। এক অভূতপূর্ব সাম্যের আদর্শকে দেব প্রতিষ্ঠা। পারবে ? পারবে জেউতি ?

[জেউতি এতক্ষণ চোখ বুজে প্রকাশের কথাগুলো শুনছিল। জেউতির মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে ভাবের উথাল-পাথাল। হয়তো, প্রকাশের কথার মায়াজাল সৃষ্টির ক্ষমতাই তাকে তন্ময় করে রেখেছিল ; হয়তো জেউতি 'প্রকাশের দৃষ্টি-কোণ' থেকে প্রকাশের উপলব্ধ সত্যকে নিজেও উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল ; অথবা, 'আমাকে কেউ ভালবাসে' বলে জানতে পারলে মনে যে একটা স্বাভাবিক আত্মতৃপ্তির ভাব আসে, জেউতির মন হয়তো সেই ভাবেই ভরে গিয়েছিল। হয়তো এই সমস্ত ভাব-ভাবনারই সংমিশ্রণে প্রকাশের চরিত্রে যে একটা মহৎ কিছু আছে, সেই তথ্যটা অনুভব করতে পেরে তার প্রতি বিরূপ মনোভাবটা কমছিল। সেই কারণেই বোধহয় চোখ-বোজা অবস্থাতেই ঘনিষ্ঠ স্বরে জেউতি বলে—]

জেউতি ঃ প্রকাশ!

প্রকাশ ঃ (গভীর আবেগের সঙ্গে) জেউতি!

জেউতি ঃ তুমি ক্লান্ত। ব'সো।

[সমাদরে প্রকাশকে বসিয়ে দেয়। চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বোলায়। উত্তেজনা অন্তে প্রকাশ যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জেউতি মাথায় হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়ে]

প্রকাশ ঃ (ক্লান্তকণ্ঠে) ঘেন্না করছে না ?

জেউতি ঃ এই মুহূর্তে করছে না। ...আজই প্রথম সন্দেহ হচ্ছে—তুমি হয়তো মহৎ, কিন্তু পথভ্রষ্ট। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে) প্রকাশ! সংস্কার-নীতি-নিয়মেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। এরা পূর্ণতা পাওয়ার পথে সাহায্য করে। আজকের মানুষ অনেক দাম দিয়ে এগুলো পেয়েছে, অনেক সাধনার পরে। তুমি ভুলে গ্যাছো,

দেহ আর মন, দুটো একসঙ্গে থাকলেও আলাদা। ...দুইয়ের স্বাভাবিক মিলনেই মানুষের পরিপূর্ণতা।

প্রকাশ : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) দুর্ভাগ্য! (হঠাৎ ভাবের পরিবর্তন হয়, কঠিন হয়, আবার যেন আগের মানুষটাই আত্মপ্রকাশ করে)—স্বাভাবিক মিলন? (দূরে সরে গিয়ে)—দুটোকে জোর ক'রে এক করতে হবে!

জেউতি : প্রকৃতি তোমার মঙ্গল করুন! কিন্তু এতে জোর খাটে না প্রকাশ। এ আয়ত্তের বাইরে। ...মানুষের শক্তি বিরাট; কিন্তু ভুলে যেও না, সেই বিপুল শক্তিরও একটা সীমা আছে। সবকিছুকে জবরদস্তি এক করতে যাওয়া ভুল। দূর থেকে যাকে দেখতে পাওয়া যায়, কাছে থেকে অনেক সময়ে সে থাকে দৃষ্টির বাইরে। তাছাড়া, বহু-র মধ্যে দিয়ে নতুন-এর সন্ধান—পুরুষের স্বভাবধর্ম হতে পারে; কিন্তু এক-এর ভেতর দিয়ে নিত্যনতুন-এর উপভোগ স্পৃহাই নারীর স্বভাবধর্ম। পৃথিবীতে যেদিন সতীত্বের প্রশ্ন ছিল না, সেদিনও পৃথিবীর বুকে সতী জন্মেছিল।

প্রকাশ : তোমার সব শিক্ষা নিরর্থক। ...বেশ, তোমার ধর্ম নিয়ে তুমি থাকো, আমি চললুম।

[জেউতি ক্রমশ আবার প্রকাশের প্রতি কঠিন, এবং অঞ্জনের প্রতি অনুকূল হয়ে পড়ে]

জেউতি : প্রকাশ, তুমি অঞ্জনকে সাহায্য করবে না?

প্রকাশ : সাহায্য করতেই তো এসেছিলুম। কিন্তু তুমি বাধা দিচ্ছ। ...তুমি বোধহয় ভোলো নি—একদিন তোমাকে আমিই সাহায্য করেছিলুম, রক্ষা করেছিলুম মৃত্যুর হাত থেকে।

জেউতি : সেই যুক্তিতে আবার হত্যা করতে চাও নাকি? জীবন দানের অধিকার মানুষের জন্মগত, নেওয়ার অধিকার কারও নেই।

প্রকাশ : আছে, জেউতি, আছে। আমি জীবন দিতেও জানি, নিতেও জানি। সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর। শুধু ব্যাক্তির ওপরে (হাসে) ব্য-ক্-তি-র ও-প-রে!

জেউতি : প্রকাশ, তুমি যাও। অক্ষয় হয়ে থাক আমার সতীত্ব।

প্রকাশ : নিজের মতবাদের ওপরে আমারও আস্থা অটুট থাক।

[প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত]

জেউতি : প্রকাশ!

[জেউতি প্রকাশকে এমনভাবে ডাকে, সে-যেন জেউতির অন্তর-আত্মারই আকুল আহ্বান। প্রকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে পার হয়ে যায়]

—না, না, তুমি যেওনা। তুমি টাকা না দিলে যে অঞ্জন—

[প্রকাশ নীরবে পকেট থেকে অনেক টাকা বা'র ক'রে জেউতির দিকে এগিয়ে দেয়]

জেউতি : টাকা! টাকা! অঞ্জনের চিকিৎসা হবে, অঞ্জন ভালো হবে—(বেদনায় ভেঙ্গে পড়ে) অঞ্জন ভালো হবে।

[হঠাৎ চুপ করে প্রকাশের দিকে চেয়ে থাকে ; তার ভাবের পরিবর্তন হয় ; ক্রমে মুখে দেখা দেয় ভীষণ কঠিনতা। অতঃপর আত্মস্থ হয়ে গভীরভাবে বলে—]

—প্রকাশ, তুমি যাও। নারীত্ব আমার জন্মগত অস্তিত্ব, সতীত্ব আমার অলংকার।...কিন্তু প্রকাশ, প্রতিদান না হলে দানের সার্থকতা নেই।

প্রকাশ : আত্মস্বার্থেই তুমি আমাকে মহান করে তুলতে চাইছো। তোমার সতীত্বের সংস্কার অঞ্জনকে বাঁচাতে পারবে না। নইলে, এতদিন দশজনে তোমায় সাহায্য করত। লোকে স্বীকার না করলেও আজকের সমাজ পরোক্ষভাবে আমার মতবাদেই চলছে, আর সেই মতবাদের ভিত্তিতেই অলক্ষ্যে গড়ে উঠছে নতুন সমাজ। তোমাদের মতো সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পায় যারা—তাদের শাস্তি দিতে সেই সমাজ ভুলবে না। আর, তারই ফলস্বরূপ তুমি হবে—বিধবা!

জেউতি : প্রকাশ, তুমি যাও—যাও। নইলে, হয়তো মানুষের ওপরে, নিজের ওপরে আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব। যাও—আমি মিনতি করছি—তুমি যাও।

প্রকাশ : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, গভীর বেদনার সঙ্গে) ঠিক আছে—তোমাকে আর বিরক্ত করব না। প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা জানাই—হাজার বিপদের মুখোমুখি হয়েও তোমার মনে যেন আত্মদ্বন্দ্ব ঠাঁই না পায়...তোমার বিশ্বাস যেন অটুট থাকে।...আমার জন্যেও তুমি সেই প্রার্থনাই কোরো।

[বেগে প্রস্থান]

জেউতি : হ্যাঁ যাও। মাথার সিঁদুর মুছে ফেলাই হবে আজকের সমাজের ওপরে আমার প্রতিশোধ!

[জেউতি যদিও খ্রীষ্টান, মাথায় সিঁদুর পরে। কারণ, সিঁদুর ব্যবহারের আর্টটা জেউতির ভালো লাগে। নিয়মের মধ্যে স্থিত হয়েও সুন্দরের প্রতি আকর্ষণের এই ব্যতিক্রমগুলিই জেউতির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য]

—যে সমাজে মানুষ সম-বিচার পায় না,—রোগীর নেই প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থা, সেই সমাজ ব্যবস্থা—তা' গ্যালই বা।...কিন্তু তাহলে অঞ্জন?...যাক, শেষ হয়ে যাক অঞ্জন।...অ্যাঁ অঞ্জন শেষ হয়ে যাবে? অঞ্জন! না-না—আমি কী বলছি! আমি—(চেঁচিয়ে) দীপ...দীপ।

[দীপের বদলে বাইরে থেকে অঞ্জন প্রবেশ করে। জেউতি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—]

—তুমি এসে গ্যাছো? ডাক্তারে কী বললে?

অঞ্জন : প্রকাশকে তুমি ঘর থেকে বার করে দিয়েছো কেন?

জেউতি : (মার খাওয়া মানুষের মতো হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। একটু সরে গিয়ে বলে)—সেকথা তুমি বুঝবে না।

অঞ্জন : আমি বুঝব না?...সত্যি, তোমাকে বোঝা দিন-দিন আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে। জেউতি, আবার বলছি—মানুষকে ক্ষমা করতে না-পারাটা পাপ... দুর্বলতা।

[জেউতির মুখের ওপর একটা আশ্চর্য ধরণের দুঃখের নীরব হাসি খেলে যায়। ক্ষণকাল অঞ্জনের দিকে চেয়ে বলে]

জেউতি : আমি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছি?...তাহলে সত্যি কথাই বলি অঞ্জন—আজ আমি তোমার মৃত্যু কামনা করেছি।

অঞ্জন : জেউতি!

জেউতি : তোমার অনুমানের উত্তর দিয়েছি।

অঞ্জন : জেউতি, তুমি আমাকে ভুল বুঝছো। যাক, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। বেঁচে উঠব বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু সবাই মিলে—

জেউতি : হ্যাঁ, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র—

অঞ্জন : প্রকাশের কাছ থেকে সাহায্য পাব, ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, ভাল হয়ে গিয়ে কর্তব্য করার অধিকার পাব—আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্য—

জেউতি : অথচ স্ত্রী হয়ে আমি তা করতে দিলাম না—

অঞ্জন : (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) কাকেই বা দোষ দেব? আমারই অদৃষ্ট! জেউতি, সংসারের প্রতি মোহ আমার নেই; কিন্তু আজ যেন অদৃষ্টকে মানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। (ম্লান হেসে বলে) দুর্বলতা বৈকি! যাক, আর কিছু না পেলেও তোমার কাছ থেকে স্পষ্টবাদিতা পেয়েছি।

[অঞ্জন প্রস্থান উদ্যত। জেউতি পথ আগলে দাঁড়ায়]

জেউতি : স্পষ্টবাদিতা—তার বাইরে তুমি আমার কাছ থেকে আর কিছু পাওনি?

অঞ্জন : সেই একটার ভেতরেই সব আছে।

জেউতি : অঞ্জন!

অঞ্জন : ছেড়ে দাও জেউতি, ভালো লাগছে না।

[অঞ্জনের উত্তরে আঘাত পেয়ে জেউতি অন্যমনস্ক হয়ে যায়, পথ ছেড়ে দেয়। কী-যেন ভাবে। সেই তন্ময়তায় বলে—]

জেউতি : ঠিক আছে, যাও। নেওগ কোথায়? প্রকাশের সঙ্গে কোথায় দেখা হল?

অঞ্জন : (যেতে যেতে অঞ্জন জবাব দেয়) সদর-দরজায়। অপেক্ষা করতে বলে এসেছিলাম। দীপকে পাঠিয়ে বিদায় ক'রে দি'।

[চলে যায়]

[জেউতি তন্ময় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যেন পরিবেশের কথা ভুলে গেছে। অঞ্জনের যাওয়ার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অল্প পরে হঠাৎ ডাকে—]

জেউতি : দীপ, দীপ!

[দীপ আসে]

—দীপ, সদর-দরজার কাছ থেকে সেই রাজাকে ডেকে আন গে যা। বলবি—আমি, আমি ডেকেছি।

[দীপ যায়। জেউতি একটু একটু ক'রে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। কথা বলে যেন মুখের ভেতরে—]

—ভালবাসা! স-তী-ত্ব! ষ-ড়-য-ন্ত্র! সমাজব্যবস্থা!

[ম্লান হাসে। বাইরে থেকে দীপ ও প্রকাশ আসে]

দীপ : মা!

জেউতি : (ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে দীপের দিকে চেয়ে) দীপ, ভেতরে যা। সন্ধ্যে হয়ে এল, পড়গে যা।

[দীপ যায়। কিন্তু যাবার আগে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার মা, একবার প্রকাশের দিকে তাকায়। মা'র ব্যবহারের ব্যতিক্রম দীপের সন্ধানী শিশুমনে যেন কোন এক অবুঝ প্রশ্নের কলতান তোলে। ইতস্ততঃ করে। তবু মা'র আদেশ পালন করে। দীপের যাবার পথে জেউতি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে]

প্রকাশ : জেউতি, তুমি—

জেউতি : হ্যাঁ, আমি। আমি—আ-মিই ডেকে পাঠিয়েছি। (কাছে এসে ফিসফিস করে বলে)—কতো টাকা দেবে ?

প্রকাশ : যতো চাও।

[প্রকাশের কথায় জেউতি হঠাৎ পাগলের মতো হেসে ওঠে]

জেউতি : হাঃ হাঃ হাঃ—য-তো চাই!...বেশ, রাত হোক। (ফিসফিস ক'রে) —অন্ধকার হোক। কেউ কাউকে না-দ্যাখা হোক।...হ্যাঁ, অন্ধকার হোক।

প্রকাশ : (ছাড়াছাড়া ভাবে বলে) অ্যাঁ...বেশ...তাহলে তাই হোক। রাত্তিরেই দ্যাখা হবে।

[প্রস্থান]

জেউতি : চলে গেল!...রাত্রে দ্যাখা হবে—রাত্রে! হাঃ হাঃ হাঃ—

[জেউতির হাসিতে কান্নার সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতস্ততঃ ভংগীতে, অতি ধীরে, দীপ আবার প্রবেশ করছিল, মা'কে ওই অবস্থায় দেখে ব্যাকুল হয়]

দীপ : মা-মা—তোমরা কী হয়েছে মা ? মা—

[মা'র কান্না দেখে দীপ নিজেও কেঁদে ফেলে]

জেউতি : দীপ, আমরা অনেক টাকা পাব। যতো দরকার, ততো। আমাদের আর কোন ভাবনা নেই। তোর বাবা ভালো হবে। সমাজকে ফাঁকি দোব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রাণপণে খাটলেও বেঁচে থাকার ন্যায্য অধিকার ওরা দেয় না ; এইবার ওদের আমি হারিয়ে দেব। হারিয়ে দেব—হাঃ হাঃ হাঃ—

[পাগলের মতো হাসতে থাকে। ভয় পেয়ে দীপ 'মা-মা' বলে ডাকে। ভেতর থেকে অঞ্জন 'জেউতি জেউতি' ব'লে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে আসে]

দীপ : মা, মা !

[জেউতির হাসির মাঝখানে দীপ ও অঞ্জন ডাকে]

অঞ্জন : জেউতি, জেউতি।

জেউতি : না, না—কিচ্ছু হবে না। প্রকাশ সত্যি সত্যি খুব ভালো। এই দ্যাখ, টাকা দিয়ে গেছে। আবার আসবে...টাকা দিতে আসবে। অঞ্জন, আমি ডেকেছি। প্রকাশকে আবার আমিই ডেকেছি। (উত্তেজনায় কেঁদে ফেলে, এলোমেলো ভাবে বলে) ভুল, আমার ভুল আমি স্বীকার করেছি. স্বীকার করেছি। (হঠাৎ আবার হেসে ওঠে) ভুল—হাঃ হাঃ হাঃ—ভুল!

[অঞ্জন এতক্ষণ জেউতিকে ডেকে-ডেকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করছিল। দীপও ডাকছিল প্রথমদিকে। কিন্তু শেষের দিকে সে যেন ভয় পেয়ে বোবা হয়ে যায়। জেউতি একবার কাঁদে, একবার হাসে। শেষে, আর একবার হেসে ওঠায় দীপ ভয় পেয়ে অদ্ভুতভাবে 'মা' ব'লে চিৎকার ক'রে জেউতিকে জড়িয়ে ধরে। মার বুকের মধ্যে ঢুকে, মুখ লুকিয়ে দীপ ভয়ে কাঁপতে থাকে]

দীপ : মা !

[দীপ 'মা' ব'লে এতো বিকটভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে সেই চিৎকার শুনে জেউতি স্তব্ধ হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে কেটে যায়।...তারপর দীপকে জড়িয়ে ধরে।

ধীরে-ধীরে জেউতির মুখে বিভিন্ন ভাবের মিশ্রণ দেখা দিতে থাকে। ক্রমশ যেন একটা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। মরণের মধ্যে থেকে যেন বলে ওঠে]

জেউতি : দীপ। চল।

[দীপ আর জেউতি ভেতরে যায়। তাদের পেছনে অঞ্জন ধীরে ধীরে যায়। শূন্য মঞ্চ।]

☐

[ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে। পার হয়ে যায় কিছুটা সময়। প্রবেশ করে দীপ।

তার চলনে ও চাউনীতে সন্দেহের ছাপ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে আবার ভেতরে চলে যায়। মঞ্চ আবার কিছুক্ষণ শূন্য পড়ে থাকে। পরিস্থিতি-প্রকাশে আবহ-সংগীত সাহায্য করে। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে; রাত বেড়ে যায়—যার সূচনা হয় আলোক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে।

রাত দশটা বাজল। খিড়কী দিয়ে দেখা যায়—বাইরের অন্ধকারে জোনাকী পোকার ঝাঁক। দীপ আবার আস্তে আস্তে প্রবেশ করে; পায়ে খড়ম। শোবে ব'লে পা ধুয়ে এসেছে। মঞ্চের মাঝখানে এসে ঘুম তাড়ানোর জন্যে আড়মোড়া দিয়ে লাইটটা জ্বালায়। অন্ধকার মঞ্চ আলোকিত হয়। দরজা বন্ধ আছে কি নেই, ভালোভাবে দেখে নেয়। তারপর খিড়কী বন্ধ করে। পেছনের ঘরে গিয়ে সে ঘরের লাইটটা জ্বালায়। কামিজটা খুলে আলনায় রাখে। তারপর বিছানায় শোবার জন্যে গিয়েও আবার কী ভেবে সামনের ঘরে চলে আসে। ঘরের লাইটটা নেভায়। তারপরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

মাঝের দরজা খোলা থাকায় সব দেখা যায়। একটু পরে, ধীরপায়ে জেউতি আসে। প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে অল্পক্ষণ পায়চারী করে। পেছনের ঘরের আলোর টুকরো পড়েছে এই ঘরে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়ায়, কী যেন ভাবে, লাইটটা জ্বালিয়ে, ওপরে, বাল্‌ব-এর দিকে নীরবে চেয়ে থাকে। দীপের ঘুম-ঘুম ভাব ভেঙে যাওয়ায় মাকে কিছুক্ষণ সভয়ে লক্ষ্য করে; পরে আস্তে-আস্তে মার কাছে উঠে আসে; ভয়ে ভয়ে ডাকে—]

দীপ : মা।

জেউতি : হ্যাঁ? অ—দীপ! তুই শুস নি? (সস্নেহে) যা সোনা, শুগে যা। ...আমার শুতে রাত হবে যে! তোর বাবার অসুখ, কাছে থাকতে হবে না?

দীপ : মা—

জেউতি : এইতো!...অবুঝ হোসনি সোনা! তোর বাবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে হাত-পা টিপে আবার ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতে হয় যে! ওঁর যে অসুখ হয়েছে, ঘুম নাহলে খুব বেড়ে যেতে পারে। বুঝেছিস? যা—শো গিয়ে। একটু পরে আমি তোর কাছে গিয়ে শুয়ে থাকব। যা—

দীপ : তুমি রোজই বলো। একদিনও শোও না। সারা রাত বাবার কাছে বসে থাকো। এতো রাত জাগলে তোমার নিশ্চয়ই অসুখ হবে মা!

জেউতি : (ম্লান হাসে) পাগল! আমার অসুখ হয় না।

দীপ : (ইতস্ততঃ ক'রে) মা—

জেউতি : কী?

দীপ : তোমার কী হয়েছে?

জেউতি : আমার কী হবে? কিচ্ছু হয়নি। (দীপকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গভীর সুরে বলে)—আজ আমাদের কতো খুশির দিন! উনি ভালো হবেন। সেই যে এক রাজা, তিনি টাকা দেবেন। একবার যদি কোনো উপায়ে অনেক পাই, শিলং গিয়ে কারও সঙ্গে থাকতে হবে না। তোর মা রোজরোজ এই দংশনের হাত থেকে রেহাই পাবে। এখানে থেকেই আমরা তিনজনে তোর বাবাকে ভালো করে তুলতে পারব।...কিন্তু দীপ—তার আগে, দী-প—

[দীপকে আশ্রয়ের মতো যেন আরও বেশি আঁকড়ে ধরে। মার বুক থেকে সরে গিয়ে দীপ বলে—]

দীপ : রাজাকে আমার ভালোলাগে না।

জেউতি : ওভাবে বলতে নেই দীপ। তাঁর কতো দয়া—তোর বাবাকে ভালো করার জন্যে টাকা দেবেন। কতো আনন্দের কথা!

দীপ : তাহলে কাঁদছিলে কেন? আজ চুল আঁচড়াওনি...বিকেলের কাপড় বদলাওনি—

জেউতি : অ—তাই নাকি! (দীপকে সস্নেহে টেনে এনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলে)—এখন বদলালে হবে তো?...আচ্ছা, চল—

দীপ : এতো রাতে!

জেউতি : রাত! ('রাত' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে। পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করে হাসবার চেষ্টা করে বলে)—রাত হলো তো কী হল? আমাদের আজ কতো আনন্দের দিন! তুই ঠিকই বলেছিস সোনা—আজ না সাজলে আমি আর কবে সাজব! তুই ঠিক কথাই মনে পড়িয়ে দিয়েছিস।

দীপ : আমার ঘুম পাচ্ছে।

জেউতি : তুই বরং শুয়ে শুয়ে দেখবি; আমি একটা সুন্দর কাপড় প'রে তোর কাছে শুয়ে থাকব।

[দীপকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। নিজে বাক্স থেকে চাদর বার ক'রে গায়ে দেয়। টেবিলের সামনে ব'সে চুল আঁচড়ে নানান ধরণের সাজ করতে থাকে।

দীপ ঘুমিয়ে পড়ে। জেউতি মশারী টাঙিয়ে দেয়। আবার সাজতে বসে। জেউতি পারতপক্ষে নিজেকে সাজায়; ওকে যেন প্রসাধনের উন্মাদনায় পেয়েছে।

হঠাৎ দূর থেকে মাইক-মাধ্যমে ভেসে আসে একটা রেকর্ড-গীতি। হয়তো কোনো সিনেমা হলে শো শেষ হওয়ার পরে বাজানো গান, নয়তো কারও বিয়েতে বাজছে মাইক-গীতি। গানটির কথা—শ্রীরাধার অভিসার। ঠিক বেদনার নয়। আনন্দের। রাধার অভিসারের বর্ণনা—কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের

আকুতি। গানটির আনন্দিত বার্তা, অভিসারের আকুতি জেউতিকে যেন পরিহাসই করছে।

জেউতির সাজ তখন অর্ধেক হয়েছে। আস্তে আস্তে উঠে আসে। দীপের ঘরের জোরালো আলোর বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে কমজোরী আলোটা জ্বেলে দেয়। প্রথম ঘরে এসে লাইট নিভিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ায়; বাইরের অন্ধকারে জোনাকী পোকার ঝাঁক চোখে পড়ে। দরজা খুলে দেওয়ায় গান আগের চেয়ে স্পষ্ট হয়। জেউতি নিরবে গান শোনে। গানের শেষদিকে অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে—আর, মুখ দিয়ে কবিতার মতো, বিকৃত ক'রে, গুনগুনিয়ে গানের প্রথম চরণের কথাগুলো উচ্চারণ করে। ধীরে ধীরে দীপের ঘরে যায়। দীপ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মাঝের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ওপরের শিকলটা লাগিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে স'রে বেরিয়ে যায়। আবার দ্রুত ফিরে এসে খোলা দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। সেইসময়ে হঠাৎ ভিতরে কিসের যেন আওয়াজ শুনে চমকে উঠে ভেতরে যায়—অঞ্জনের ঘরে।

সময় পার হতে থাকে। রাত এগারোটা বাজে। অঞ্জনের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জেউতি আবার আসে। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। দরজা খুলে অন্ধকারে চোখ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। অঞ্জন এবং দীপের ঘরের আলোকদানী থেকে তখন ক্ষীণ আলো মঞ্চে পড়ছে]

জেউতি : এগারোটা! কী অন্ধকার! পৃথিবীর সমস্ত কালো যেন একসঙ্গে জমাট বেঁধেছে। অঞ্জন ঘুমোচ্ছে। শোও, শুয়ে থাকো। প্রকাশ দয়ালু বন্ধু, প্রকাশ ভালো। প্রকাশের ভুল বুঝি ভেঙেছে—আমার অঞ্জন সেই কথা বিশ্বাস করেছে।...রাত—অন্ধকার রাত। বেশ, তুমি শুয়ে থাকো...তোমার মনগড়া আনন্দের মধ্যে থেকেই সুখী হোয়ো। যে-দান দিতে হয়, তা আমি দেব। আমার শ্রেষ্ঠ দান। ভালবাসার দান। তোমার ভালবাসার দান। অঞ্জন, এ অভিমান তোমার ওপরে—তার চেয়েও বেশি—সমাজের ওপরে। এ আমার প্রতিবাদ—তীব্র প্রতিবাদ, যে প্রতিবাদ কেউ করে না। না, অনেকে করে, স্বীকার করে না— সেই স্বীকার না করা প্রতিবাদ।

[শেষের দিকে জেউতি আকুল হয়ে ওঠে। জেউতির এই কথাগুলো তার মুখ দিয়ে না বলিয়ে—তার অন্তর চিন্তাধারা থেকেই যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে, এইভাবে—নেপথ্য থেকে টেপরেকর্ডিংয়ের সাহায্যে বাজিয়ে শোনালে ভালো হয়। হঠাৎ জেউতি সদরে কাউকে দেখতে পেয়ে 'কে' ব'লে চমকে ওঠে]

জেউতি : কে !!

[দৌড়ে পালাতে যায়। হঠাৎ ফিরে এসে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে খিল

লাগিয়ে দেয়। জেউতি কেঁপে ফুঁপিয়ে ওঠে। দ্রুতবেগে গিয়ে অঞ্জন ও দীপের ঘরের দরজায় কান পেতে শোনে। ওর চাল-চলনে একটা মর্মান্তিক অথচ ভয়াবহ রূপ ফুটে ওঠে। সেইভাবে কান পেতে শ্রবণরত অবস্থায় বাইরের দরজায় কারও টোকা দেবার শব্দ শোনা যায়।

শব্দ শুনে জেউতির মুখ নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি দীপের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে যায়। পরমুহূর্তে কী-ভেবে থেমে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো একপা-দু'পা করে এগিয়ে যায় বাইরের দরজার দিকে। জেউতিকে দেখে মনে হয়—যেন কোন মরামানুষ হাঁটছে। অপ্রকৃতিস্থ।

দরজার খিল খুলে দেয়াল ঘেঁষে দাড়ায়। হাতে টর্চ নিয়ে প্রকাশ প্রবেশ করে। ওর মুখে একটা নিঃশব্দ হাসি। প্রকাশের সেই নীরব হাসি আর ভংগিমা যেন বলতে চায়ঃ 'খুলেছো দুয়ার? আমি জানি তো, শেষ পর্যন্ত জয় আমারই।' জেউতির মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে কাছে আসে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—]

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : চুপ, কথা বোলো না। দাও—

[প্রকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়]

প্রকাশ : এই যে—

[অনেক টাকা বার ক'রে]

জেউতি : টাকা! দাও-দাও। তুমি বড্ড ভালো।

[টাকাগুলো নিয়ে অদ্ভুত তৃপ্তিতে নেড়েচেড়ে দেখে। মুখে ফুটে ওঠে ততোধিক অদ্ভুত হাসি—]

—টাকা! টাকা!!

প্রকাশ : হ্যাঁ, টাকা। তোমার হাতে ওই যে টাকা। চিকিৎসা হবে। অঞ্জন ভালো হবে।

জেউতি : টাকা। (পরম তৃপ্তিতে)—আমার হাতে এইতো সত্যিকারের টাকা। তোমরা এত টাকা একসঙ্গে কোত্থেকে পাও? আমার হাতের মুঠিতে আজ দুনিয়ার টাকা। আঃ—টাকা এতো সুন্দর—এতো সুন্দর—

[শেষের কথাগুলো বলে কান্নার মতো কিন্তু নোটগুলো তৃপ্তিভরে গালে-মুখে চেপে-চেপে ধরে—টাকার ছোঁয়া লেগে দেহে জাগে নিবিড় আনন্দ—কথাগুলো উন্মাদিনীর মতো টেনে টেনে বলে—টাকাগুলোকে ঘনঘন চুমো খায়]

প্রকাশ : জেউতি!

[হাত ধরে]

জেউতি : অ্যাঁ তাইতো! তুমি তো এমনি দাওনি। তোমাকে দিতে হবে প্রতিদান। প্রতিদান।

প্রকাশ : জেউতি, তোমাকে আমি যেভাবেই চাই না কেন—যতো যা-ই বলি না কেন—তোমাকে আমার ভালোলাগে। হয়তো হয়তো—

জেউতি : (জেউতি বেশ খানিকক্ষণ অস্বাভাবিক ধরণে টেনে টেনে হাসে) হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলে যাও। শব্দগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলো। যাতে অর্থগুলো স্পষ্ট হয়, অথচ একটা মোহ বিস্তার করে।

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : বলে যাও, চুপ ক'রে থেকো না। সেদিন যেসব কথা বলছিলে—হ্যাঁ? বলে যাও, কোন্ দেশের রাজকুমার মাকে বিয়ে করেছিল? বলো। (ঈষৎ ক্রোধে)—বলছো না কেন?...দুনিয়ার কোথায় কবে একটা অঘটন ঘটেছিল। তাকেই তোমার যুক্তি দিয়ে চিরকালীন করে তোলো।

প্রকাশ : জেউতি—তুমি অসুস্থ।

জেউতি : উঁহুঁ, মিছে কথা। কী যে মিথ্যে কথাগুলো বলো না তুমি! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। নইলে কি এভাবে কর্তব্য করতে পারি?...কর্তব্য! তোমার 'যোগ্যতা'-র সংজ্ঞার মতো আমার ভাষ্যও বিকৃত হয়ে প্রকাশ পায়নি তো? প্রয়োজন—একেই বলে সময়-উপযোগী হওয়া! চুপ কেন? ইতিহাস ব্যাখ্যা করো, বলো, বলে যাও!

প্রকাশ : জেউতি, আমি ফাঁকি দিইনি। বিশ্বাস করি—

জেউতি : আমি কিন্তু আজ আর কিছুই বিশ্বাস করি না। বলতে বলেছি—শুধু আহুতির আগে রণবাদ্যের কাজ করবে ব'লে। উত্তেজনার দরকার—কারণ আমি দেহ আর মনকে একসঙ্গে স্বীকার করি।

প্রকাশ : তুমি তাহলে—

জেউতি : উঁহুঁ—হল না। আজ আমি তোমার দর্শনকেই স্বীকার করব। নেব প্রতিশোধ—মানুষের ওপর। জানি না, আমার মতো এমন পূর্ণ জ্ঞানে, এভাবে, কেউ প্রতিশোধ নিয়েছে কিনা। কিন্তু আমি যে এভাবে নিজেকে আহুতি দিয়ে গেলাম, তার জন্যে কি কেউ কাঁদবে না? খুঁজবে না এর প্রতিকার?

[জেউতি একটু চুপ করে। পরমুহূর্তে যেন মনে হয়—মিথ্যে, কেউ এর প্রতিকার খোঁজে না!—নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে বলে—]

—প্রকাশ, আমি—আ-মি প্র-স্-তু-ত।

প্রকাশ : জেউতি, আমি জানতুম। আমার আদর্শই জয়ী হবে।

[প্রকাশ জেউতির কাছে আসে। হঠাৎ জেউতি পিছিয়ে গিয়ে বলে—]

জেউতি : না-না-ন্‌না:! আমার টাকা চাই না। আমি পারব না। আমার মন...প্রকাশ, এই নাও টাকা। তুমি যাও।

[টাকাগুলো দলা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে অঙ্গনের ঘরে ঢোকে। প্রকাশ টাকাগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে বাইরে পা

বাড়ায়। আবার হঠাৎ জেউতি এসে প্রকাশের পায়ে প'ড়ে কেঁদে ওঠে। অঞ্জনের ঘরের দরজা খোলাই থাকে।

—না-না-তুমি যেও না। টাকার আমার দরকার। অঞ্জন ভালো হবে। টাকা—আজ আমার টাকা চাই-ই।

[ভেতরে একটা শব্দ হয়। অঞ্জন জেগে উঠেছে। ভেতর থেকে অঞ্জন 'জেউতি জেউতি' বলে ডাকে]

অঞ্জন : (ভেতর থেকে কাশে) জেউতি—জেউতি !

[জেউতি চমকে ওঠে। মঞ্চের ক্ষীণ আলোটুকুও যেন অন্ধকারের মধ্যে কেঁপে উঠে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির জানান দেয়]

জেউতি : প্রকাশ, অঞ্জন জেগে উঠেছে। তুমি যাও!—না না, যেও না। যেতে পারবে না। তুমি, তুমি লুকিয়ে থাকো।

[প্রকাশকে বাইরের বারান্দার অন্ধকারে ঠেলে দেয় আত্মগোপন করার জন্যে। অঞ্জন আসে]

অঞ্জন : জেউতি—

জেউতি : তুমি, তুমি আবার কেন উঠে এলে ?

অঞ্জন : জেগে উঠে দেখি, তুমি নেই—

জেউতি : হ্যাঁ—আমি নেই !—অঞ্জন, আমি নেই ! আমার—মানে, ঘুম আসছে না, তাই—

[জেউতি এগিয়ে গিয়ে লাইটের সুইচে হাত দেয়—লাইট জ্বালে। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জন বাধা দিয়ে আবার অন্ধকার করে দেয়]

অঞ্জন : থাক জেউতি, দরকার নেই। (সুইচে রাখা জেউ •র হাতের ওপরে অঞ্জনের হাত। অঞ্জন জেউতিকে সপ্রেমে কাছে টেনে আনে)—জেউতি, এতো অস্থির হচ্ছ কেন ? মৃত্যু যদি এসেই থাকে, খুশীমনে বিদায় দিও, জেউতি। চোখের জল ফেলে তুমি সাধারণ হোয়ো না, জেউতি।

জেউতি : সাধারণ ? না, তোমার জেউতি সাধারণ নয়। তুমি জানো না অঞ্জন, তোমার জেউতি কী! তোমার জেউতি আজ শত চেষ্টা করেও সাধারণ হতে পারবে না। তোমার জেউতির পক্ষে আজ সাধারণ হওয়াই অসাধারণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু যা সাধারণ, জেউতি তাকে বড় ভালবাসে,—হয়তো সেইজন্যেই বোধহয় সে সাধারণ হতে পারল না।

অঞ্জন : কথাগুলো তুমি ওভাবে বলছ কেন জেউতি ?

জেউতি : চলো, ভেতরে যাই। জেগে থাকলে তোমার ক্ষতি হবে।

অঞ্জন : আমার প্রশ্ন তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ, জেউতি।

জেউতি : (নিজেকে যেন পরিহাস করে বলে) আমি শান্তির পূজারিণী। সেই-

জন্যেই বোধহয় তোমার বাস্তব প্রশ্ন ভুলতে চাইছি। (ক্ষণকাল অঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে চোখে ফুটে উঠতে থাকে আবেগ, বিহ্বলতা। বলে)—অঞ্জন, তুমিই তো এঁকেছিলে আমার জীবনে সুখের, বিলাসের ছন্দ। (ম্লান হাসে। নিজেকে সংযত ক'রে বলে) ভেতরে চলো।

[দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অঞ্জন গিয়ে খুলে দেয়, খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চায়। জেউতি সভয়ে অঞ্জনকে লক্ষ্য করে]

অঞ্জন : দরকার নেই, জেউতি। অন্ধকার রাতের এই ঝির্‌ঝিরে বাতাস বড় ভালো লাগছে।

[কাশে। আগের চেয়ে বাতাস জোর হয়]

—ভেতর, বিছানা, ভেতর—অসহ্য! মুক্তি চাই বাইরে—অবাধ মুক্তি!

জেউতি : মুক্তি জীবনে কেই বা পায় অঞ্জন? পায় শুধু—মুক্তির লড়াইকে—

[জেউতি মঞ্চের প্রায় মাঝখানে সরে আসে। জেউতির কথার উত্তর দেবার জন্যে অঞ্জনও তার কাছে চলে আসে। আকুলভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—কিন্তু সে সান্ত্বনা যেন নিজেকেই দেওয়া!]

অঞ্জন : অধীর হোয়ো না, জেউতি। অন্ধকারের পরে নিশ্চয়ই আলো আছে। রাত আমাদের শেষ হবেই। (বলতে বলতে আবেগান্বিত হয়ে ওঠে)—দুঃখ হবে আমাদের জীবনের অলংকার,—ব্যথার সরোবরে আনন্দের পদ্ম...বিধবার হাসির মতো পবিত্র।

জেউতি : জানি! কিন্তু আমি সংগ্রামকে দুঃখ বলিনা, অঞ্জন।.. তবে, লড়াই যদি হয় ষড়যন্ত্রের আবরণে—

অঞ্জন : ষড়যন্ত্র?

জেউতি : হ্যাঁ। মনুষ্যত্বের চারপাশে বুদ্ধিজীবীর তাণ্ডব-নৃত্য। কিন্তু—এই জাল ছিঁড়ে ফেলতে হবে।...উঃ!

['উঃ' শব্দটা খুব জোরে উচ্চারণ করে না। স্বাভাবিকভাবে, মানুষ ক্লান্ত হলে যেভাবে বলে, সেইভাবেই উচ্চারণ করে। মুখের ওপরে হাত বুলোয়; যেন যন্ত্রণা কমাতে চাইছে]

অঞ্জন : (কাছে এসে, গাঢ় কণ্ঠে) জেউতি, তোমার অসুখ করেছে?

জেউতি : না তো! (অল্প সরে যায়)—আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। বর্তমান যুগের দাবি মেনে, এই মুহূর্তে, আমার দেহ-মন একসঙ্গে কাজ করার উপযোগী হয়েছে। (অঞ্জনের সামনে এসে)—অঞ্জন, জানো—কী সেই কাজ?

অঞ্জন : জেউতি!

জেউতি : কেউই জানে না। অথচ, আজ যেন তারই বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে।

অঞ্জন : জেউতি, হয়তো আমার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে মাঝে মাঝে ব্যস্ত করে। তবু, কেবল প্রয়োজনকেই যদি তুমি মেনে নাও, হয়তো আমি দুঃখ পাব। কারণ, বাঁচবার যতো ইচ্ছেই আমার থাকনা কেন,—একথা তো অজানা নয়, জেউতি—প্রয়োজন কখনও সুন্দর হয় না!

জেউতি : (হেসে, ব্যথার সঙ্গে) যে প্রয়োজনের অন্তরালে থাকে নিদারুণ ত্যাগ? যে প্রয়োজনের পেছনে থাকে সকরুণ মঙ্গল-কামনা?

অঞ্জন : জেউতি! তুমি অস্থির হলে আমিও স্থির থাকতে পারি না। কিন্তু উত্তেজনা আমার সহ্য হয় না—বড়ো ক্লান্ত লাগছে।

[অঞ্জন যেন ভেঙ্গে পড়ে। একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে। জেউতি দৌড়ে কাছে যায়। চুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে আবেগের বেগে বলে—]

জেউতি : তুমি ভালো হবে—তুমি ভালো হবে। পৃথিবী বড়ো সুন্দর...মানব-জীবন আরও সুন্দর—আরও অর্থপূর্ণ। ওরা সব বিষাক্ত করে তুলছে, তবু সুন্দর!

[অঞ্জন মাঝে মাঝে কাশে]

অঞ্জন : জেউতি, আমি জীবনকে ভালবাসি।

জেউতি : আমিও ভালবাসি। সেই জন্যেই পারব। অন্যেরা হয়তো বলছে, এ তোমার প্রতি আমার ভালবাসার ত্যাগ। না—নিজেকে ভালবাসি বলেই আমি এই পথ বেছে নিয়েছি। তোমার মধ্যে দিয়েই আমার প্রকাশ,—তুমি যে আমার অবলম্বন!

অঞ্জন : (আশ্চর্যান্বিত) জেউতি!

জেউতি : (আবেগান্বিতা) অঞ্জন!

অঞ্জন : জেউতি, আজ আমি পঙ্গু। কিন্তু আমার কত যে কল্পনা!

জেউতি : হ্যাঁ, কল্পনা! সুরে-স্বরে অভিন্ন আমাদের দুজনের কল্পনা! যে কল্পনার পরিণতি অন্যের কণামাত্র ক্ষতি করে না; যে কল্পনা বার্তা বহন করে আনে মুক্তির—সেই কল্পনা: একটি সংসার—কর্মময় জীবন, উদয়-পথের পরিণতি! (শান্তভাবে হাসে, যেন নিজেকে হাল্কা করতে চাইছে)—কল্পনাগুলো কিন্তু বড্ড রং-চঙে—

অঞ্জন : জেউতি, আমাদের কল্পনা—আমাদের কল্পনাকে সফল করতেই হবে।

জেউতি : ওরা দেবে না।

অঞ্জন : (উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে ওঠে) কারা?

জেউতি : পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত করছে যারা।

[হঠাৎ বাহির-বারান্দায় একটা শব্দ হয়—লুকিয়ে থাকা প্রকাশের হাত থেকে টর্চ পড়ে যাওয়ার শব্দ]

অঞ্জন : কে? কিসের শব্দ?

[বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে যায়]

জেউতি : যেও না...যেও না—(পাগলের মতো পথ আগলায়)—ও কিছু না।

(জেউতি আবার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে)—শোনো...তোমাকে আমি ফাঁকি দেব...আমি নষ্ট হব। তুমি যক্ষ্মারোগী—তুমি—

[অন্ধকারের মধ্যবর্তী রাতের ক্ষীণ আলোটাও যেন কেঁপে ওঠে !]

অঞ্জন : (চিৎকার করে ওঠে) জেউতি !

জেউতি : তুমি পঙ্গু ! আমার যৌবন আছে। বাসনা-কামনা আছে। প্রবৃত্তি আছে।

অঞ্জন : (পাগলিনী প্রায় জেউতির দুই বাহু ধ'রে) তোমার মন ?

জেউতি : হুঁ—মন ? কোনো দাম নেই। মনকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে শিখব।

অঞ্জন : (জেউতির পাশ থেকে সরে এসে) জেউতি, তোমার এই ধরণের প্রকাশ দেখে আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি। এ যেন বিসর্জনের জাঁকজমক। যাতে থাকে বিদায়ের করুণ সুর! যেন, বিদায়-সভার উদ্বোধনী-সংগীত।...আমি জানি, আমার জন্যেই তোমার আজ এই পরিণতি। তোমার রাতের ঘুমও আমি কেড়ে নিয়েছি।

জেউতি : অ-ঞ্জ-ন !

অঞ্জন : আমি পঙ্গু, আমি মৃত্যুপথযাত্রী...অথচ, তোমাকে নিয়েছি সঙ্গে জড়িয়ে। কোনো অধিকার নেই সচল জীবন্ত মানুষকে এভাবে বেঁধে রাখার...হ্যাঁ, কোনো অধিকার নেই, কোনো—

[কেশে ওঠে। কথা আটকে যায়। কেশে-কেশে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ওর কাশির মাঝখানেই জেউতি ব্যাকুল হয়ে বলে—]

জেউতি : অঞ্জন, তুমি ভেতরে যাও। কেন তুমি ভালো হবে না ? আমি তোমাকে ভালো করার সব ব্যবস্থা করব। যাও, তুমি যাও—

অঞ্জন : থাক জেউতি, এখানেই ভালোলাগছে। ওই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে দিয়ে বুকটা ভরে উঠছে।

জেউতি : না-না। তোমাকে ভেতরে যেতেই হবে অঞ্জন।

[অঞ্জন জেউতির দিকে একবার চেয়ে ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়]

অঞ্জন : বেশ, চলো।

জেউতি : না, তুমি যাও।

অঞ্জন : তুমি ?

জেউতি : আমার ভালোলাগছে না। তোমাকে অনুরোধ করছি—কিছুক্ষণ আমাকে একলা থাকতে দাও।...তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।...যাও অঞ্জন—তুমি যাও।

অঞ্জন : (বেদনা ও অভিমানের সঙ্গে) বেশ, তোমাকে বিরক্ত করব না। একা থাকলে তুমি যদি শান্তি পাও, আমি আর বাধা দেবনা।

[অঞ্জন চলে যায়। তার যাত্রাপথের দিকে জেউতি চেয়ে থাকে]

জেউতি : চলে গেল! অভিমান।...কিন্তু আমি কার ওপর অভিমান করব? ...ও হ্যাঁ—প্রকাশ হয়তো আবার আসবে। হ্যাঁ—প্রকাশ!...বেশ অন্ধকার হয়েছে।

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : তুমি—তুমি যাও নি?...না-না—। দাও, টাকা দাও, টাকা।

প্রকাশ : এই যে!—এই টাকায় অঞ্জন ভালো হবে।

জেউতি : (টাকা নেয়) হ্যাঁ, অঞ্জন ভালো হবে—নিশ্চয় হবে। (খুব আশ্বাসের সঙ্গে)—আঃ, টাকা! বেশ অন্ধকার হয়েছে। অঞ্জন বলে—অন্ধকারের মধ্যে এক নিবিড় সৌন্দর্য সুপ্ত হয়ে থাকে—সব একাকার হয়ে যায়—

[জেউতির কথার মধ্যে প্রকাশ ডাকে—]

প্রকাশ : জেউতি—

[জেউতির কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ; অনর্গল বলে যায়]

জেউতি : হ্যাঁ, রাতগুলো খুব ভালো...রাতের অন্ধকার পাপ করার পক্ষে ভালো। ...চলো—

[হঠাৎ জেউতি প্রকাশকে জড়িয়ে ধরে ; তার বুকের মধ্যে উন্মাদিনীর মতো হয়ে প্রায় আত্মসমর্পণ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে দুজনে কয়েক পা এগিয়ে যায়। মঞ্চের ক্ষীণ আলো কাঁপতে থাকে। একটা ভীষণ মুহূর্ত উপস্থিত হয়।...জেউতি মাথা ঠিক রাখতে পারে না ; প্রকাশকে সেইভাবে জড়িয়ে ধরে থাকা অবস্থাতেই পাগলিনীর মতো খিলখিল হেসে ওঠে—]

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রকাশ : জেউতি!

জেউতি : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[ভয় ধরানো খিলখিল হাসি তখনও জেউতির কণ্ঠে বেজে চলেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে অঞ্জন প্রবেশ করে]

অঞ্জন : (চিৎকৃত কণ্ঠে) জেউতি! জেউতি!

[সঙ্গে সঙ্গে জেউতি 'অঞ্জন' ব'লে চিৎকার ক'রে অঞ্জনের কাছে দৌড়ে এসে বলে—]

জেউতি : অঞ্জন! টাকা! তোমার বন্ধু দিয়েছে—অনেক!

[অঞ্জনের সামনে হাতের মুঠি খুলে দেয়। টাকাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অঞ্জন লাইট জ্বালায়। মঞ্চ আলোকিত হয়। প্রকাশকে দেখে অঞ্জন শিউরে ওঠে—'প্রকাশ' ব'লে প্রকাশের দিকে রেগে এগিয়ে যায়। প্রকাশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

অঞ্জন : প্রকাশ !

জেউতি : অঞ্জন, (দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে) হিঃ হিঃ হিঃ—প্রকাশকে তুমি মারতে পারবে না।...একজন প্রকাশকে মেরে সাধারণ হতে তোমাকে আমি দেব না। হিঃ হিঃ হিঃ—সাধারণ—হিঃ হিঃ হিঃ—

[জেউতির দুই বাহু ধরে অঞ্জন জোরে নাড়া দেয়]

অঞ্জন : জেউতি—জেউতি !

[জেউতি হাসি বন্ধ করে একবার অঞ্জনের দিকে তাকায়। পর মুহূর্তে হাসির পরিবর্তে আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে]

জেউতি : (কাঁদে) অঞ্জন !

অঞ্জন : (জেউতিকে জড়িয়ে ধ'রে) ঠিকই বলেছো জেউতি—একজন প্রকাশকে মেরে কোন লাভ নেই। প্রকাশের যিনি সৃষ্টি করেছেন—জীবন দিতে হলেও—(আবেগের সঙ্গে)—সেই বিরাটের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে, জেউতি।

জেউতি : অঞ্জন !

অঞ্জন : চলো জেউতি।

[জেউতিকে নিয়ে অঞ্জনের প্রস্থান। টাকাগুলো মঞ্চেই ছড়িয়ে পড়ে থাকে। এতোক্ষণ প্রকাশ একই জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্ষণপরে, সভয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ যেন উপলব্ধি করে—'এই পৃথিবীতে আমি একলা']

প্রকাশ : (আত্মজিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) হুঁ ! আমি একা ?

[নিজের মাথার চুলগুলো টেনে-টেনে দেখে। পেছন থেকে নেওগ এসে প্রকাশের কাঁধে হাত রাখে। প্রকাশ চমকে ওঠে—]

—কে ? (সভয়ে পিছিয়ে যায়)—তুমি ?

নেওগ : অন্নদাতা ! আমি কিছু করতে পারি ?...তোমার পরাজয়, তোমার পরিবর্তন, তোমার আত্মদ্বন্দ্ব এ জীবনে না দেখতে পেলে আমার অতৃপ্ত আত্মা কি শান্তি পাবে ?

[তৃপ্তিতে চোখ বুজে আসে]

প্রকাশ : নেওগ !

নেওগ : (কাঁধে হাত রেখে) চলো, বন্ধু।

[প্রকাশ বিস্মিত হয়ে নেওগের দিকে একবার চায় ; পরমুহূর্তে অঞ্জনের ঘরের দিকে দ্রুত যেতে থাকে]

—(আশ্চর্যান্বিত) কোথায় যাচ্ছ প্রকাশ ?

প্রকাশ : অঞ্জনের কাছে।

নেওগ : প্রকাশ !

প্রকাশ : অঞ্জনকে বলা দরকার—জেউতি পবিত্র হলেও অঞ্জন শুদ্ধ নয়। জেউতির

সামনে অঞ্জন খুব ভালো মানুষের অভিনয় করলে, যেন কতো মহৎ! কিন্তু অঞ্জনকে বুঝিয়ে দিতে হবে সে কতো নীচ! মানুষ হিসেবে আমার চেয়েও কতো হীন! আমি যা বিশ্বাস করি, যা স্বীকার করি, তাই করেছিলাম। কিন্তু অঞ্জন যা বিশ্বাস করে না, তা-ই করেছিল। সব জেনেশুনেই আমাকে ডেকে এনে অঞ্জন জেউতির কাছে না-জানার ভান করে আছে। অথচ, জেউতিকে না পেলে ওকে যে আমি সাহায্য করব না, একথা অঞ্জনের চেয়ে বেশি আর কে জানে?

নেওগ : প্রকাশ!

[প্রকাশের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই]

প্রকাশ : অঞ্জনের সেই মুখোশটা খুলে দেওয়া উচিত।

[সবেগে ভেতরে চলে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসেনাটকের যবনিকা]

বিভ্রাট

ভোলা কটকী

চরিত্রাবলী ঃ

গায়নবরা
পিসী
কনবাপু
রঙিলী
গাঁওবুড়ো
যজ্ঞ
ঠগী

প্রাসঙ্গিক

'চিত্রবন' 1/4 সংখ্যা, 1956। মূল স্বত্ব—শ্রীভোলা কটকী, মাধব, জামুগুড়িহাট, আসাম। কটকীর অভিনয়েও অনুরাগ আছে। মাঝখানে কিছুদিন একটি ভ্রাম্যমান নাট্যসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

[গায়নবরার বাড়ি। সকাল প্রায় আটটা বাজে। বাইরের ঘরে একটা ভাঙ্গা চেয়ার আর দুটো মোড়া রয়েছে। গায়নবরা ঘেমে-জুমে প্রবেশ করে]

গায়নবরা : (মোড়ায় বসে) এ-ই! কে কুথায় আছস বটে? (ভেতরদিকে তাকায়)...রঙিলী...অ' রঙিলী...এই কনবাপু—

পিসী : (নেপথ্য থেকে) কী হল আবার?

গায়নবরা : হুঁকো এ্যাকছিলিম লয়্যা আহ্ দেহি।

[হাতে হুঁকো নিয়ে পিসীর প্রবেশ]

—দে।...(দুটান খায়) এ-ই! এরা সব কুথায় গৈ মরিসছে, হঁা?

পিসী : তাদের ধর্। মুই কি পোল্কে ধরি ঘুরিসি নাকি?

গায়নবরা : (হঠাৎ গলায় ধোঁয়া আটকে কাশে) দ্যাহ্—কোন্ কুকুরের পো-ঝিয়ে কিবা কয়—হঁা! বসায়-খোয়ায় তোমার শান্তি নাই। (হুঁকো টানে)—কতো আর ভাবি বটে!—আইজ কয়, তোমার পোলা ঝগড়া বাধাইসছে; কাইল শুইনবা, তোমার পোয়ালটা পলাইসছে। হে প্রভু! এই সংসার থিক্যা আমাকে টানি নাওস্না ক্যান্—হঁা?

[কনবাপুর প্রবেশ]

কনবাপু : পিতাই...পিতাই...এগটা কথা আছে যে—

গায়নবরা : হা—কুথা থিক্যা কিবা এ্যাকখান্ আবার বাধাই আইস্ছ? তোরা আমাকে মারি ফ্যালাওস্না ক্যান্—হঁা?

কনবাপু : অ মা, দেখিস্ছ! তুমি যাইই না কও, রাগটি তোমার চুলের আগেতেই থাইকবে।...এই...কী য্যান্ কয়...পিতাই! জামাইবাবু কৈ পঠাইসে রঙিলী দিদিকে কইতে—তার বর আইজ আহি লয়্যা যিবে। তোকেও ঘরে থাকতি কৈস্ছে। [প্রস্থানোদ্যত]

গায়নবরা : বটে! তুই আবার জামাইয়ের লাগাল্ পেলি কুথা?

কনবাপু : মুই কাইলই তার থানে গেসিলাম না?

গায়নবরা : হা—মুই কি তোকে জামাইয়ের ঘরে পেঠাইসিলাম? আজ তিনদিন হ'ল—কালো গরুটা নাই। তোদের তো অলপ ভাবতি হয়! তোরা মোর মুড়োটা ক্যান্ ঘোলা করি দাও বটে?

কনবাপু : মুই গরু খুঁজতিও গেস্লাম না?

গায়নবরা : কোন্ পিরথিবীতে খুঁজতে গৈস্ছিলি—হঁা? গরু আহিবর হবে, দৌড় মারিবি। খেলা, কেবল খেলা, খেলা।...দ্যাহ্, এইভাবে ফুরফুরিলে ক্যাম্নে হয় বটে?...তা' গায়েতে যদি এ্যাতোই বল হৈসছে, ঘরেতে কুটা এ্যাকগাছি ছিঁড়্তি পারনা ক্যান?

কনবাপু ঃ তোরা তো সদায় বল খেলিতেই দ্যাহ। তোরা বলখেলার মর্মটা কী বুঝস্ ?

গায়নবরা ঃ (দাঁড়িয়ে উঠে, তাড়া দিয়ে) মুখ ভ্যাঙাই আহে দেহি। এ্যাক্কেবারে বুঝাইস্ দিমু...চিনস্ নাই ! দেহিছি না—বল খেলি খেলি মোর ঘর-দুয়ার মেডেল-কাপে ভরাই ফেইলছস্—হঁা ! (বসে)—পাছাতে নেহাৎ কাপোড় এ্যাকহাত না দিলি নয়—তার এ্যাতো ফুটুনি ! আইজের পর যদি তোর বল খেলার নাম শুনি—

[কনবাপুর ভয়ে ভয়ে প্রস্থান]

—রঙিলী, অ রঙিলী। দেহি, সেই সুপারির বাটাটা লয়্যা আন্ তো।

[সুপুরির বাটা নিয়ে রঙিলীর প্রবেশ]

রঙিলী ঃ পিতাই, তুই সুপরি কাট্, অ্যা ? মুই আগুনে এট্টু পানি দি আহি।

গায়নবরা ঃ পানিহুনি লাগে না, মা। তুই সুপারি কাট্তো এ্যাটটা। (থেমে) —এই ! তোরা সব ঘরে না থাকি কুথায় গৈ মরস্—হঁা ?

রঙিলী ঃ মুই কাকাদের ঘর থিক্যা চা-পাত আনতি গিসলাম।

গায়নবরা ঃ (বিস্মিত হ'য়ে) কী ! চা-পাত আনতি গৈসিলি ? হা—মুই তো পরশুই চা-পাত এ্যাক-ছটাক আনি দিসলাম, সব শেষ কইরলে—হঁা ! এইভাবে সক্কলে আমাকে এ্যাক্কেবারে লাউখোলা করিবে যে !

রঙিলী ঃ কাইল অতিথি আইসছিল না ? আর...আচ্ছা পিতাই, কনবাপু গরুর খবর কুথাও পাইলে নি ?

গায়নবরা ঃ হা—তুইও য্যামন মা ! সে-যে কতো গরু খুঁজি ফিরিসছে, মুইই জানি ! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) ঈটার দ্বারা আমার সুখ হবে নি। তার খেলা, কেবল খেলা—

রঙিলী ঃ পিতাই, নে, সুপরি খা। মুই কাপোড় কয়টা খইচ্যা মারি আহি।

গায়নবরা ঃ র' মা র'। কী-য্যান বলে...কথা এ্যাট্টা শুনবি ?...এই...তোমার কনবাপুর কাছে জামাই কৈ পাঠাইসছে...মানে...সে নাকি নিজে আহি তোকে লয়্যা যাবে। তুই আর গণ্ডগোল বাড়াবি না মা। তুই তো দেখছসই.. মুই মানুষটা আর কতো ভাবি বটে ?

রঙিলী ঃ পিতাই ! ওইগুলা আমাকে কইবি না। মুই লোকের কাপড় বুনি খামু, তথাপি—

গায়নবরা ঃ রঙিলী ! তুই সেই কথা ক্যান বলিস বটে ?...মনিস্যির মন সদায় এক-ভাবে থাকে না, মা। তা' সে যিদিকে—

[বাইরে গাঁওবুড়ো হাঁক দেয়]

গাঁওবুড়ো ঃ (নেপথ্যে) বরা, অ গায়নবরা—আছ হে ?

রঙিলী ঃ ওই, আবার এয়েলেন !

[হুঁকো তুলে নিয়ে রঙিলীর প্রস্থান। গাঁওবুড়োর প্রবেশ]

গায়নবরা : এহ্ হেঃ—গাঁওবুড়া হে ! মুই...এই...তোমার ডাক ধরতি পারি নাই। কৃষ্ণ ! (দুজনে প্রণাম জানায়)—বহ।

গাঁওবুড়ো : না, না, বহাবহি নাই। মোটের ওপরেতে মোকে তড়াতড়ি যাতি হবে। সিদিকে, তোমার সেই দেওডির ঘরে পৌঁছতি হবে। (একটু দম নিয়ে) মুই...এই এয়লাম...তোমাকে সেই সভাটার কথাখান সুধিয়ে যাব বুলি। মুই ভাবি—কি জানি, তুমি পাহরিলে বুঝিবা !

গায়নবরা : কোন সভাটার কথা কৈছ বটে ?

গাঁওবুড়ো : এহ্ হেঃ—সেই—গুণাইয়ের ছুঁড়িটার হে।

গায়নবরা : অ'...তা' কোন মেয়েটার কথা যান কইলে ?

গাঁওবুড়ো : এহ্ হেঃ—কী যান কয় তোমার...এই, কী বলে না...সেই সেই যে ফ্যা-ফ্যা-ফ্যাচাঙ হে...সেই যে পুখরের পাড়ের...। মোটের ওপরেতে, চেনাই পেয়াদা নিছিল। গোধূলি। সেই কীর্তনঘরে তুমি আবার যাবা। (কিছুটা গিয়ে ফিরে এসে)—গায়নবরা, হঠাৎই, কথা এ্যাটটা মনে পড়ল, তুমি না আবার কী ভাবো—

গায়নবরা : কী ?

গাঁওবুড়ো : এই...না...মানে—তোমার মেয়্যাকে কি থুই আহিলে ?

গায়নবরা : আর কইবা না, বুইসছ ! সেই তাকেই বুঝাইতেসিলাম। সে না যায়, না কিছু কয় ! মোর মহা পয়মাল হৈসছে গাঁওবুড়ো।

গাঁওবুড়ো : তাইতো ! হাঁ দ্যাহ, (কাছ ঘেঁষে)—তুমি তড়াতড়ি থুই অহার বন্দবস্ত কর, বুইছ ? মোটের ওপরেতে, পরে-পশ্চাতে যাতি হতি পারে। (গাঢ় কণ্ঠে) —গায়নবরা ! মুই কাইল আমাদের মৌজাদারের ঘর থিক্যা, পুঁথি-পড়া ভাঙ্গি অহাকালে, সেই সতিনা পুষ্করিণীর পাড়ে, কেন্দুগাছের তলে, দুই জনাকে বহি—সম্পরতিকে মুই, মোটের ওপরেতে, নাম দুটা কইব না—য্যান দশখান মুখে খৈ ফুটত্যাসে। বুইছ ?

গায়নবরা : হা ! কী হৈছে ? কার কথা কইসছ ?

গাঁওবুড়ো : এহ্ হেঃ—তুমিও যামোন ! কথাতেই আছে না—কালাকে বলা আর চরকাতে শলা !...তোমার মেয়্যার কথা হে ! মোটের ওপরেতে, তুমি কী কইসছ ?...এহ্ হে—তুমি হলে, মোটের ওপরেতে গুবাহাটি এ্যাকেবারে রাঙামাটি হৈ যেত। মোর তো সারারাত ঘুম অহা নাই। তা, হ্যা, মোটের ওপরেতে, যা হয় এ্যাটটা হেস্তনেস্ত করি ফ্যালো। মুই কিনতুক পষ্টো কৈ দিলম। পরেতে মোকে দুইষবে না।

[গাঁওবুড়ো প্রস্থানোদ্যত। হুঁকো হাতে রঙিলীর প্রবেশ]

রঙিলী : হো জ্যাঠাই—

গাঁওবুড়ো : (ঘুরে) আচ্ছা, দে দেহি, দুটান টানি যাই। (তামাক খেতে থাকে) সেই যে, কী য্যান কয়—অ রঙিলী, তুই আবার কিহের গোঁ ধইরছস্ অ্যাঁ ? ঈসব মন্দ হৈছে না ?

রঙিলী : তোদের তো আমাকেই কামোড় খালি। লোকেরটাই সদায় দেখিস, খুঁজি খুঁজি ঘুরিস। নিজের বেলা হ'লে—

গাঁওবুড়ো : এইতো—এই কারণেই মুই কথাটি কই না। ভালো বলি, মন্দ শুন।...বাপের খাইছ, আছ, মোর কিবা ভাঁড়ার ভাঙ্গিছ, হ্যা? তথাপি, সমাজের এ্যাটটা নিয়ম আছে তো!

গায়নবরা : গাঁওবুড়া, মুই তো তাকে সদায় বুঝাই, বলি—লক্ষ্মী মা, তুই—

রঙিলী : মুই বুঝছি তো।

গাঁওবুড়ো : সেই বুঝ। আর, কথাটা গভীর করি ভাবি চিন্তি দ্যাহ—এই বাপের জুগ্যি মানুসটা আজ কিবা কৈতি আছে। মোটের ওপরেতে, মোকে শ্যাষ পজ্জন্ত আসতিই হল।

গায়নবরা : মুই অসহায়, গাঁওবুড়া।

গাঁওবুড়ো : মুই তো, মোটের ওপরেতে, না কইলেই পারতম। কিনতুক পিছে তোমার হাত-পা বানধা—না ডাইকলেও আসতি হয়, কৈতি হয়। মোটের ওপরেতে, ঈদিকে হলম সরকারের পদ-অধিকারী মোড়ল, সিদিকে হলম তোমার পঞ্চায়েতের মেম্বর। আসলে, মোর লগানী-ভগানী স্বভাবখানি নাই—তুমি তো জানোই।...গায়নবরা, সিদিকে সেই ঠগী না—দারুকা সিপাহীর কথা কৈ...এঃ, তোমার তন্দ্রা লাইগছে!...আচ্ছা, দ্যাহ, তোমার ঘরের ভিটেতে যদি, মোটের ওপরেতে, দারুকা সিপাহী পা-খান দেয়, তুমি তবে, মোটের ওপরেতে, কাইল সমাজে মুখটা ক্যামনে দ্যাহাও? (থেমে)—ভাবি-চিন্তি দ্যাহ...মুই বড় নিজের ভাবি কথাটা কৈছি।...আচ্ছা, মুই যাই। কৃষ্ণ! (যায়; আবার ফিরে এসে)—রঙিলী। তুইও মা কথাটা, মোটের ওপরেতে, চিন্তা করি দেহিবি—মুই যা কইলম।...মুই আহি তবে।

[গাঁওবুড়োর প্রস্থান]

গায়নবরা : রঙিলী! দেখছস—কথাগুলা ক্যামোন বিস্তার হৈসছে!

রঙিলী : (কাঁদে) তোরা—ক্যান জানিনা পিতাই—না বুঝি, ওপরে ওপরে কও!

গায়নবরা : তুই কান্দিস ক্যান বটে? সে আহিলে মুই এ্যাটটা ব্যবস্থা করি পাঠাব নিশ্চয়।

[নেপথ্যে ঠগী এবং যজ্ঞ]

যজ্ঞ : (নেপথ্যে) খুড়'...অ খুড়'।

গায়নবরা : হা—(বাইরের দিকে দেখে)—অ মা, ওঁরা আহি পড়িসছে তুই যা—এটটু পানি-চুনি—

রঙিলী : মুই পানি-চুনি দিতি পাইরব না—যা। [প্রস্থান]

গায়নবরা : ঈস রাম! দেহিছ বটে!

[যজ্ঞ এবং ঠগীর প্রবেশ]

যজ্ঞ : খুড়'! কী কইরতিছ?

গায়নবরা : এইযে, অ ময়না ! তা, দাঁড়িয়ে রইলি ক্যান ? বহ বোপাই, বহ। সিদিকেই—

[ঠগী ও যজ্ঞ বসে]

যজ্ঞ : খুড়' ! লাও—কুটুমকে মুই নিয়্যা এলম...এ্যাহন যাহোক এ্যাটটা—

গায়নবরা : বটে বোপাই ! নে, সুপারি বাছি খা তো—(সুপুরি দেয় ও খায়)—হাঁ যজ্ঞ ! কথাগুলা তুই ভাল্ করি, মনোযোগ দি' শুইনবি বোপাই !...তুইতো ছোটকাল থিক্যাই দেখছস—মা মোর কতো আদরের ঝিয়ারী ; আর, বিয়াটাও ক্যামন রমরম করি হয়্যা গেল। তোরা তো সবই জানস।...এ্যাহন আসলেতে মুই বড় দুখ পাইসছি বোপাই। কারণ, পোয়ালীটির পিঠখান এইভাবে ফালা-ফালা কইরবে জানা হ'লে মুই বোপাই কদাপিও—

যজ্ঞ : ঈসব কথা ছাড় খুড়'। মুই কুটুমকে মোর ঘরেতে বুঝাই-সুঝাই আইনছি ; তোমার কি আমাকে তোমাদিগের ঘরের কথা কইতি হয় ? মুই য্যান তোমাদের ঘরের কোনো কথা না জানি !

গায়নবরা : বোপাই, মুই পিছনে-কওয়া মানুস নয়। বলে না—কুটুমের সামনে কবা, হাতীর কপালেতে খুঁচিবা। মুই বোপাই পোয়ালীকে এইভাবে ঘরেতে অ-রক্ষণীয়া বুলিয়েই তার অলপ বয়সে কামটুকু সমাধা করি লৈসছি। সেকারণে, তাকে মারাধরা কইরলে মোর শরীরে সহে না বোপাই।

ঠগী : বেশ কথা ! তবে, মুইও কই। কারণ, সম্মুখেতেই সকল বলাই ভল। শুইনবেন বেয়াই !...মুই যে কোন্ ধরণের মানুষ, আপনি তো জানেনই। মুই কারও পরোয়া করার মানুষ নই, বুইছেন ? কারণ—মোর এইটা স্বভাব ; আর শৈশবে মার মৃত্যুর কারণে ঈটা থাকি গেল। সেকারণে যাহা-তাহা কথা কইলে মোর সইহ্য হয় না বেয়াই।

যজ্ঞ : ঠিক আছে...র' যান কুটুম...আমাকে কইতে দিয়েন।

ঠগী : কয়েন। আপনার মুখ তো কেউ—

যজ্ঞ : এতে—এইসকল মুই বড় মন্দ দেহি।...আজ দুয়ো পক্ষই যাহয় এ্যাটটা শেষ করি ফ্যালেন।...খুড়' ! রঙিলী আছে না নাই ?

গায়নবরা : আছে বোপাই। না থাকি যাবে আবার কুথা ?

ঠগী : বুইছেন বেয়াই ! মুই বড় সইহ্য-করা উদোম মানুস। গ্রামের সকলকে সুধোন—কারও কিবা এ্যাটটা মোর মন্দ কইবার শক্তি আছে ? মোর ভয়েতে সকলে সুরাসুর হয়না বেয়াই।

যজ্ঞ : এহ্ হেঃ—থামেন না কুটুম, থামেন। মুই সকলই সঠিক কুইছি।...রঙিলী, অ রঙিলী !

রঙিলী : (নেপথ্য থেকে) কী হৈসে ? ওইখান থিক্যাই ক'।

যজ্ঞ : ঈদিকে বার'য়ে আয় তো।

গায়নবরা ঃ দাদা ডাকে, বার'য়ে আয় মা। তোর কোনো ভয় নাই। মুই—মানুসটা তো মরি নাই। (থেমে)—পানিটাও হাতে করি লয়্যা আহিবি, মা।

[একটা থালায় তিনবাটি চা নিয়ে রঙিলীর প্রবেশ। একটা বাটি বাপের কাছে, একটা যজ্ঞের কাছে, বাকি বাকিটা থালাতেই রেখে দেয়]

যজ্ঞ ঃ উটা আবার থালাতে থুলি ক্যান? দে, নিকটে দে।

গায়নবরা ঃ তুই আবার কী করতি চাস মা! দে, আগ বড়াই দে, মা।

রঙিলী ঃ পিতাই...মুই—(কাঁদতে থাকে)

[ঠগী উঠে দাঁড়ায়]

ঠগী ঃ বেয়াই, মুই চা-ফা খাব নি। মুই যাই, বুইছেন! মোরে যথাতথা অপমান! মোকে এই কামোড...ওই হিংসাতেই খাইসে। মোকে কুকুর হ্যান বুলি ভাবি থাকে যদি—

গায়নবরা ঃ আ—বোপাই ঠগী! র' যা, র' বোপাই। নারীজাতি, বোপাই, স্বভাবেই অবলা।

ঠগী ঃ এঃ—নারী জাতি!

যজ্ঞ ঃ কুটুম, আপনি এ্যাতো উচল-বিচল হইসছেন ক্যান?

ঠগী ঃ উচল-বিচল নয় বোপাই...মুই ঢের সইহ্য করসি।

গায়নবরা ঃ রঙিলী! তুই মোর ঘরে এই আথান্তর বড়াই থাকিলে আর দাহা পাবি নি, মা!

[গায়নবরা চায়ের বাটিটা ঠক ক'রে মেঝেয় রাখে। ব্যাপার দেখে—'দোব কি দোব না' করতে করতে—রঙিলী চায়ের বাটিটা এগিয়ে দেয়]

যজ্ঞ ঃ কুটুম! এ্যাহন ধরেন তো!

[ঠগীকে যজ্ঞ জোর ক'রে বসিয়ে দেয়]

গায়নবরা ঃ হ্যা বোপাই—ঠাণ্ডাই হল বোধয়। খা, বোপাই, খা।

[তিনজনে চা খায়]

যজ্ঞ ঃ খুড়'! এইবার সমাধা করা যাউক। দুয়ো পক্ষই আগের কথা সব ছাডান দিয়েন। তাই না কুটুম?

গায়নবরা ঃ মুই যদি আগ-কথা-ধরি-থাকা হতম—বুইছস যজ্ঞ—এ্যাদ্দিনে জিলায় যাতি হত। মুই কি অবুঝ? হ্যা বোপাই! মুই খাইতে-বসতে সদায় মেয়েকে বুঝাই।...কিনতু বোপাই ঠগী, তোকে মোর কাছে এ্যাটটা বাক্যি দি যাতি হবে; তুই যদি বৌ নি' আগের মতো মারাধরা করস, তবে বোপাই, মোর হেথাই থাকা ভালো।

ঠগী ঃ পিতাই! আমাকে ঈসব কথা শিখাতি হবেক না। মুই আপনার জীয়ারীকে কী দি' নাই—সুধোন?.. শুনছেন বেয়াই?—মাঝেতে, 'জিলায় যাব' কইল, মুই-মানুসটা নিজে সাথে লৈ গ'লম; নগদ পাঁচ-ছ টকা খরচ করি ঘুরাই-

বেড়াই আনছি। আবার, 'বায়সকোপ দেইখব' কইল, মুই তাও দেখাইসছি। তদ্‌পরি, যি মুহূর্তে যা লাগে, কইতেই, মুই মরা-হাজা হলেও আনি দিছি।... এ্যামোন কি—

যজ্ঞ : হাঁ, হাঁ—ঈসব আবার কৈত্তি হয় নাকি ?

ঠগী : বেয়াই! আপনি তো জানেনই—ক্রোধ নামেই চণ্ডাল। উঠল রাগ, দিলম দু-চারখান ঝাড়ি'। তা'তে কি গৃহত্যাগ করত্তি হয় ? ভাল জাতের রমনী হলে কদাপিও করে না। যদি চাই, মুই এ্যাকেবারে বাদই দিত্তি পারি। ধন ধান থাকে—নারীর কি আকাল ?

গায়নবরা : দ্যাহ, ঠগী, ওইসকল কথা কইবি না। তুই এইভাবে ঝপাৎ গর্ম হৈ, হোক-নাহোক, হঁকার মারি-মারি কথা কৈ, নিজের দোষ ঢাকত্তি চায়েস না। আজি মুই যদি দুটা মানুস জুটাই, মানুসে তোকে দুষিবে না আমাকে দুষিবে, ক' ?

যজ্ঞ : ছিঃ কুটুম, এইসকল বড মন্দ কথা। সইত্য-মিছা যা হোক, আপনি সেইভাবে কথা কইসছেন না। আজিকালি সেইভাবে স্ত্রীজাতির গায়ে হাত দি'য়াটা আইনমতে নিষেধ। ঈশ্বর না করেন, আইজ যদি কোনোভাবে এই বিচারের ভার সরকারের হাতে পডে, আপনি তো বিঘ'রে সবংশে নিধন হইবেনই।

ঠগী : রাখেন, বেয়াই, রাখেন! লোকের ইসত্রীকে জবরদস্তি ঘরে আটক রাইখবেন, এমত আইন কোনখানেতে আছে হে ? এইরূপে লাগলে, মুইও দিখাই দিব না ? মুই সইহ্য কইরব ভাবছে ?

গায়নবরা : এহ হেঃ! তুই এইভাবের কথা কও ক্যান—হা ? মুই তোর ইসত্রীকে আনি জবরদস্তি ঘরোত থুই নাই। বাপের ঘরে ঝিয়ারী আছেই।...তদ্‌পরি, তুই যদি মারাধরা না-ই করবি, পোয়ালী আসত্তি চাইবা ক্যানে ?

[রঙিলীর প্রবেশ]

রঙিলী : মোর অসাক্ষাতে দোষ দিতে আছেন!..মুই কি করি-মেলি থুয়াই নাই ?

ঠগী : কা! (দুঠোঁট দিয়ে জোরে শ্বাস টানে) তেঃ, দ্যাহ নাই, আমাকে এ্যাকেবারে রাজপাটে উঠাই থুই আহিসছেন!

যজ্ঞ : এই রঙিলী! তোর আবার কিবা হল ? হেথা তোর কোন আবশ্যক নাই, যা—

রঙিলী : ন্‌না...অ দাদা...মুই—

গায়নবরা : রঙিলী! তুই মুখে-মুখে জবাব দিবি না বটে! হেথা তোর কিবা প্রয়োজন—হা ?

[রঙিলীর প্রস্থান]

—অ বোপাই, ঠাণ্ডা হ' বটে, ঠাণ্ডা হ'। ঈসব আর ধইরবি না বোপাই।

যজ্ঞ : হ্যা কুটুম! এইসকল কথা ধর্তব্যই নয়। অবলা নারী!

ঠগী : না বেয়াই, পাইরব না। যাউক চায় যথা, মরে মরুক তথা।

গায়নবরা : না বোপাই, সেইসকল ছাড়িস দে।...কিনতু ঠগী। তুইও ইসত্রীকে

আর কষ্টখানি দিবি না বোপাই।...আদরের ঝিয়ারী...ভুলচুক হতি পারে,—মানি ল'...ভালোভাবে বুঝাই-সুঝাই সহজ-সরল করি ল'বি।

যজ্ঞ : খুড়' হক কথা কৈছেন।

ঠগী : হক-ই কয়েন অথবা না-হকই কয়েন,...কিনতুক বেয়াই—সিদিকে মোর বাড়িখান যে বাঁশতলা হৈ উঠিসছে!

যজ্ঞ : হবই তো! আর, সেই কারণেই, কুটুম, মুই তোমাকে ধরি আনছি।

গায়নবরা : বোপাই ঠগী! তোকে তবে এ্যাহনই মোর কাছে ধরম ধরি কৈ যাতি হবে।

ঠগী : এহে—মুইও কিবা অধর্ম-ধরা মানুস? কয়েন বেয়াই, আমাকে কী ধরি শপথ খাতি হবে?

গায়নবরা : ওই হৈছে বটে, যা। মুই দিনবার শুভক্ষণ গণনা করি পোয়ালীকে লয়্যা যাব—হা?

ঠগী : দিন-ক্ষণ বিচারের কী আছে? যায় যদি, আজই যাবে। নতুবা, মুই কি কেবলই অহা-যাওয়া—

গায়নবরা : ঠিক আছে বোপাই...আইজই লয়্যা যাব।...হৈসছে? যা।

যজ্ঞ : কুটুম! এইবার উঠতি হয়।

ঠগী : চলেন। মুই তো উঠেই আছি...আপনিই তো—

[দুজনে উঠে দাঁড়ায়]

গায়নবরা : আহ বোপাইরা। বেলাও তোমার তেলতেল হৈ আইসতিছে। এইটুক সংসারের—

[ঠগী ও যজ্ঞর প্রস্থান। গায়নবরাও ঘুরে ভেতরে যায়। রঙিলী প্রবেশ করে। থালাবাটি উঠিয়ে, গুছিয়ে নিয়ে, ভাবে বিভোর হয়ে, দুঃখভারনত চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতর থেকে পিসী ডাকে]

পিসী : (নেপথ্যে) রঙিলী, অ রঙিলী!

[পিসী প্রবেশ করে]

—তুই আবার হেথা মনভার করি আছস ক্যান?...কী জানি মা, ত'র যে কখন কী ভাব, তুইই জানস। গাঁয়ে, ভুঁয়ে, সভায় কুথাও ত'মার যাবার পথটি নাই।

রঙিলী : পিসী! ক্যান তোরা আমাকে—

পিসী : ক্যান যে কই, আইজও বুঝস নাই? এই ঘর থিক্যা ক'ত পোয়ালী য্যাল-এল; মুইও বয়সী হ'লম; ত'দের দিনও দেহিছি। সিদিকে, ভাবি-ভাবি বুড়াটা নিরুপায় হৈ পড়িছে। তথাপি, ক্যান্ যে খুকীটির ভাবে—

রঙিলী : তোরা সকলে আমাকে সেই মানুসটার নিকটে—

পিসী : তুই কী-যে কথা ক'স না। কান্দি-কাটি শরীরটাকে দুঃখ দিস ক্যান? ...তা,

যা কর, কর। মুই যা দেহিছি, শুনিছি, তারেই কৈছি। তুই কিবা মোর খাই অন্ত করছস? নিজে করছস, নিজে গাইছস...ত'রই আমাকে বুঝ দিতি হয়!

রঙিলী : বুঝাইতম পিসী...বুকখান কাটি দেখাতি পাইরতম যদি—সবই বুঝতিস।

পিসী : থাক থাক। মিছাই একটি কথাকে ঘুরাই-ফিরাই ক'স। ঈসব আসলেতে মন্দই তো। মানসে শুইনলে কী বুলবে, বল। সিদিকে বুড়াটার খাওয়া-দাওয়া এ্যাকমুঠির শান্তি নাই!—

[রঙিলী কাঁসি-বাটি সব নিয়ে ভেতরে যায়। পিসী চেয়ার ও মোরাগুলো সাজিয়ে রাখে। ভেতরে, রঙিলীর হাত থেকে একটি বটি পড়ে যায়। শব্দ শুনে, পিসী রেগে ওঠে—]

—খেলি, খেলি রে কুলখ্‌খিনী, শাকিনী, ঘর-ভাঙ্গানী।...ঘরখান এ্যাক্কেবারে উচ্ছন করলি!

[পিসী ভেতরে যায়। হুকো টানতে টানতে গায়নবরার প্রবেশ]

গায়নবরা : (হঠাৎ বেলার দিকে চোখ পডে) এঃ—বেলাও তোমার অনেক হৈছে। এ-ই...এইগুলা এ্যাহনও কী করে—হা? হে প্রভু, মোর আর এই জনমে শান্তি হবেকনি দেহি।...সিদিকে সেইবা আবার কী ভাবতিছে।...(ভেতরে দেখে) রঙিলী! এই কনবাপু! শোন—তোর দিদিকে ডাকতিছি—ক'।

[অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে রঙিলীর প্রবেশ]

রঙিলী : মোরে ডাকতিছিস কেনে পিতাই?

গায়নবরা : এ-ই...কী-যেন কয়...কাপোড কয়খান ঠিকঠাক করিলি বটে?

রঙিলী : তুই কুথাকে যাবি নাকি পিতাই?

গায়নবরা : না...হ্যা।...অখনি, তাকে কৈ দিলম না...আইজই তোকে লয়্যা যাব বুলি। (থেমে)—অ মা ..তুই আর জঞ্জাল বাডাবি না, মা।

রঙিলী : আমাকে তোরা মারি ফ্যালাও না ক্যান পিতাই?

গায়নবরা : ওই কথা কৈ তুই আমাকে দুর্ব্বল করস না মা! এইবার তিতো লাগিছে।...তোর কথাটি ভাবি বড ঘরে কুটুম করি আইজ মোর এই দশা!

রঙিলী : তোরা ধন-ধানই দেখিলি পিতাই! মোর কারণে কিনতু...মোর সঙ্গের মাইয়া...উঃ মা!

[রঙিলী বসে পড়ে। গায়নবরা তার মাথায়-কপালে হাত দেয়]

গায়নবরা : ঈস ঈস ঈস! তুই লোকের কথা ক্যান কস বটে? যার যথা রাশির মিল, তথাই ভাত-চাল।

[যজ্ঞর প্রবেশ]

যজ্ঞ : খুড়'! তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হৈছে?

গায়নবরা : হহ, হহ, বোপাই। খাওয়া-দাওয়া আর কী! এই সকলেই পেট ভরাইছে। কী জানি, কানা বিধাতা আরও কী খেলা খেইলছেন!

যজ্ঞ : এ্যাহনও সেইসব চলতিছে ? রঙিলী, তুই আবার কান্দস ক্যান ?

গায়নবরা : দ্যাহ্ দ্যাহ। অখনি তো হেথা ছিলি, দ্যাহ্ নাই তার বড়াইটা...আমাকে এই ঘর ছাড়তি হবে যজ্ঞ !

যজ্ঞ : হা—ঈসব যথার্থ মন্দ বটে !

রঙিলী : তোরা ওপরে-ওপরে কিবা দেহিবি ? মোর কলিজাতে যিটা আছে, মুইই জানি। আমাকে সেই মানুসটার হাতে দি'—

যজ্ঞ : এহ্—সীসব আবার খুঁইচতাছস ক্যান ? তোর কপালে যেটি আছে, সেটি কে কাড়ি নিতে পারে ?

গায়নবরা : যজ্ঞ, আমাকে কুথাও গৈ আত্মঘাতী হতি হবে, বোপাই।

যজ্ঞ : খুড়' ! তুমি এ্যাতো চঞ্চল হৈছ ক্যান ?...মুই তাকে বুঝাইতিছি।...রঙিলী ! তুই যা, তাড়াতাড়ি কর গ্যা।

[ইতস্তত: ক'রে রঙিলীর প্রস্থান। গায়নবরা সেদিকে তাকিয়ে থাকে, পরে মুখ ঘুরিয়ে—]

গায়নবরা : আমার পো-পোয়ালী হ'তে শান্তি হল না যজ্ঞ !

যজ্ঞ : হবে নাই তো ! কথাটা হৈছে খুড়'—মেয়েকে বড় করলে য্যাহন, গলগ্রহ বুলি ভাবি তাকে খ্যাদান দিয়াটা উচিত নয়। সময়ের সাথে সাথে মিলি কাজ করতি হয়। তোমার সমাজকে ধরি থাকি, মেয়্যার মন না-মিলাই যথা-তথা বিয়া দি' দায় এড়িতে চাহিলে—পাইবেই এই ফলাফল।

গায়নবরা : হা বোপাই, জানছি...পোয়ালীর সাথে সাথে সকলই শিখছি, দেহিছি। (বাইরে তাকিয়ে)—উস, বেলা যে তোমার গিয়ে লংকা পাইল ! (ভেতরে তাকিয়ে)—এ-ই কনবাপু...অ কনবাপু ! তোর দাদার জন্যি জলপান এ্যাটটা আন বটে।

যজ্ঞ : খুড়' ! না হলেও হত।

গায়নবরা : বোপাই, তুই বহ, অঁ্যা ? মুই সাজু করি আহি, আর সিটিকেও বাহিরাই আনি...তবে যদি—

[গায়নবরার প্রস্থান। পা টিপে টিপে কনবাপুর প্রবেশ। হাতে একটা ঘটি এবং একবাটি খাবার]

কনবাপু : দাদা, নে—হাত ধো।

যজ্ঞ : দে তবে।

[যজ্ঞ হাত ধুয়ে খাবার খেতে থাকে]

—আরে ! তুই-যে লেংচা মারি ফিরিস—ঠ্যাঙেতে হল কি ?

কনবাপু : আর বলিস নি দাদা !...সেদিন, জানিস, আমাদের স্কুলের বড় ম্যাচ এ্যাকখান ছিল। কইতে, জানিস, কুথা থিক্যা জবরজং এ্যাটটা আহি এ্যামোন ধাক্কা এ্যাকখান দিলে—

যজ্ঞ : (মুখ বিস্তৃত) হাঁ !

কনবাপ্ু : এ্যাহন তবু অনেক ভালই আছি।

যজ্ঞ : তা খুড়' জানে ? না, না ?

কনবাপ্ু : এহ্—তুইও য্যামোন দাদা।...পিতাই শুনলে মোকে ঘরে ঢুকতি দিবে ? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে)—রঙিলী দিদি যেলে মোর যে মহাবিপদ আহিল্ দাদা !

যজ্ঞ : হেঁা !...তোকে এই বল খেলাই নাশ করবে, বুইছস ? হ্যা—সকালে হাল বাইছস, বৈকালে বীজ রুইছস, তা নয়—সেথা বল খেলাটা ক্যানে ? তোর তো ঘরের পানেও চোক দিতি হয়...নাকি ? এই বুড়াটা কাইলই যদি কাত হয়, মজা দেহিবি তবে।

কনবাপ্ু : না দাদা, পাইরব নি।

যজ্ঞ : এহ, পাইবব নি। দ্যাহ্—সময়-অসময় না বুঝি এ্যাহনই যদি বল খেলি খেলি দেহটাকে ঘুণ করি ফ্যালাও, তবে মোর বয়সে করবি কি ?

[একটা লাঠিতে একদিকে একটা ফুটকিওয়ালা সুটকেশ, একটা কুঁজো, অন্য-দিকে একটা কাপড়ের পুঁটলী আর একটা দোনা বা দুধ দুইবার পাত্র চাপিয়ে নিয়ে গায়নবরা প্রবেশ করে...এবং ভারটা নামিয়ে রাখে]

গায়নবরা : বোপাই, তোর খোয়া হৈসছে ? এই কনবাপু, তোর দাদা নাহয় বিড়ি-ধোঁয়াপাত খায়নে ; যা' না, এ্যাটটুকরা সুপারি বাছি আনি দে।

[কনবাপু চলে যায়]

—পোয়ালীর মনটা এ্যাহনও বড় গম্ভীর, যজ্ঞ !

যজ্ঞ : কী আর করবা খুড' ! (ঈষৎ পরে)—রঙিলী, অ রঙিলী !

পিসী : (নেপথ্যে) সিভাবে ডাকলে রঙিলীর সাড়া পাবি বোপাই ?...হ্যারে, দাদা ডাকে, যাস না কেনে ?

যজ্ঞ : রঙিলী ! ঈদিকে আয় তো !

[রঙিলী প্রবেশ করে]

—আরে তুই, এ্যাহনও সাজু হস নাই ? এহ্—তুই শেষ পজ্জন্ত আমাকে লঘু করি ছাড়বি নাকি ? মুই কতো হুজ্জৎ করি—

রঙিলী : দাদা ! তোরা আমাকে বুঝলি নি। পিতাই আমাকে—

[কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ে]

যজ্ঞ : তুই কী কথাখান ক'স—অ্যাঁ ? দ্যাহ্—তোর কারণেই এই বাপের কী দশাখান হৈছে ! বুডাটাকে আজি সমাজে কী-পরিমাণ হেয় কইরতিছে. তুই কি বুঝস না ?...এ্যাহন তোর কারণেই বাপটা যুগ-যুগান্তরের সমাজটাকে ত্যাগ দিতি পারে না। তোরও অলপ বুঝা দর্কার।

[রাগে মুখ ঘুরিয়ে বসে]

গায়নবরা : (জড়িয়ে জড়িয়ে) যজ্ঞ, মুই আর পারি না বোপাই—মোর...মোর...

[গায়নবরার ফিট হয়ে যায়। হাতে একটুকরো সুপুরি নিয়ে কনবাপুর প্রবেশ]

কনবাপু : (বিস্মিত হয়ে) পিতাই ! পিতাই ! দাদা, পিতাইয়ের কী হৈছে ?

যজ্ঞ : অ রঙিলী—বুড়াটার—

রঙিলী : পিতাই ! পিতাই !...দাদা !

[কান্নাকাটি হুলস্থূল বেঁধে যায়। তাই শুনে, ভেতর থেকে, পিসী চেঁচায়—]

পিসী : (নেপথ্যে) কী হৈসে তোদের ?

[পিসী প্রবেশ করে]

—দাদা !...যজ্ঞ, দাদার কী হল ?

যজ্ঞ : দেখতিছি। শোয়াই দে...শোয়াই দে...পানি আন...শোয়া—

[জল আনা হয় ; শোয়ানো হয়]

রঙিলী : পিসী, মুই গাঁওবুড়া জ্যাঠাকে ডাকি আনি ?

পিসী : আনতি হবে নে। তোর কারণে যা হবার, হৈসে। বুড়াটাকে তুইই মারি ফেলাবি আর কি !

কনবাপু : দাদা—পিতাইয়ের কী হবে, অ্যাঁ ?

[কাঁদতে থাকে]

যজ্ঞ : এই—কান্দবি না...পানি দে।

[বুড়োর মুখে রঙিলী জল দেয়, চোখে জলের ছিটে দেয়। বুড়ো চোখ পিটপিট করে তাকায়].

গায়নবরা : উস্ প্রভু !

পিসী : দাদা ! তোমার কী হৈসে ?

রঙিলী : পিতাই ! তুই কেনে চিন্তা করিস ? মুই যাব পিতাই, মুই যাব। তুই ভাল হ'।...মুই—

যজ্ঞ : রঙিলী ! তুই যা মা...দেরি করিস নাই।

[গায়নবরা চোখ মেলে চারদিক দেখে]

গায়নবরা : উস্ প্রভু !...আমার...আমার কী হৈসছিল ? অ যজ্ঞ ?

রঙিলী : পিতাই, আর এট্টু পানি দি ?

যজ্ঞ : লাগবে নে মা...তুই যা। এই সময়ে বুড়াটা আবার দ্যাহে যদি—

গায়নবরা : যজ্ঞ ! রঙিলী সাজু হৈসছে ?

যজ্ঞ : সে যাবে খুড়'। তুমি ভাববা না তো !

গায়নবরা : সে সাজু হৈসছে ! হাঁ !...রঙিলী, তুই, তুই...

পিসী : তুই আবার দাঁড়'য়ে আছস্ কেনে বাছা ? মইরলে শান্তি পাবি নাকি ?

[ইতস্তত: করে রঙিলীর প্রস্থান]

যজ্ঞ : দিদি ! তুমিও যাও তো...তবে যদি সে শীঘ্র করে।

গায়নবরা : রঙিলী ! বেলা যে যায় !

[পিসীর প্রস্থান]

কনবাপু : দাদা, মুইও দিদির সাথে—

যজ্ঞ : যাতি তো হবে। কিন্তু—যাতি পাইরবি ?

কনবাপু : মুই পাইরব দাদা। পাইরব।

[প্রস্থান]

গায়নবরা : যজ্ঞ ! সে সাজু হৈসছে ! কনবাপু...রঙিলী—তোরা—

যজ্ঞ : খুড়' ! সিসব তুমি ভাববা না তো ! মুই আছি না ?

গায়নবরা : তাকে মোর নিজে লয়্যা যোয়া উচিত—

যজ্ঞ : খুড', তুমি ! এই শরীরে ? যাও, এ্যাট্‌টা গড়ান দাও গিয়া, তবে যদি—

গায়নবরা : এ্যাট্‌টা গড়ান্ ক্যান্ বোপাই ? মুই ভাল করি গড়াইব। যজ্ঞ, তুই-ই তাকে লয়্যা যা। মুই তোকে পাহরিতে পাইরব না, বোপাই !

যজ্ঞ : খুড়' ! ঈসব ক্যান্ কও ? তার সাথে মুই যাব, কনবাপু যাবে। তুমি যাও, শান্তিতে এট্‌টু শোও গিয়া।

গায়নবরা : শান্তি ! শান্তি ! ইহ্ জনমে শান্তি কুথায় ? বোপাই ! খুব, খুব, ভাল করি খুব। হে প্রভু ! এই মোর সংসার ! না যজ্ঞ, মুইই বরং তার সাথে—

যজ্ঞ : খুড়' ! এ্যাট্‌টা কথাকে ক্যান্ তুমি বারংবার কও বলো তো ?

[অন্দর থেকে মুগার চাদর, মেখেলা পরে রঙিলীর প্রবেশ। প্রথমে প্রণাম করে পিতাকে]

রঙিলী : পিতাই, মুই বা'র হলম। (অস্পষ্টভাবে)—দাদা !

[যজ্ঞর দিকে মাথা নামাতে যায়]

যজ্ঞ : হৈছে, হৈছে...থাক্ বোনটি।

গায়নবরা : (উদ্দীপ্ত হ'য়ে) হা—তোকে ঈশ্বর মাথার চুলের সমান আয়ু দিয়েন মা।...মা, আইজ হেতে তুই ভাল করি মিলমিশ থাকবি। না মরা পজ্জন্তে মুই যাতি থাইকব, মা।

যজ্ঞ : আচ্ছা, মুইও সাজু করি আহি খুড়'।

গায়নবরা : যা বোপাই, বেলা কইরবি না।

[যজ্ঞর প্রস্থান। রঙিলী উঠে পিসীর কাছে বিদায় নিতে যায়। গায়নবরা বসে থেকে ছটফট করে]

রঙিলী : (নেপথ্যে) পিসী ! মুই তবে চলি। মোর কারণে আজির পর, তুই—

পিসী : (নেপথ্যে) আহ মা। মন খারাপ কইরবি নি। সময় পালে মুইও যাই দ্যাহা করি আইসব, মা। আজির পর তুই কান্দি-কাটি থাকবি নি, মা।

গায়নবরা ঃ (মুখে বেদনা, চোখে জল নিয়ে) হেঃ—এরা ভিতরে করে কি বটে ? আবার কান্দা-কাটা—

[দ্রুত ভেতরে চলে যায়]

—(নেপথ্যে) তুই তো ভাল্ দিনে, ভাল্ ক্ষণে বার হৈছস্...কান্দা-কাটা করস্ ক্যান্—হাঁ ?

[যজ্ঞ ডাকে বাইরে থেকে—]

যজ্ঞ ঃ (বাইরে) খুড়', অ খুড়' । এরা দেহি—

[নতুন পোষাক প'রে ক্রন্দনরত কনবাপু আসে । বিপরীত দিক থেকে যজ্ঞ প্রবেশ করে । কনবাপুকে দেখে যজ্ঞের মনও ভিজে ওঠে]

যজ্ঞ ঃ (কান্নার সুরে) কনবাপু, তুই আবার কান্দস্ ক্যান্, অ্যাঁ ? কান্দবি না ; যা যা ।

[হাতে একটা প্রদীপ নিয়ে কনবাপুর প্রস্থান । যজ্ঞ তারপর ভেতরের দিকে যায়, আসে । রঙিলীকে বোঝাতে বোঝাতে বুড়ো বেরিয়ে আসে—]

গায়নবরা ঃ যা মা, যা । ওই যজ্ঞ দাদা আহি বইস্যা আছে । বোপাই যজ্ঞ, পা চাইল্যা যাবি, তবে যদি বোপাই বেলা পড়ার আগে পোঁছি যাও ।

[রঙিলী ধীরে ধীরে যায় । দেখতে, পিসী বেরিয়ে আসে]

যজ্ঞ ঃ কনবাপু ! এই ভার্খান...নাঃ...গোটাটাই পুঁটলি-বান্ধা—

[ভারটা তুলে নিয়ে যজ্ঞ এগোয়]

—রঙিলীকে দিতি হবে ।...আহ...নতুবা, সময়—

[যজ্ঞ এগিয়ে যায় । পেছনে পেছনে রঙিলী । পিসী মঞ্চের মাঝখানে । কিছুদূর গিয়ে রঙিলী পেছন ফিরে তাকায়, বাপ আর পিসীকে দেখে ফেরে]

রঙিলী ঃ পিতাই !...পিসী !...মুই—

[পিসী এগিয়ে এসেও, থম্‌কে, পিছু হটে । বুড়ো রঙিলীকে প্রবোধ দেয়]

গায়নবরা ঃ (চোখের জল চাদরে মুছতে মুছতে) মা ! যা...যা...মা মুই—

[যজ্ঞ নেপথ্যে চলে গেছে । সেখান থেকে বলে—]

যজ্ঞ ঃ (নেপথ্যে) রঙিলী ! এঁর মহত্ত্বখান দেইখতিছি । মুই আবার—

[ক্রন্দিতা রঙিলী বেরিয়ে যায় । বুড়োও চোখের জল মুছে ভেতরে যায় । বুড়োর পেছনে যায় পিসী]

॥ যবনিকা ॥

চক্ৰ

প্ৰবীন ফুকন

চরিত্রাবলী :

বসন্ত, প্রৌঢ় কেরাণী
তরুলতা, ঐ স্ত্রী
আরতি, ঐ কন্যা
জালান, জনৈক অর্থশালী ব্যবসায়ী
অমল, ধনী যুবক, আরতির পাণিপ্রার্থী

প্রাসঙ্গিক

'ত্রিতরঙ্গ' নামক সংকলন থেকে, 1941। মূলস্বত্ব—প্রবীণ ফুকন, মণিপুরী বস্তী, গৌহাটি-8। ফুকন 'কাল-পরিণয়', 'মনিরাম দেওয়ান' নাটকের জন্যে প্রসিদ্ধ। ইনি এক সময়ে আসামের ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ব'লে পরিচিত ছিলেন।

[**স্থান :** বসন্ত কেরাণীর বাড়ির সামনের বারান্দা। একজন হৃষ্টপুষ্ট মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বারান্দা থেকে উচ্চ কণ্ঠে ডাকে—]

জালান : বসন্তবাবু বাড়ি আছেন? বসন্তবাবু!

[বসন্ত কেরাণীর স্ত্রী তরুলতা খুশিতে উচ্ছল হয়ে বেরিয়ে আসে]

তরু : আরে, জালান সাহেব! বসুন বসুন।

জালান : বসন্তবাবু কি ঘরে আছেন, না নেই?

তরু : জেনে-শুনে ক্যানো আর জিজ্ঞেস করছেন? তিনি কি এসময়ে ঘরে থাকেন?

জালান : কী-যে বলেন—হেঁঃ হেঁঃ...

[একটা বেতের চেয়ারে বসে]

তরু : আজকাল কি এ-রাস্তা ভুলে গেলেন নাকি?

জালান : আপনি তো জানেন, আমি কলকাতা গিয়েছিলুম।

তরু : হ্যাঁ-হ্যাঁ—ভুলেই গিয়েছিলুম।

জালান : নইলে আর এ-বাড়িতে না এসে থাকতে পারি?

তরু : অনেকদিন বাদে কিন্তু এলেন। আরতি তো আমাকে খেয়ে ফেলছে...উঠতে বসতে খালি আপনার কথা।

জালান : আরতি আছে, না নেই?

তরু : আছে আছে।...আরতি, অ' আরতি!

[চেঁচিয়ে ডাকে। আরতি ভেতর থেকে সাড়া দেয়—]

আরতি : কি মা?

তরু : এদিকে আয়তো।...কে এসেছেন, দ্যাখ।

[আরতি বেরিয়ে এসে জালানকে দেখেই অভিমানিনী হয়]

আরতি : অ'—জালান সাহেব!..যান—আপনি খুবই খারাপ লোক।

তরু : বলিনি জালান সাহেব, মেয়েকে আপনি যেন জাদু করেছেন!

জালান : জাদু!—হেঃ হেঃ হেঃ...

আরতি : আমাকে শাড়ী দেবেন ব'লে কথা দিয়ে সেই যে পালালেন—

জালান : শাড়ী এনেছি তো।

[শাড়ীর প্যাকেটটা আরতিকে দেয়। আরতি খুলে দেখে]

—পছন্দ হয়েছে?

তরু : গোলডেন বর্ডার!

আরতি : কতো দাম?

জালান : বেশি না, সাড়ে তিনশোর মতো হবে।

তরু : সাড়ে তিন শো !

[গম্ভীর হয়ে যায় এবং মুখ ঘুরিয়ে বসে]

আরতি : ও-বুঝেছি—মার হিংসে হচ্ছে।

তরু : উনি তোকে দিয়েছেন—আমি আবার ক্যানো হিংসে করতে যাব ?

আরতি : মার কথা শুনছেন জালান সাহেব ?

জালান : মার জন্যেও এনেছি না ?—হেঃ হেঃ হেঃ...

[এই বলে পকেট থেকে একটা আংটি বা'র ক'রে—]

—এই আংটিটা দেখুন দিকি...হবে ?

[তরু আঙ্গুলে আংটিটা প'রে দেখে]

আরতি : আরে, আরে—দেখি—কী সুন্দর !

তরু : সর দিকি। এতদিন পরে মানুষটা এলো, তার খবরাখবর নি—সেসব নেই।...আপনি একটু বসুন, জালান সাহেব।...শাড়ীটা দে, রেখে দি'।

[আংটি ও শাড়ী নিয়ে তরু ভেতরে চলে যায়]

জালান : তোমার খবর কি আরতি ? আজকাল গান শিখছ না ?

আরতি : গানের মাস্টার আসছে না অনেকদিন।

জালান : আসছে না—ক্যানো ?

আরতি : দু' মাসের মাইনে দেওয়া হয় নি।

জালান : কতো টাকা হবে ?

আরতি : বোধহয়, একশোর মতো।

জালান : (পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বা'র ক'রে) এটা রাখো।

[এই সময়ে তরুলতা একটা প্লেটে মিষ্টি আর এক গ্লাশ জল নিয়ে আসে]

তরু : কিসের টাকা আরতি ?

আরতি : জালান সাহেব দিয়েছেন, গানের মাস্টারকে দেবার জন্যে।

[তরু জালানের সামনে টেবিলে মিষ্টি এবং জলের গ্লাশ রেখে, একটা মোড়া টেনে এনে কাছে বসে]

তরু : আরতি, দেখি—নোটটা আমাকে দে...নইলে, গয়লা দুধ দেওয়া বন্ধ করবে।

আরতি : দিও না।...গান আমার শিখতেই হবে।

জালান : দুধের টাকা কতো বাকি আছে ?

তরু : দুধেরও—প্রায় একশো-মতোই হবে। গয়লাকেই বা দোষ দি' কি ক'রে ? সেও তো পেটের জন্যেই ব্যবসা করছে !

[জালান মিষ্টি ও জল খেয়ে একটা উদ্গার ছাড়ে]

জালান : একশো টাকার জন্যে এতো ভাবছেন কেন? (পকেট থেকে একশ' টাকার নোট বা'র ক'রে)—নিন!

তরু : (হাত পেতে নোটটা নিয়ে) আরতি, গ্লাশ প্লেট নিয়ে যা'...আর, জালান সাহেবকে একটু মশলা এনে দে।

[গ্লাশ-প্লেট নিয়ে আরতি ভেতরে যায়]

জালান : আরতির বিয়ের কোন চেষ্টা করছেন নাকি?

তরু : না! মেয়ের বিয়ের কথা ভাবি নি। আর...কোথাও যদি সম্বন্ধ করি, আপনার পরামর্শ না নিয়েই কি আর কাজ করব?

জালান : এখন আর সেসব ভাববার দরকার নেই।...মেয়ে পড়ুক।

তরু : আপনি যা ভালো বোঝেন। মেয়েকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছি বলেই জানবেন।

[আরতি মশলা এনে জালান সাহেবকে দেয়]

—আচ্ছা জালান সাহেব, আরতির সঙ্গে আপনি কথা বলুন আমার একটু কাজ আছে।

[তরু ভেতরে চলে যায়]

জালান : এবার কলকাতায় অনেক গান শুনলুম। কিন্তু তোমার মতো মিষ্টি গলা কারও দেখলুম না।

আরতি : ক' হাজার টাকা খরচ করলেন?

জালান : আমার কিছু খরচ হয় নি। কলকাতায় আমার দেদার বন্ধু আছে।

আরতি : আচ্ছা, বাইজীরা কতো টাকা ক'রে নেয়?

জালান : বাইজী নিয়ে কথা! এক ঘণ্টা গান শুনিয়ে পাঁচশো-হাজার টাকা নেওয়া বাইজীও আছে।

আরতি : আমাকে কিন্তু একবার কলকাতায় নিয়ে গেলেন না!

জালান : ক্যানো নিয়ে যাব না! কলকাতা—বোম্বে—সব ঘুরিয়ে আনব।

আরতি : খুব হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েদের মতো বক দেখিয়ে মন ভোলাতে হবে না।

[এই ব'লে মুখ ফুলিয়ে একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

জালান : তুমি রাগলেও ভালো লাগে, আরতি।

আরতি : যান, আমার সঙ্গে কথা বলবেন না।

জালান : হেঃ হেঃ...। তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যেই তো বেঁচে আছি।

আরতি : মুখেই কেবল বড়-বড় কথা।

জালান : তোমার মুখে হাসি না দেখলে, আমি খুব কষ্ট পাই, আরতি।

[বাইরে থেকে অমল প্রবেশ করে; জালানের দিকে আড়চোখে দেখে আরতিকে জিজ্ঞাসা করে—]

অমল : আরতি, মা আছেন ?

আরতি : আছে।

[অমল দ্রুত ভেতরে চলে গেল। অমলকে লক্ষ্য ক'রে জালান বলে—]

জালান : ইনি কে, আরতি ?

আরতি : সম্বন্ধে দাদা হয়।

জালান : তোমার দেখছি অনেক দাদা !

আরতি : তার মানে ?

জালান : মানে—তোমাদের খুব বড়ো পরিবার।

আরতি : আর বলবেন না, সবাই কেবল শুষে নিতেই আসে। এই আপদটাকে (অমলের যাওয়ার দিকে চেয়ে) দেখলেই আমার রাগ হয়। কে আবার ডেকেছে এটাকে ?

জালান : যাকে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে নেই।

আরতি : মার কথা আর বলবেন না। একটা ডাক শুনলেই হল, একেবারে উথলে ওঠেন। আমি এতো ক'রে বুঝিয়েছি—যার তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিও না।—শোনে না। আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়।

জালান : আচ্ছা আরতি, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে—। এখুনি ঘুরে আসছি।

[জালান বেরিয়ে যায়। 'আরতি আরতি' ব'লে ডাকতে ডাকতে তরু বেরিয়ে আসে। সঙ্গে অমল]

তরু : আরতি, সেই মরকুট্টেটা গেছে ?

আরতি : (অমলের মুখে চোখ রেখে) সত্যি মা, বাবার বন্ধুদের দেখলে রাগে আমার মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

তরু : আর বলিসনি মা।...তবে কথা না বললেও চলে না! হাজার হোক, ওঁর বন্ধু। এদিকে—বসলে আর উঠতেই চায় না।

আরতি : একটা কথা কিন্তু, মা—তোমার যতো দরকারী কাজই থাক না কেন, আমি কিন্তু আর কোনদিন ওর সঙ্গে ব'সে ব'সে বকর-বকর করতে পারব না।

তরু : ওরকম করিস না আরতি, উনি জানতে পারলে রাগ করবেন।

আরতি : ওর সঙ্গে আমি কী কথা বলব (অমলকে)—তুমিই বলো তো!

তরু : হ্যাঁ...তা নাতো কী। তোমার কথা অবশ্য আলাদা।

আরতি : এঁর সঙ্গে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে গল্প করে যেতে পারি।...না কী বলো ? সেসব কথা হয়তো শেষই হতে চাইবে না।

অমল : তোমারও যেমন কথা, আরতি !

তরু : আহা, মেয়ের খরা নাক অমনি রাঙিয়ে উঠল।...আচ্ছা, আচ্ছা, তোমরা দুজনে যতো পারো, কথা বলো। সভায় চোর অশোভন।

[তরুলতা ভেতরে চলে যায়]

আরতি : ভেতরে মার সঙ্গে কী এমন গোপন কথা হচ্ছিল ?

অমল : কী আর—বিয়ের কথা !

আরতি : মা কবে দিতে চাইছেন ?

অমল : এই ফাগুনে।

আরতি : আমি কিন্তু বিয়ের পরেও তোমাকে অমল বলেই ডাকব।

অমল : অমল কমল যা-খুশি বলে ডেকো।

আরতি : আর একটা কথা—বিয়ের পরদিনই কাশ্মীর যাব।

অমল : পরের কথা পরে হবে, এখনই এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন ?

আরতি : তুমি আবার যা কৃপণ, একটা নয়া পয়সারও হিসেব রাখো !

অমল : কাছাখোলা স্বভাবটা কি ভালো ?

আরতি : সব টাকা-পয়সা কিন্তু ব্যাঙ্কে আমার নামে রাখতে হবে। আগেই একথা বলে রাখছি, পরে তোমার কোন ওজর আপত্তি শুনব না।

অমল : তুমি দেখছি, বিয়ের আগেই ঘোর সংসারী হয়ে পড়লে !

আরতি : তোমাদের পুরুষ জাতটাকে চেনা বড় শক্ত !

অমল : নারীজাতির মনের খবর পাওয়াটা যেন খুব সোজা ?

আরতি : হাজার হোক, নারীজাতি অবলা।

[তরুলতার প্রবেশ]

তরু : এই যে আরতি, মুদিখানার মহাজনটা এসেছে। এখন কোত্থেকে তাকে টাকা দি ? উনিও ঘরে নেই। বোধহয় টাকার জোগাড় হয়নি। তাই আসতে দেরি করছেন।

আরতি : সেদিন যেরকম কথাগুলো শুনিয়ে গেছে, আজ না পেলে...

অমল : কতো পাওনা আছে ?

আরতি : একশো হবে, না মা ?

অমল : আমার কাছে একশোর মতো হবে।

তরু : রাখো, রাখো, তোমার কাছ থেকে আবারো টাকা নোব ?

অমল : মা আমাকে এখনও পর ব'লে ভাবেন।

আরতি : হ্যাঁ অমল, কোন হিসেবে মা তোমার কাছে টাকা নেবেন ? আত্মসম্মান বলেও তো একটা কথা আছে !

অমল : মা-ছেলের মাঝখানে মান-সম্মানের কথা উঠতেই পারে না।...নিন, এই একশো টাকা।

[দশ টাকার দশখানা নোট তরুর হাতে দেয়]

তরু : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) পোড়া কপাল !

[সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে যায়]

আরতি : গরীব হয়ে জন্ম নেওয়াও পাপ।

অমল : আর ক'টা দিন আরতি। তুমি জানো, আমি দুটো চা-বাগানের মালিক...বাড়ির একমাত্র ছেলে—

আরতি : আমি মা আর বাবার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি।

অমল : তার মানে, তুমি বলতে চাইছো আরতি যে, আমি ওদের পরিত্যাগ করব?—কেন, কেন আরতি—এখনও তোমরা আমাকে আপন করে নিতে পারছ না?

আরতি : তুমি বড়ো অভিমানী, অমল।

অমল : না আরতি। আমার মনে হচ্ছে—আমি তোমাদের যেভাবে নিতে চাইছি, তোমরা সেভাবে আমায় নিতে পারছ না। আমাকে নিয়ে তোমরা যেন ঘোর দুশ্চিন্তায় পড়েছো।

আরতি : তুমি মিছিমিছি রাগ করছ অমল। একবার ভেবে দ্যাখো তো—পরের কাছে হাত পেতে কে সুখ পায়? আমি ভালো করেই জানি, কী অবস্থায় পড়ে মাকে আজ তোমার কাছ থেকে এই একশো টাকা নিতে হয়েছে। তা যদি বুঝতে, তাহলে হয়তো তোমার মুখ থেকে এতো কথা বেরোত না। জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা নেওয়াটা শ্বশুর-শাশুড়ীর পক্ষে নিশ্চয়ই কোন গৌরবের কথা নয়। একথা, আশা করি, তুমি বোঝো।

অমল : আরতি!

আরতি : এইজন্যেই, সমান ঘরে কুটুম্বিতে হওয়াটাই ভালো!

অমল : কোনদিন, কারও কাছে, আমি ঐশ্বর্যের অহংকার করিনি, আরতি। আমাকে ভুল বুঝো না।

আরতি : তাহলে, আমাদের সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা জন্মাল কি ক'রে?

অমল : ভুল হয়েছিল—স্বীকার করে নিচ্ছি।

আরতি : (দুষ্টুমীর হাসি হেসে) তাই ব'লে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

অমল : তোমার দেওয়া শাস্তি আমি হাসিমুখে নোব। বলো—

আরতি : শপথ করো—

অমল : শপথ করে বলছি—

আরতি : আমার কাজে কোন বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করতে পারবে না।

অমল : তাই হবে। আমি তোমাকে কথা দিলুম;

আরতি : আর, আমি যা বলব, তা-ই মেনে চলবে।

অমল : তোমার সব দাবি মেনে নিচ্ছি।

আরতি : এখন চলো, দুজনে দুকাপ চা খাই গিয়ে।

[দুজনে হাসতে হাসতে ভেতরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে, বাইরে থেকে বসন্ত কেরাণী প্রবেশ করে। বাইরে, পুলিশ-ভ্যান থেকে লাউডস্পীকার মারফৎ একটা ঘোষণার প্রচার শোনা গেল। বসন্ত একটা বেতের চেয়ারে ব'সে বাইরে কান পেতে ঘোষণা শুনতে থাকে]

ঘোষণা : একটা বিশেষ ঘোষণা! জেলাধিকারী জানাচ্ছেন যে, আজ থেকে বেশ্যা-বৃত্তি রদ আইন বলবৎ করা হল। যদি কেউ কখনও এই বিষয়ে কোন সংবাদ পান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-থানায় খবর দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ।

[ঘোষণা শুনে বসন্ত মন খুলে হাসে। ভেতর থেকে তরু বেরিয়ে আসে]

বসন্ত : হাঃ হাঃ হাঃ...

তরু : কী হল?

বসন্ত : ঘোষণাটা শুনেছ?...হাঃ হাঃ হাঃ

তরু : রামো রামো, গন্ধের চোটে কাছে যাবার জো নেই!...এই দিনদুপুরেই বিষগুলো খেয়ে এলেন?

বসন্ত : আঃ—কী যে একই কথাকে রোজ-রোজ চিবোতে থাকো না?

তরু : থাকবই তো! এদিকে মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হল, এখনও আপনার হুঁশ হল না।

বসন্ত : ওঃ—একটা মুহূর্তও ঘরে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

তরু : আমি একলা কোনদিকে কিভাবে সামলাই? আপনি দেখছি, চোখ কান বন্ধ ক'রে বসে আছেন।

বসন্ত : চোখ-কান যদি খোলা রাখতাম, তাহলে কি এতোখানি হতে পারত?

[আরতি ও অমল ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

আরতি : মা, পিসির ওখানে যাবে না?

তরু : চল। আচ্ছা অমল, তুমি ওঁর কাছে একটু ব'স...আমরা এখনই আসছি।

[তরু এবং আরতি বেরিয়ে গেল।]

বসন্ত : অমল!

অমল : আজ্ঞে!

বসন্ত : দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স। (অমল বসে)—একটা কথা বলব, শুনবে?

অমল : আজ্ঞে, বলুন।

বসন্ত : তুমি সত্যি-সত্যি বড্ড নির্মল। এই কুটিল সংসারের মধ্যে দিয়ে তুমি চলবে কি ক'রে? (অমল নির্বাক। বসন্ত বসা-অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায়; সঙ্গে সঙ্গে অমলও উঠে দাঁড়ায়)—মাঝে মাঝে ভাবি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অস্তিত্বই বুঝি লোপ পেয়ে যাবে।

অমল : আপনি...

বসন্ত : মুখে গন্ধ পেয়ে ভাবছ—আমার নেশা হয়েছে?

অমল : না, ভাবিনি তো!

বসন্ত : তুমি জানো না অমল, নেশা করতে আমি বাধ্য হয়েছি। নেশা ক'রে

নির্লজ্জ না হ'লে ভদ্রসমাজে আমি যাব কেমন ক'রে? আমার যে ভীষণ ভয় করে! চেনা-জানা মানুষ দেখলে ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে। মুখ থেকে কথা বেরোতে চায় না। তাইতো আমাকে নেশা করতে হয়...নইলে আমি-যে একেবারে অচল হয়ে যাব।

অমল : আজ্ঞে...আপনি বরং অল্প একটু শুয়ে থাকুন।

বসন্ত : বলেছি না, তুমি একেবারে অজ্ঞ। অমল, তুমি জোনাকির আলোর মতো নির্মল। এই দুনিয়ার আঁকাবাঁকা পথঘাট তুমি অল্পই দেখেছো। তুমি কি ক'রে সংসার করবে? উঁহুঁ, মিথ্যে কথা। তুমি সংসার চালাতে পারবে না।

অমল : অর্থাৎ—আরতিকে আমার হাতে দিতে চান না?

বসন্ত : হেঃ হেঃ...(অমলের থুতনী ধ'রে) এতো সরল প্রকৃতির ছেলে আজকের যুগে থাকতে পারে!

অমল : বাবা!

বসন্ত : সত্যি অমল, তুমি আমাকে যখনই 'বাবা' ব'লে ডাকো, আমার এতো ভালোলাগে! কারণ, তোমার ওই 'বাবা' ডাক—এতো কোমল, এতো পবিত্র। তুমি যদি আমার ছেলে হতে অমল!

অমল : কেন—আমি আপনার ছেলে হবার জন্যে এতো আকাঙ্ক্ষা করি—

বসন্ত : জানি, জানি অমল। কিন্তু এটা ভেবে দেখছ না কেন যে তখন তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হবে মেয়ের মাধ্যমে। তুমি হবে আমার জামাই। নিজের ছেলে আর জামাইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। তাই না?—বলো—

অমল : কিন্তু আপনার যখন ছেলে নেই...

বসন্ত : আঃ—তুমি দেখছি সেই একটা কথাকেই ধ'রে বসে আছো। আমার কথা বোঝবার চেষ্টা কর অমল, আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর।

অমল : করেছি, বাবা; কিন্তু আমি কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছি না।

বসন্ত : কেমন করে পাবে অমল, কেমন করে পাবে। তুমি-যে বড্ড সরল। দীঘির মধ্যে ফুটন্ত পদ্মের পাপড়ির আড়ালে যে বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, সেকথা ভাবতে পারে ক'জনে?

অমল : তাই ব'লে তো সংসারকে আর বাদ দিতে পারব না। একদিন-না-একদিন সংসার পাততেই হবে।

বসন্ত : নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তার আগে, সংসারটা কী বস্তু, তা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। না ভেবেচিন্তেই বানের জল রুখতে যাও যদি, তার করাল স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

অমল : আমি ভেবে চিন্তেই বিয়ে করতে যাচ্ছি।

বসন্ত : বেশ করেছো। (একটু ভেবে)—এসব কথা আমি কেন বলছি, জানো অমল?—বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ধর্মভীরু হয়ে পড়েছি। অতীত জীবনের ঘটনাগুলো স্মরণ করে মনে বড়ো ভয় ঢুকেছে।...তুমি নিজে চোখেই দেখছ, আজকাল খুব

ধুমধাম ক'রে পুজো-টুজো করা হচ্ছে। কেন জানো?—ভক্তিতে না—আজীবন উপার্জিত পাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে।

[তরু ও আরতি প্রবেশ করে]

তরু : বুড়ো লেকচার শুনিয়ে তোমার মাথা নিশ্চয়ই ঘুলিয়ে দিয়েছে।

আরতি : এই অমল, এসো তো, বাজারটা একটু হয়ে আসি।

[অমল ও আরতি বেরিয়ে যায়।]

তরু : আরতির-আমার ছোট কপাল নয়। অনেক পুণ্যি করলে তবে এমন ছেলে পাওয়া যায়।

বসন্ত : হবে। সংসারে পাপ-পুণ্য ব'লে কিছু আছে না নেই, ঠিক ধরতে পারি না।

তরু : শুনুন—ওর সামনে মদ খেয়ে আপনি যা-তা বকবেন না— অন্তত, বিয়ের আগের এই ক'টা মাস!

বসন্ত : মাতালের কথার কি কোন দাম আছে তরু?

তরু : ওরকম বলছেন কেন? আপনি ওর শ্বশুর হবেন—।

বসন্ত : সেই কথাই আমি ভাবছি। ওর শ্বশুর না হলেই আমি সুখী হতাম।

তরু : কেন—ছেলেটার খারাপ কী দেখলে?

বসন্ত : একটা গণ্ডমূর্খ!

তরু : তা যদি হয়ও, অজস্র ধন-সম্পত্তি আছে, মেয়ে সুখী হবে।

বসন্ত : সুখ-শান্তি কখনও কারও কাছে যেচে আসে না। ধন-দৌলতও আনতে পারে না। তার জন্যে আরও অনেক উপকরণের দরকার হয়।

তরু : বাজে কথা রাখুন তো! টাকা দিয়ে হয় না, এমন কাজ আছে নাকি?

বসন্ত : সত্যি কথা—টাকার জোরে মানুষ পাপকে নিষ্পাপ ব'লে চালাতে পারে। কিন্তু পুণ্য অর্জন করতে পারে না।

তরু : ঈস, কথা শুনেছো? বলি, আজ ক'বোতল হয়েছে?

বসন্ত : এইখানেই আমার দুঃখ থেকে যাবে তরু—মদ আমি খাই সত্যি, কিন্তু মদও আমাকে খেলে!

তরু : এখন পস্তাচ্ছেন, বললে তো শোনেন না। দিন-রাত এইগুলো খেলে কারও শরীর ভালো থাকতে পারে?

বসন্ত : শরীর আমার ভেঙ্গে পড়ে নি, ভালোই আছে।...কিন্তু—

তরু : রাখুন রাখুন আপনার পাগলামী।

[সবেগে ভেতর চলে যায়]

বসন্ত : আমার পাগলামী! হেঃ হেঃ হেঃ...। তরু, তরু!

[ভেতর থেকে 'কী' ব'লে সাড়া দিয়ে তরু আবার বেরিয়ে আসে—]

তরু : কী?

বসন্ত : এই...কুড়িটা টাকা—

তরু : কী হবে ?

বসন্ত : প্রশ্ন কোরো না।

তরু : একটু আগে কুড়িটা টাকা দিলুম, কী করলে ?

বসন্ত : শোনো তরু! তোমার সঙ্গে অনেকদিন আগে আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে—তোমার কাজে আমি কখনও বাধা দেব না, আর তুমিও আমাকে কোন বাধা দিতে পারবে না। সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

তরু : আপনার, কাছ থেকে, দেখছি, রেহাই নেই। (মুখে অস্ফুট শব্দ করে ভেতরে যায়, এবং টাকা কুড়িটা এনে দেয়)—ধরুন।

বসন্ত : বাহ্—একেই বলে, সতী স্ত্রী—স্বামীর এতো বাধ্য।

তরু : এখন যান, জলপথে উড়িয়ে দিন।

বসন্ত : কী যে বলো তরু! আমি যদি না ওড়াই, তাহলে কে ওড়াবে ? আমার সমকক্ষ এখানে আর কে আছে ?...আমি রোজগার করছি, তুমি রোজগার করছো, মেয়ে রোজগার করছে। টাকায় টাকা, চারিদিকে কেবল টাকা। হাঃ হাঃ হাঃ...

[বসন্ত বেরিয়ে যায়। মুখে হাত চাপা দিয়ে তরু চেয়ারে বসে পড়ে। অমল এবং আরতি বাজার থেকে ফিরে আসে। আরতি সোজা ভেতরে চলে যায়। অমল তরুকে দেখে কাছে আসে, জিজ্ঞাসা করে—]

অমল : কী হয়েছে, মা ? অমন মন-মরা হয়ে বসে আছেন যে !

তরু : কী আর হবে বাবা—

[চাদরের আঁচলে চোখের জল মোছে]

অমল বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে বুঝি ?

তরু : আমার গোটা জীবনটাই কাটাকুটি।...ঘোর শত্রুরও যেন মাতাল স্বামী না হয়।

অমল : ওঁর মাথায় গোলমাল হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। আপনারা বেরিয়ে যাবার পর, আমাকে যেসব কথা বললেন, তার আগাপাশতলা কিছু ধরতে পারলুম না। কথার কোন বাঁধুনী নেই, যা মনে আসে, তাই-ই বলেন।

তরু : মাথার দিব্যি রইল, ওঁর কথা ধোরো না।

অমল : কী-যে বলেন। ওঁকে আর আমি চিনি না ?

তরু : মাতাল লোকের কোন ঠিক নেই ; কোনদিন তোমাকে গালি বা শাপও দিতে পারেন !

অমল : গাল দিলে বাবাই দিতে পারেন।...আচ্ছা, একটা কথা। মদ খাওয়াটা বন্ধ করানো যায় না ?

তরু : তা যদি যেতো, তাহলে আজ কুড়ি বছর ধ'রে এইরকম যম-যন্ত্রণা ভোগ করি ? কতো রাত যে না ঘুমিয়ে কেটেছে! মারধোরের কথা না হয় না-ই বললুম।

অমল : আজকাল আধুনিক ধরণের নানান রকম ইনজেকশন বেরিয়েছে। একবার চেষ্টা করে দেখলে—

তরু : ভালো বললে। একথা বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মারতে আসবে। যা হয় হোক ; মেয়ে বড়ো হয়েছে, তার সামনে মার খাবার আর ইচ্ছে নেই, বাবা। এতো বচ্ছর ধ'রে যতো পেয়েছি, তা-ই যথেষ্ট !

[আরতি 'অমল অমল' ব'লে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে আসে। তরু ভেতরে চলে যায়]

আরতি : অমল, অমল ! তোমার মোটরটা খুব পুরনো হয়ে গেছে। একটা নতুন কারের অর্ডার দিও।

অমল : কেন, এটা তো বেশিদিন হয় নি—মাত্র দুবছর মতো হয়েছে।

আরতি : তাহোক, এটাতে চ'ড়ে আমার ভালো লাগেনি। তাছাড়া, বিশেষ ক'রে বিয়ের পরে একটা নতুন মোটর না হলে ভালোলাগে ?

অমল : তুমি বলছ যখন...

আরতি : তার মানে, প্রতিজ্ঞার কথা তোমার মনে আছে ?

অমল : সেকি আর ভুলতে পারি ?

আরতি : তুমি দেখছি, আইডিয়েল হাজব্যানড হবে।

অমল : অন্তত, হবার জন্যে চেষ্টা করব।

আরতি : আরতি নামটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

অমল : খাবাপটা কী পেলে ?

আরতি : এটা বড্ড অসমীয়া নাম !

অমল : আ—তোমার মেমের নাম চাই !

আরতি : প্ল্যানটারকে যখন বিয়ে করছি, মেমসাহেব তো নিশ্চয়ই হব। তখন তো আর সাধারণ একটা কেরাণীর মেয়ে হয়ে থাকব না !

অমল : আমিই বা কোন্ বড় সাহেব ?

আরতি : বিয়ের পরে এভাবে চললে হবে না। সব সময়ে ফিটফাট হয়ে থাকতে হবে।

অমল : আচ্ছা, আচ্ছা, দ্যাখা যাবে। (হাত ঘড়ি দেখে)—আমাদের কোম্পানীর একটা মিটিং আছে, সময় প্রায় হয়ে এলো। আমি আসি, ক্যামন ?

আরতি : মিটিং শেষ হলেই আসবে কিন্তু।

অমল : নিশ্চয় নিশ্চয়।

[অমল বেরিয়ে যায়। আরতি চেয়ারে ব'সে পা নাচিয়ে একটা ফিল্মের গান গুনগুন গাইতে থাকে। একটু পরে জালান প্রবেশ করে]

জালান : বাঃ। বাইরে থেকে শুনে আমি ভাবছিলুম—কোনো ফিলম-স্টার গাইছে বুঝি !

আরতি : আপনি সব কথাতেই আমাকে ঠাট্টা করেন!
জালান : ঠাট্টা না আরতি, আমার মনের কথাই বলেছি।
আরতি : আপনার মন আছে?
জালান : তোমার কী ধারণা?
আরতি : যদি থাকেও তো, খুব নিষ্ঠুর।
জালান : কী বললে?
আরতি : আমার নিশ্চয়ই ভুল হয়নি?
জালান : ভুল, সবটাই ভুল।...তোমার কথা ফিরিয়ে নাও।
আরতি : কেন ফিরিয়ে নোব? আমার যে ভুল হয়নি, তা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি!
জালান : প্রমাণ দেবে?
আরতি : নিশ্চয় দোব।...আমার জন্যে এতো দরদ থাকলে, আমাকে শাড়ী দিয়ে মাকে সোনার আংটি...
জালান : ওঃ, এই কথা? তা' বলছ না কেন? বেশ, তোমাকে কথা দিলুম, এক হপ্তার ভেতরে তোমাকে আমি হীরের আংটি এনে দোব। এখন হল?
আরতি : (দুষ্টু হাসি হেসে) ধন্যবাদ। আমি আমার কথা উঠিয়ে নিচ্ছি। একটু বসুন জালান সাহেব, আপনার জন্যে বেনারসী পান নিয়ে আসছি।

[আরতি ভেতরে যায়। ক্ষণ-পরে, বাইরে থেকে বসন্ত টলতে টলতে প্রবেশ করে]

বসন্ত : অ'—আমাদের জালান সাহেব!
জালান : নমস্কার, বসন্তবাবু।
বসন্ত : নমস্কার নমস্কার, সহস্রবার নমস্কার।
জালান : আজকাল আপনার দ্যাখাই পাওয়া যায় না।
বসন্ত : আহ—কি ক'রে দ্যাখা পাবেন? আমাকে দেখতে চাইলে তবে তো!
জালান : আমি তো আপনার এখানে রোজ একবার ক'রে আসি।
বসন্ত : একবার না জালান সাহেব, তিন-চার বার আসেন। কিন্তু তাতে কী হবে? আমি যখন বাইরে প্রস্থান করি (বাড়ির ভেতরটা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে), —আপনি তখন অন্দরে প্রবেশ করেন।
জালান : না—মানে···
বসন্ত : হাঃ হাঃ...। একটা কথা জালান সাহেব।
জালান : হুকুম করুন।
বসন্ত : হুকুম! আমি আপনাকে হুকুম করব! অন্নদাতাকে হুকুম করা যায়?
জালান : আমি আপনার গোলাম বসন্তবাবু!
বসন্ত : ছিঃ ছিঃ জালান সাহেব! পুরুষ জাতটার সম্মান আপনি একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন! যতোই স্বার্থ থাক, এতোটা নীচে নামতে নেই।

জালান : আমার কোন স্বার্থ নেই বসন্তবাবু। আপনি তো জানেন, ঘরে কতো অশান্তির মধ্যে থাকি। এখানে এসে শান্তি পাই, সেই জন্যেই আসি।

বসন্ত : সাবাশ, সাবাশ, জালান সাহেব। এতোক্ষণে আপনি পুরুষের মতো কথা বললেন। যেখানে নাকি শান্তির ঝর্ণা অবিরাম কুলুকুলু স্বরে বয়ে চলেছে— সেখানে শান্তি না পেলে আপনি পাবেনটা কোথায়?...ফুলবাগানে ফুলের মধুর খোঁজে ভোমরা হয়রান হয়ে উড়ে বেড়ায়—আর দুনিয়ার যতো মানুষ শান্তির খোঁজে ছুটে আসে এই বসন্ত কেরাণীর ঘরে!

[আরতি একটা প্লেটে দুটো বেনারসী পান এনে জালানের সামনে রাখে। জালান একবার আরতি, একবার বসন্তর মুখের দিকে তাকায়]

—খান খান জালান সাহেব। বেনারসী মিঠে পান...আশ মিটিয়ে খান।

আরতি : মানুষকে এইভাবে জুলুম করেন ক্যানো?

বসন্ত : শুনলেন, (জালানের দিকে চেয়ে)—আমি নাকি আপনার ওপর জুলুম করছি!

আরতি : আপনার উৎপাতে মানুষজনের আসাই বন্ধ হয়েছে!

[আরতি রেগে ভেতরে যায়]

বসন্ত : আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে আজকাল আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না।

জালান : আপনি জানেন না, কী ভাগ্যবান লোক আপনি; আপনার স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

বসন্ত : বলুন—দেবী! আর, দেবী না হলে আপনার মতো ভক্ত পাবেনই বা ক্যামন ক'রে? উনি হলেন দেবী, আর আমি হলাম দেবতা। বাহ, কী অপূর্ব মিলন। এধরণের রাজযোটক মিল সচরাচর চোখে পড়ে না। নাকি বলেন...?

জালান : আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু...

বসন্ত : কেন করব না, কেন করব না জালান সাহেব? একলা আপনি তো নন, আরও অনেকে আমার স্ত্রীকে দেবী ব'লে চিনে নিয়েছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, আজ বছর-দুয়েকের মধ্যে, তিনি অসংখ্য ভক্ত জুটিয়েছেন।

জালান : (বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে) কী বললেন!

বসন্ত : এতো অধৈর্য হবেন না! আপনি হলেন মহাভক্ত, আপনার জায়গা কেউ নিতে পারবে না।

জালান : আপনি আমায় অপমান করেছেন বসন্তবাবু।

বসন্ত : অবশেষে—আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন, জালান সাহেব!

জালান : আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আজকের নয়।

বসন্ত : হাঁ, ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন—আমাদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। আচ্ছা জালান সাহেব, একটু মদ খেয়ে আসি, কিছু টাকা দিন তো।

জালান : টাকা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আজকাল আপনি বড্ড বেশি মদ খাচ্ছেন।

জালান : আহ্! আমি মদ খাই—নিজের জন্যে নয়—আপনাদের জন্যে। দিন, দিন, টাকা দিন।

[জালান দশ টাকার পাঁচখানা নোট বার ক'রে দেয়। বসন্ত টাকা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে তরু এসে জালানকে শুধোয়—]

তরু : উনি কোথায় গেলেন?

জালান : কোথায় আর যাবেন? আমার কাছে টাকা নিয়ে মদ খেতে গেলেন।

তরু : ভালোই হল। ঘরে থাকলে অশান্তি করে মারতেন।

জালান : আজকাল চব্বিশ ঘন্টাই মদ খাচ্ছেন!

তরু : কী আর করব। মদ খেয়েই মরবেন।

জালান : একটা কথা।—আমি এখনই বাইরে শুনে এলুম—আরতির বিয়ে নাকি প্রায় ঠিকই হয়ে গ্যাছে!

তরু : আরে না, না। আপনাকে কে বললে?

জালান : বলুন—সত্যি না মিথ্যে?

তরু : এই বাড়ি সম্পর্কে অনেক কথাই রটে, তাই ব'লে সব বিশ্বাস করতে হবে?

জালান : আরতির বাবাই বলেছেন বললে!

তরু : কাকে?

জালান : এমনকি কোন মাসে হবে, তাও বলেছেন।

তরু : মাতালের কথা বিশ্বাস করতে হলে, বেঁচে থাকাই মুশকিল।

জালান : না, মানে—যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয়, তাহলে...

তরু : আমাকে বিশ্বাস করেন না?

জালান : বিশ্বাস করি বলেই তো...

তরু : আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় কোন কাজটা করতে দেখেছেন?

জালান : বসন্তবাবু আমাকে আপনার মহাভক্ত ব'লে ঠাট্টা করেন।

তরু : আমি আপনাকে বলে রাখছি—পরের কথায় কান দেবেন না। জানেনই তো, এ বাড়ির শত্রু কতো!

জালান : ঠিকই বলেছেন। আমার এখানে আসা নিয়ে কতো লোক যে আমার পেছনে লেগেছে!

তরু : ঈশ্বর আছেন জালান সাহেব। তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর দয়া থাকলে মানুষের শত্রুতা কী করতে পারে?

জালান : ভগবানের দয়ার ওপরেই তো পৃথিবীটা চলছে।

তরু : মানুষকে ঠকাতে পারলুম না বলেই আজ আমার এই অবস্থা। অথচ, ইচ্ছে করলে, আজ পাকা বাড়ি তুলতে পারতুম। তবু লোকেরা কামড় দিতে ছাড়ে না। আমার কথা না হয় বাদই দিলুম, ওই পেটের মেয়েটার নামেও কতো কথা ছড়িয়েছে।

জালান : একটা কথা কিন্তু। আমাদের বসন্তবাবুও খুব অন্যায় করছেন, তিনি ঘরের কথা বাইরের অনেক লোককে বলে বেড়িয়েছেন।

তরু : কী করব ; আপদটা মরলেও ভালো ছিল।

জালান : ও কথা বলবেন না। উনি আপনার স্বামী।

তরু : বিয়ের দিন থেকে চোখের জল মুছতে মুছতেই গেল। বুড়ো বয়সে আবার কী হাঁড়ির হাল হয়, কে জানে!

জালান : আরতি আছে যখন, ভাবছেন ক্যানো?

তরু : থামুন তো! মেয়ের রোজগার খাওয়া—বিধাতা আমার ফাটা কপালে লেখেন নি!

[এই সময়ে আরতি প্রবেশ করে]

আরতি : কি হল জালান সাহেব—আমার কথা কী বলছেন?

জালান : চোরের মতো লুকিয়ে শুনেছ তাহলে!

আরতি : আমাকে চোর বললেন?

তরু : এখন দুজনে যতো পারো ঝগড়া করো। আমি ঠাকুরঘরে যাই।

[তরু ভেতরে যায়]

জালান : একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই আরতি—অবশ্য তোমার ভালোর জন্যেই।

আরতি : বলুন...বলবার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে।

জালান : তোমার মার সঙ্গে, এই একটু আগেই. এ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি অবশ্য নাম করিনি।...এই যে অমল—তোমাদের ঘরে আসে...ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে ব'লে বাইরে খুব গুজব ছড়িয়েছে।...কাজেই, ওর এখানে আসাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

আরতি : আমি কি আপনাকে বলিনি যে, অমল আমাদের আত্মীয় হয়।

জালান : কিন্তু তোমার বাবাই সবাইকে বলেছেন—একথা মিথ্যে।

আরতি : বাবা বলেছেন?

জালান : বিশ্বাস করো।

আরতি : আচ্ছা! আর কী-কী শুনেছেন, বলুন তো।

জালান : এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।

আরতি : আর...?

জালান : সেসব বোধহয় উচ্চারণ না করাই ভালো।

আরতি : আপনি কী করবেন ব'লে ভাবছেন?

জালান : তোমার মা বললেন—সব মিছে কথা।

আরতি : তাহলে...!

জালান : যদি তা-ই হয়, লোকেদের বদনাম রটানোর সুযোগ দেওয়াটা উচিত্ হবে না।

আরতি : অর্থাৎ অমলের এখানে আসা বন্ধ করতে হবে।

জালান : তাহলে লোকেরা বলবার সুবিধে আর পাবে না।

আরতি : কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও তো অনেক কথা লোকেরা বলছে।

জালান : তুমি আমার সঙ্গে অমলের তুলনা করছ আরতি ?

আরতি : অমলের পেছনে আপনিই বা এভাবে লেগেছেন কেন ? সে আপনার কোন্ বাড়া-ভাতে ছাই দিতে গেছে ?

জালান : সেকথা তোমাকে নতুন ক'রে মনে করিয়ে দিতে হবে, দেখছি।

আরতি : বিনা দোষে অমলকে আসতে বারণ করব কি ক'রে ?

জালান : যেহেতু, আমার ভালো লাগে না...

আরতি : আপনাকে ভালো লাগানোই আমার জীবনের উদ্দেশ্য নাও হতে পারে !

জালান : আরতি !

আরতি : আপনার জন্যে তো আপনজনদের ছাড়তে পারি না !

জালান : শোনো আরতি, আমি সব জানতে পেরেছি—অমল তোমাদের কোনরকম আত্মীয় হয় না। আর, সে-যে এখানে আসে, নিজের স্বার্থের জন্যেই।

আরতি : আপনি কি বিনা স্বার্থেই এই বাড়ির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন ?

জালান : তার বিনিময়ে আমার যথেষ্ট বাজে খরচও হয়েছে।

আরতি : স্বার্থ থাকলে খরচ হবেই—এ কোন নতুন কথা নয়।

জালান : তোমার উদ্দেশ্য কি আরতি ?

আরতি : আমার উদ্দেশ্য আপনি ভাল করেই বুঝেছেন।

জালান : অর্থাৎ, অমলের বদলে আমাকেই এই পথ বন্ধ করে দিচ্ছ ?

আরতি : ওজর দেখিয়ে আপনি নিজেই যদি পালাতে চান, আমি বাধা দোব ক্যামন ক'রে ?

জালান : তার মানে—একটা দড়ি দিয়েই সব নৌকোগুলো বাঁধতে চাইছ ! তুমি কিন্তু ব্যাপারটা যতো সোজা ব'লে মনে করছো, ততোটা সোজা নয়। হয়তো ওই দড়িতেই তোমারও ফাঁস লেগে যাবে।...একটু আগে, সমাজের একজন সম্মানিত লোকের মুখে তোমার বিষয়ে আমি অনেক কথাই শুনলুম।... তবু, এখনও আমি সময় দিলুম—সমস্ত কথা ভালো ক'রে ভেবে-চিন্তে দেখবে। আর, আমার বিনা অনুমতিতে যদি বিয়ে করো—তাহলে তার পরিণাম বুঝবে পরে।

[জালান বেগে বেরিয়ে গেল। ক্রুদ্ধা আরতি 'মা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে—]

আরতি : মা !

[সঙ্গে সঙ্গে তরু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

তরু : আমি সব কথা শুনেছি আরতি। কোন ভয় করবি না। ও আমাদের কী করতে পারে ? ওর কাছে কোন খত তো লিখে দি'নি।

আরতি : চারদিকে আমার বদনাম করে বেড়াবে, মা!

তরু : বদনাম শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এখন আর বদনামের ভয় করি না।

আরতি : ও নিশ্চয়ই অমলকে সব কথা বলে দেবে।

তরু : সারা পৃথিবী যদি একদিকে হয়, তবু অমল আমাদের হয়েই কথা বলবে। তাছাড়া, পরকে কী দোষ দিবি? ঘরের শত্রুই বিভীষণ, বাপই হয়েছেন কাল। বিয়ের কথা চারদিকে বলে বেড়াচ্ছে; লোকেরা শুনে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরছে।

আরতি : আবার কে কোথায় কী লাগায়?

তরু : অমল আসুক। পারলে, এই মাসেই বিয়ে দোব। দিনক্ষণ দ্যাখা সব বাদ দোব।

আরতি : মা, ওই বাবা আসছেন। সঙ্গে জালান সাহেব।

[দুজনে বাইরের দিকে দেখে দ্রুত ভেতরে চলে যায়। একটু পরে জালান ও বসন্তের প্রবেশ]

বসন্ত : জালান সাহেব, আপনি এক নম্বর বুদ্ধু অর্থাৎ গাধা (জালান নির্বাক)— ঈশ্বর আপনাকে চা-বাগান দিয়েছেন, জুট মিল দিয়েছেন, পেপার-মিল দিয়েছেন, আরও কতো রকমের কারবার আছে। আপনি কোটিপতি। আপনি আমাকে টাকা দিন—আমি মদ খাব, ফূর্তি করব, যাকে ইচ্ছে বিয়ে করব। আপনার রাগ ক'রে চলে যাবার কী অধিকার আছে?

জালান : আমার কাজ আছে বসন্তবাবু।

[প্রস্থানোদ্যত। বসন্ত বাধা দেয়]

বসন্ত : শুনুন—সময়ের দাম আমারও যে নেই তা নয়। বিনা স্বার্থে এই বসন্ত কেরাণী কারও সঙ্গে সময় খরচ করে না। আমি পেনশন পাই একশো টাকা; কিন্তু আমার সংসারে মাসে খরচ—এক হাজার। আমাকে কম ব্রেন খাটাতে হয়েছে? ভেবে ভেবে মগজ একেবারে ঘোলা করে ফেলেছিলুম।

জালান : আপনিই বলুন—আরতির আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করাটা কি উচিৎ হয়েছে?

বসন্ত : Certainly not. নিশ্চয় হয় নি। এর সুবিচার আমি করব। আমার বন্ধুকে আমার মেয়ে অপমান করবে...

জালান : আপনি তো জানেন বসন্তবাবু—আপনাদের জন্যে আমাকে লোকেদের কাছে কতো কথা শুনতে হয়। কতো লোক আমার মুখের ওপরেই গালি দিয়ে যায়!

বসন্ত : এইতো, আপনি আবার বুদ্ধুর মতো কথা বলছেন! মানুষ বড়লোকদেরই গাল দ্যায়, আর গরীবদের ওপর করুণা দেখিয়ে, নিজের ক্ষমতা জাহির করে। এইটেই চিরকাল চলে এসেছে—আর থাকবেও।

[এই সময়ে তরু বেড়িয়ে আসে]

তরু : আপনি তো আচ্ছা !..আরতির কথায় এতো রাগ করতে আছে ?... আপনাকে বলতে পারে বলেই বলেছিল...আর কাউকে তো এভাবে বলতে পারে না।

জালান : তা নয়।...আমারও খপ্ ক'রে রাগ চ'ড়ে গ্যালো।...কিছু মনে করবেন না। আরতির কথায় আমি চটিনি।

বসন্ত : দেখলে, দেবীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্ত লম্বা দিয়ে প'ড়ে, ক্যামন শরণ নিল ? হেঃ হেঃ হেঃ...বুয়েচ তরু—এইযে আমাদের সদাশিব, ভাংখোর ব'লে কতো খাতির...আমাকে কিন্তু সেভাবে মাতাল ব'লে কেউ দামই দেয় না ! তা না দিক। কিন্তু, তোমার প্রভু হিসেবে, অন্তত ছোট খাটো একজন দেবতা বলেও তো মানা উচিত...তাও মানে না।

জালান : যখন তখন মাতলামী করবেন না। ভালোয় ভালোয় ভেতরে যান।

বসন্ত : ঠিক আছে, যাচ্ছি। (দু'পা গিয়ে, ফিরে এসে)—এরপর আর বোধহয় আমাকে দরকার হবে না। হাঃ হাঃ হাঃ...

[বসন্ত ভেতরে যায়। আরতি 'মা মা' ব'লে বেরিয়ে আসে]

আরতি : মা, মা !

[জালানকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয় আরতি]

তরু : আপনি চলে যাবার পর মেয়ে কেঁদে-কেটে মুখচোখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

আরতি : তোকে এসব কথা কে বলতে বলেছে মা ?

জালান : এখনও তোমার রাগ যায়নি আরতি ?

আরতি : আপনাকে কে ডেকেছে ?

তরু : বড়দের সঙ্গে ওভাবে কথা বলে না।

আরতি : তুই চুপ কর তো !

তরু : বলিনি—মেয়ে খুব আঘাত পেয়েছে ! ওর ধারণা সবাই বুঝি ওরই মতো উদার। তাতে আবার, বয়সই বা কতো যে এসব বুঝবে !

জালান : আমার দোকানে হরেক রকমের নতুন নতুন কাপড় এসেছে। চলো, তুমি একবার নিজের চোখে দেখে আসবে, আরতি।

আরতি : বলেছি না, আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না !...আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

তরু : এতো ক'রে বলছেন যখন, এইবারটা ভুলে যা'।

আরতি : তুই কী বুঝবি মা—আমাকে যেসব কথা শুনিয়েছে—

[মিছামিছি চোখের জল মোছে]

জালান : আমি সত্যিই খুব অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করো আরতি।

তরু : যা, যা, আরতি, নতুন নতুন ছিট কাপড় দেখে আয় গিয়ে ; মনটা ভালো হয়ে যাবে।

আরতি : ওঁর ধারণা, আমাকে কিনে নিয়েছেন !

জালান : আমাকে আর লজ্জা দিও না, আরতি !

তরু : একটু ঘুরে আয়, মনটা হালকা হবে।—ছিটকাপড় কিছু দিলেও নিবি না কিন্তু।

আরতি : এর পরেও ওঁর জিনিস নিতে যাব !

জালান : ওভাবে বোলো না আরতি। তোমাকে নিয়েই গড়ে উঠেছে আমার সমস্ত সম্পদ। যেখানে যতো ধন-দৌলত আছে, আমার না,—সব তোমার।

তরু : কী বলব জালান সাহেব—ধন-সম্পত্তির জন্যে মেয়ের বিন্দুমাত্র মোহ নেই ! এতো ক'রে বোঝাই, আমার কথা মোটেই শোনে না।

জালান : এসো আরতি—আমাকে আর দুঃখ দিও না।

তরু : যা আরতি ; এতো আদর, অবহেলা করিস নি।

[আগে আগে আরতি, পেছনে পেছনে জালান বেরিয়ে যায়। ভেতরের দিক থেকে বসন্ত আসে]

বসন্ত : বুয়েচ' তরু—লোকে বলে, আমি নাকি পাগলের বেশ ধরেছি। মদ খেয়ে মিথ্যেমিথ্যি নেশার ভান করি, এসব নাকি আমার সুন্দর অভিনয় !—তোমার কি ধারণা ? তুমিও কি লোকেদের কথায় সায় দাও ?

তরু : কী জানি ! আপনার কথা আমি বলতে পারব না !

বসন্ত : অভিনয় একা আমি করি না। তুমিও করছো, আরতিও করছে,—আমরা সবাই করছি। চমৎকার অভিনয় ! না কি বলো ?

তরু : আপনি আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

বসন্ত : হুঁ—তোমাকে না জিজ্ঞাসা করব তো কাকে করব ? আমার আর কে আছে ?...আর, অভিনয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছেই বা ক'জনের ? কাকে বলে অভিনয় —বোঝেটা কে ? যতো সব গাধার দল ! গাধার মতো পরের বোঝা বইবার জন্যেই ওদের জন্ম হয়েছে। ওদের কথা মনে হলেই ঘেন্নায় আমার নাক পর্যন্ত কুঁচকে আসে।

তরু : আপনি এইভাবে চললেই হবে ? ভবিষ্যতের কথা তো ভাবতে হবে।

বসন্ত : কী বললে ? ভবিষ্যৎ ? আমার ভবিষ্যৎ ?...আমার ভবিষ্যতের কথা আমি আগেই জানি।...আমার ভবিষ্যৎ হবে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত !

তরু : আধ-পাগলের মতো এসব কী বলছেন ?

বসন্ত : আধ-পাগল !...তার মানে, লোকেরা যা বলে, সেই কথাই ঠিক। তুমিও আমাকে আধা-পাগল বলেই ভাবো !

তরু : এতো মদ খেলে মানুষ পাগল হবে না তো কী হবে ?

বসন্ত : মদ খেলে মানুষ পাগল হয় !—তরু, তবে তোমার এক অদ্ভুত আবিষ্কার ! দুনিয়ায় আজ কে মদ খায় না ? তুমি জানো, সত্য যুগে দেবতারাও মদ্যপান

করত ; আর সেই মদকে তুমি এতো ঘৃণা করো ! মদ খাই দেখে, মাতাল ব'লে, তুমি তোমার স্বামীকে আধ-পাগল পর্যন্ত বানিয়ে দিয়েছো !

তরু : এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে, আপনি আধা-পাগল নন, একেবারে ঘোর উন্মাদ, পুরো পাগল। পাগলা-গারদে যাবার আর বেশিদিন বাকি নেই।

বসন্ত : পাগল—হাঃ হাঃ হাঃ ! ভাববেই তো ; ভাববে নাই বা কেন ! আমাকে পাগল সাজিয়ে তোমার যে লাভ আছে ; এতে তোমার ষোল-আনা স্বার্থ আছে যে ! কাজেকাজেই, দরকার হলে, জোর করেও তুমি আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বে।...কিন্তু সে-সুযোগ, এবার আর আমি তোমাকে দেব না। যদি সেরকম কোন আশা করে থাকো, তাহলে নিরাশ হতে হবে। শুধু নিরাশই নয়, তার ভয়ংকর পরিণামও তোমাকে ভুগতে হবে।

[বাইরে থেকে 'মা মা' ব'লে ডাকতে ডাকতে অমল প্রবেশ করে, এবং বসন্তকে দেখে থমকে পড়ে]

অমল : মা, মা...

তরু : কী হয়েছে অমল ?

অমল : না—মা...

বসন্ত : বুঝেছি...তোমার মুখ দেখেই ধরতে পেরেছি। আমার সামনে কথা বলতে তুমি সংকোচ বোধ করছো। আমারও মনে হচ্ছে, নেশাটা যেন অল্প-অল্প কেটে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলও লাগছে। কাজেই, তোমরা দুজনে মন খুলে কথা বলো, আর আমিও ভেতরে গিয়ে একটু নেশা ক'রে আবার শক্তি সঞ্চয় করে আসি।

[কথাগুলো বলতে বলতে ভেতরে যায়]

অমল : মা, বাড়ি থেকে আমি বিয়ের অনুমতি পেয়েছি। এই দেখুন, চিঠি।

তরু : (চিঠিটা হাতে নিয়ে) আমি একটা কথা ভাবছি অমল ; বিয়েটা এই মাসেই হয়ে যাক। দিনক্ষণ আর দেখব না। টাকা পেলে, পুরুতমশাই মত দেবেন।

অমল : কিন্তু ফাল্গুনে হবে ব'লে আমি যে বাড়িতে লিখেছিলুম।

তরু : তাতে কী হয়েছে ? আজ আবার লেখো।

অমল : আচ্ছা, এতো তাড়াতাড়ি করতে চাইছেন ক্যানো ?

তরু : শুভকাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

অমল : বাবা-কাকারা যে কী বলবেন, মা।

তরু : তোমার মতের বিরুদ্ধে তাঁরা তো কখনও যান না।

অমল : আমি মা'র কথা ভাবছি। এই মাসেই বিয়েতে রাজী হবেন কি হবেন না ! তিনি এসব খুব মানেন।

তরু : চুকলিখোরদের কথা ভেবে আমি খুব ভয় পেয়েছি। ওরা বিয়েটা ভাঙার

জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। আমার কথা ছেড়েই দাও, আরতির কাছে তোমার সম্বন্ধে কতো কথা বলেছে !

অমল : আরতি কোথায় ?

তরু : বাজারে গেছে...কাপড় কিনতে।

অমল : ঠিক আছে, কোন চিন্তা করবেন না। আমি আজই চিঠি লিখব... টেলিগ্রামও করব।

তরু : হ্যাঁ বাবা, বিয়েটা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।... আচ্ছা অমল, তুমি একটু ব'সো। আরতি এখনই আসবে। আমি আমাদের পুরুতের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি।

[তরু বেরিয়ে যায়। অমল একটা চেয়ার টেনে এনে বসতে যায়, বসন্ত এসে ডাকে—]

বসন্ত : অমল !

অমল : আজ্ঞে !

বসন্ত : তুমি তাহলে বিয়ে-করাটা একরকম স্থিরই করে ফেললে ?

অমল : হ্যাঁ—প্রায় হয়েছে বলেই ধরুন।

বসন্ত : কিন্তু, আমার মত যদি নাও– তুমি অন্তত আর একবছর অপেক্ষা করো।

অমল : কেন বাবা ?

বসন্ত : বিয়ে করার যোগ্যতা তোমার এখনও হয়নি—

[অমল অবাক হয়ে বসন্তের মুখের দিকে চেয়ে থাকে]

—আমি যা বললাম, বুঝতে পেরেছো না না ?

অমল : বুঝেছি।

বসন্ত : কী বুঝেছো ?

অমল : আমি আরতির যোগ্য নই।

বসন্ত : তোমার মুণ্ডু বুঝেছো। বলেছি না, তুমি একটা মহা অপদার্থ।

অমল : আমি অপদার্থ ?

বসন্ত : হ্যাঁ, তুমি অপদার্থ !

অমল : আমার সম্পর্কে এরকম ধারণার কারণ ?

বসন্ত : তোমার মঙ্গলের জন্যে।

অমল : আমার মঙ্গল... !

বসন্ত : জানি, জানি, অমল—তোমার ওই নির্মল চোখজোড়া দেখেই বুঝতে পারছি—আমার কথায় তুমি খুব আঘাত পেয়েছো। তবু, তবু, অমল—তোমাকে আঘাত দিতে বাধ্য হয়েছি। এরমধ্যে আমার একটুও স্বার্থ নেই। কেবল তোমার ভালোর জন্যেই তোমাকে আমি আঘাত করেছি।

অমল : আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, বাবা।

বসন্ত : কি ক'রে বুঝবে অমল, কি ক'রে বুঝবে? এমন একদিন ছিল, যেদিন আমিও তোমার মতো অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই আজ আমাকে অনেক কথা শিখিয়ে দিয়েছে। সেইজন্যেই তোমাকে আমি দোষ দি'নি অমল! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার এই অল্প বয়সের কোমল দৃষ্টিতে কুটিল সংসারের চাতুরীগুলো ধরা পড়বেই বা কেমন ক'রে? সেইজন্যেই বলছি অমল...আমার কথা শোন—এক বছরের জন্যে বিয়েটা পিছিয়ে দাও।

[তরু বাইরে থেকে দ্রুত প্রবেশ করে, এবং বসন্তর মুখের ওপরেই বলে—]

তরু : আপনি বললেই তো হবে না। এখন বিয়ে পিছিয়ে দোব কি ক'রে?

বসন্ত : তোমারও তাহলে এই একই সিদ্ধান্ত, অমল?

তরু : ওর মত নিয়েই করেছি।

বসন্ত : তুমি ওপর-পড়া হয়ে কথা কইছো ক্যানো? অমলের মুখ থেকেই আমি শুনতে চাই। কারণ—তুমি যে জাল ফেলেছো, তাকে ভেদ ক'রে নিজেকে মুক্ত করবে, সে-শক্তি অমলের নেই।

তরু : আপনি বাপ হ'য়ে বিয়ে ভাঙতে এসেছেন?

বসন্ত : অমল, চুপ ক'রে আছো ক্যানো?

তরু : কী আর বলবে?

বসন্ত : বেশ। কিন্তু, মেয়ের বাপ হিসেবে, এই বিয়েতে, তুমি আমার অনুমতি পাবে না।

অমল : বাবা!

বসন্ত : এই তিনকুড়ি বছর বয়সে, নতুন ক'রে আর পাপের ভাগী হতে চাই না।

অমল : আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন।

বসন্ত : অমল...

অমল : আমার জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

বসন্ত : এতো উতলা হ'য়ো না।

অমল : আমি জানি—আপনি আমাকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন; সেই জোরেই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি—

বসন্ত : দেব না,...আমি কখনও অনুমতি দেব না।

অমল : আমার সমস্ত জীবন নির্ভর করছে আপনার ওপর, বাবা!

বসন্ত : অমল... !

[বসন্ত পাগলের মতো 'অমল' ব'লে চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জালান সাহেব উর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করে; তার কপাল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তরু, অমল এবং বসন্ত, তিনজনে বিস্মিত।]

জালান : অ্যাক্সিডেণ্ট্, ভীষণ অ্যাক্সিডেণ্ট্, বসন্তবাবু!

তরু : কার অ্যাক্সিডেণ্ট—জালান সাহেব?

জালান : মোটরের চাকার তলায় প'ড়ে মাথা একেবারে থে'তলে গেছে।

তরু : (উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করে) কার ?

জালান : আরতির !

তরু : আরতি...আরতি...

[ব'লতে ব'লতে জালানের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, এবং দ্রুত বেরিয়ে যায়। পেছনে জালান। অমল যাবার জন্যে পা বাড়ায় ; বসন্ত বাধা দেয় ; অমল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে]

বসন্ত : শুনে যাও অমল—আরতির মৃত্যু তোমার নতুন জীবন গড়ে তোলার পথ খুলে দিল।

[বসন্তর কথা শুনে অমল মাথা নীচু করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পট]

পুতুল-নাচ

ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া

চরিত্র ঃ

অফিসের ম্যানেজার
কৃষ্ণ চৌধুরী
প্রদীপ মজুমদার
সঞ্জয় রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা দেবী

প্রাসঙ্গিক

শইকীয়া জনপ্রিয় গল্পলেখক (প্রহরী, গহ্বর, সেন্দুর), রেডিও-নাটক রচনায় ইনি বুৎপত্তি দেখিয়েছেন। ডঃ শইকীয়া গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বিভাগের সচিব ছিলেন। বর্তমানে তিনি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সারভিস কমিশনের অধ্যক্ষ।

[স্থান : এক ইনডাসট্রিয়াল ফার্মের ক্যাশরুম। দর্শকের চোখে পড়ে : টাকা রাখার একটা লোহার সিন্দুক ; দেয়ালে একটা ঘড়ি ; চারটে টেবিল ; একটায় টাইপরাইটার। সন্ধ্যা টাইপ করছে।

এককোণে, কোণাকুণি ক'রে থাকা আর একটা টেবিল, তার ওপরে এক টাকা, দশ টাকা, একশো টাকা নোটের বাণ্ডিল। কিছু টাকা ছড়িয়েও রয়েছে, বাণ্ডিল বাঁধা হয় নি। প্রদীপ মজুমদার টাকা গুনছে, আর কী-যেন লিখছে। বুড়ো কৃষ্ণ চৌধুরীও একটা প্রকাণ্ড বইতে কী-সব লিখছে, বাঁ হাতে কাগজ চেপে রেখেছে। সঞ্জয় রায়চৌধুরী দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সে একবার এ মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে গেছে। কেউ কারও দিকে দেখছে না।

দরজায় 'টক টক' শব্দ হল। সবাই দরজার দিকে তাকাল। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে সঞ্জয় এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। প্রবেশ করলেন ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। সবাই দাঁড়িয়ে উঠল। ম্যানেজার সকলকে দেখলেন। তারপরে হাতঘড়িতে সময় দেখলেন]

ম্যানেজার : আপনাদের আর কতোক্ষণ লাগবে? (চৌধুরীর দিকে চেয়ে)—কতো দেরি হবে চৌধুরী?

চৌধুরী : বেশি দেরি হবে না, স্যর। আধঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।

ম্যানেজার : ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে হলেই হবে। ভল্ট-এ ক্যাশ রেখে, চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চাবি দিয়ে আসবেন। আমি চারটে পর্যন্ত অফিসে আছি। বসুন, আপনারা বসুন। (কেউ বসে না)—তারপর রায়চৌধুরী, (সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে)—আমাদের অফিস আপনার ক্যামন লাগছে?

সঞ্জয় : (কোন গুরুত্ব না দিয়ে) অফিস আর ক্যামন লাগবে! ভালোই লাগছে।

ম্যানেজার : না, মানে, আপনার পক্ষে নতুন অফিস তো ; এখানকার ব্যবস্থাগুলো নতুন হতে পারে ; বুঝে-শুনে নিতে কিছুটা সময় লাগবে।

সঞ্জয় : অফিসটা অবশ্য আমার কাছে নতুন ; কিন্তু ক্যাশরুম—আমার পক্ষে—সবই সমান। কারও বা ভল্টে টাকা বেশি থাকে, কারও বা কম। কোন কোন ক্যাশ-রুমে অনেক লোক নিয়ে কাজ করতে হয়, (সকলের দিকে একবার চেয়ে)—কোন কোন রুমে কম। আমি সমস্ত বুঝে-শুনে নিয়েছি, কোন অসুবিধে হয় নি।

মানেজার : তাহলে তো খুবই ভালো কথা। শুনে খুশী হলাম। আশা করি, আমাদের অফিস আপনার ভালোই লাগবে। Wish you the best of luck.

সঞ্জয় : Thank you, Sir.

ম্যানেজার : (যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে) আপনি দেখবেন রায়চৌধুরী—চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গেই চাবিটা যেন আমাকে দিয়ে আসা হয়।

[ম্যানেজার চলে যায়। সঞ্জয় গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ; তারপর ফিরে এসে, রাগতভাবে]

সঞ্জয় : চাবি—চাবি—চাবি! এই লোকগুলো চাবির জন্যে এতো পাগল হয় ক্যানো ?

[বাকী সবাই বসেছিল। সঞ্জয়ের রাগ দেখে ওরা অবাক হয়]

মজুমদার : আপনি এ্যাতো বিরক্ত হচ্ছেন কেন রায়চৌধুরী ?

সঞ্জয় : বিরক্ত হওয়া—না-হওয়ার কথা নয় মজুমদার।...আপনারা তো এখানে অনেকদিন থেকেই কাজ করছেন। রোজই হাজার হাজার টাকার লেন-দেন করছেন। আর, চাবিটাও আপনারা প্রত্যেকদিনই ঠিক সময়েই নিশ্চয় জমা দিচ্ছেন।...দিচ্ছেন, না না ?

মজুমদার : দিচ্ছি।

সঞ্জয় : তাহলে ? আজই কি দরকার ছিল ম্যানেজারের নিজে ক্যাশরুমে এসে চাবিটার কথা বার বার মনে করিয়ে দেওয়ার ? নাকি ওঁরা ভাবেন যে—কর্মচারীদের দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান হঠাৎ কখন বুঝি উবে যায় ?

মজুমদার : মানে, কাল এক তারিখ, মাইনের দিন। আজ normal transaction-এর চেয়ে অন্তত আশী হাজার টাকা ক্যাশ বেশি থাকবে। এইসব দিনে ম্যানেজার সবসময় নিজে এসে চাবির খবর নেন।

[সন্ধ্যা টাইপ করতে আরম্ভ করে]

সঞ্জয় : কিন্তু চাবির খবর নিয়ে লাভটা কী ? ধরুন, আজ ঠিক চারটের সময় আপনি গিয়ে ম্যানেজারকে চাবিটা দিয়ে এলেন। কিন্তু কাল সকাল দশটায় ওই চাবিটা দিয়েই সিন্দুকটা খুলে যদি তিনি দেখেন যে আশী হাজার টাকার জায়গায় আশীটা টাকাও নেই—তাহলে কী হবে ?

[সকলে চমকে তাকায়]

চৌধুরী : হয়তো কিছুই হবে না। কেবল, কাল পয়লা তারিখে অফিসের এতো খাটুনীর বদলে আমরা সবাই জেলখানায় বিশ্রাম নিতে পারব।

[চৌধুরীর মুখের দিকে চেয়ে সঞ্জয় কাছে চলে আসে]

সঞ্জয় : জেলের সামনে দিয়েই আমি আসা-যাওয়া করি চৌধুরীমশাই। জেলের ভেতরে যাওয়া এতো সহজ নয়। এতো সহজ হলে, আজ জেলের বাইরে কতো মানুষ থাকত, বলতে পারেন ?

মজুমদার : জেলের ভেতরে যতো মানুষ, তার চেয়ে কম।

সঞ্জয় : ঠিক বলেছেন।

চৌধুরী : কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমাদের মতো—যাদের ঘরের ক'টি প্রাণী একজনের মুখের দিকে চেয়ে আশা-পথ চেয়ে থাকে—তাদের জেলে যাওয়ার সুবিধে অনেক বেশি। জেলখানাই তাদের 'এসো এসো' বলে ডাকতে থাকে।

সঞ্জয় : (একটু হালকা সুরে) বন্দুক হাতে পশ্চিমা দরোয়ান, শক্ত শক্ত লোহার শিক লাগানো দরজা, নতুন নতুন নোটের বাণ্ডিলের লেন-দেন করতে করতে চৌধুরী মশাইকে জেলখানার আতঙ্ক ধরেছে বলে মনে হচ্ছে ! (একটু থেমে) —আপনার সংসারে কে কে আছে চৌধুরী ?

চৌধুরী : আমার সংসার এমনিতেই ছোট । একটি মেয়ে, একটি ছেলে । মেয়েটি বড়ো, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে ; ছেলেটা ছোট, ক্লাস এইটে পড়ে । আর, ওদের মা—এই ক'জন !

সঞ্জয় : ও, আপনার মেয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে ? মানে বেশ বড়োই হয়েছে বলুন । আর, মেয়ে বড়ো হওয়া মানে একটা সমস্যা বেড়ে যাওয়া । তাই না ?

[একথা ব'লে চৌধুরীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়]

চৌধুরী : সে আর বলতে ? মেয়ের বয়স এখন সতেরো । আরও তিন-চার বছর হয়তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি । কিন্তু তারপরে আর উপায় নেই ।

সঞ্জয় : কেন উপায় নেই ? মেয়ে পড়ছে, পড়তে থাকুক । আই-এ পাশ করুক, বি-এ পড়ুক ; বি-এ পাশ করুক, এম-এ পড়ুক ।

চৌধুরী : এরকম হলে তো কথাই ছিল না । কিন্তু এসবের জন্যে ভাগ্য চাই ।

[চৌধুরীর কাছে সন্ধ্যা উঠে আসে ; হাতে একটা কাগজ]

সন্ধ্যা : এগুলো কি একটা কলামে টাইপ করতে হবে, না প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা-আলাদা কলাম করতে হবে ?

চৌধুরী : দেখি । না—একটা কলামেই করতে হবে ।

সন্ধ্যা : ক' কপি ক'রে হবে ?

চৌধুরী : তিন কপি ক'রে ।

সন্ধ্যা : আচ্ছা ।

[সন্ধ্যা নিজের জায়গায় ফিরে যায়]

সঞ্জয় : আপনি ভাগ্যের কথা বলছেন, চৌধুরী মশাই । কিন্তু অদৃষ্টের ওপর বরাত দিয়ে বসে থাকলে কি কিছু হয় ? মেয়ে পরীক্ষা দিক, পাশ করতে থাকুক । যদি প্ল্যান মতো কাজ না হয়, তাহলে কতো রাস্তা খোলা আছে । ধরুন, মেয়ে টাইপ-রাইটিং শিখল, শর্টহ্যাণ্ড শিখল ; তারপরে এই বিরাট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের অফিস তো আছেই !

চৌধুরী : না, না, আমার মেয়েকে আমি অফিসে চাকরি করতে দিতে পারব না ।

[সন্ধ্যা নিজের টেবিলের পাশ থেকে ঘুরে তাকায় ; সঞ্জয় সন্ধ্যার দিকে একবার দেখে নেয়]

সঞ্জয় : কেন ? অফিসের চাকরি কি খারাপ ? এইতো, আপনার সামনেই ব'সে সন্ধ্যাদেবী চাকরি করছেন।... দেখলেন সন্ধ্যাদেবী, আপনার কলীগ্‌-এর আপনাদের সম্বন্ধে কিরকম ধারণা !

সন্ধ্যা : (আহত কণ্ঠে) না—উনি ঠিকই বলেছেন।

সঞ্জয় : মানে ?...তার অর্থ—এখানে চাকরি করা আপনার ভালোলাগছে না ?

সন্ধ্যা : ভালো লাগা না-লাগার কথা নয়।

সঞ্জয় : (সঙ্গে সঙ্গে) না, না, আমি একটা পরিষ্কার উত্তর চাইছি। ধরুন, ওঁর মেয়ের (চৌধুরীকে)—কী নাম আপনার মেয়ের চৌধুরীমশাই ?

চৌধুরী : নির্মালী।

সঞ্জয় : নির্মালী।...ধরুন, নির্মালীর একদিন চাকরি করার ইচ্ছে হল। চাকরির অভিজ্ঞতা আপনার আছে ; কাজেই সে এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করল—সে চাকরি করবে কি করবে না—আপনি কী বলবেন ?

সন্ধ্যা : বলব—আমার মতো দুর্ভাগ্য যদি তারও হয়েছে এবং ভদ্র উপায়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তাহলে চাকরি করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কিন্তু চাকরি করতে ভালো লাগবে কি লাগবে না, সে তো আমি বলতে পারব না। কারণ—আমার ক্ষেত্রে আমি জানি—ভালো না লাগলেও আমার কোন উপায় নেই...আমি প্রয়োজনের তাড়নায় চাকরি করছি।

[সন্ধ্যা টাইপ করতে থাকে]

সঞ্জয় : জীবন-সংগ্রামের আইডিয়ালটা আপনাদের ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের কথার সুরে এতো হতাশা মেশানো কেন বলুন তো! এই বয়সে আপনার কী এমন দুর্ভাগ্য, কী এমন প্রয়োজনের তাড়না ?

[সন্ধ্যার কাছ থেকে উত্তরের আশায় চুপ করে থাকে ; কিন্তু সন্ধ্যা উত্তর না দিয়ে নীরব থাকে ; সঞ্জয় আহত হয়]

—বুঝেছি ; সেকথা হয় আপনি বলতে পারবেন না, বা বলতে চান না। আমি বোধহয় বড় বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেলেছি। I'm sorry.

[হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এবং মজুমদারের কাছে আসে]

—এইটেই আমাদের সবচেয়ে মুশকিল, জানেন মজুমদার !...পরস্পরকে জানতে হলে অনেক ব্যক্তিগত কথা স্পর্শ করার দরকার হয়। মনে আছে, এইমাত্র ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—অফিস আমার ক্যামোন লাগছে, সব বুঝে-শুনে নিয়েছি কি নিইনি ? তার মানে, তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল—এই ক্যাশরুমের নোটের বাণ্ডিলের হিসাব রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি আমার ক্যামোন লাগছে। এই যে এইসব দফায়-দফায় ফাইল, এইসব বইয়ে ইস্যু নাম্বার, চেক নাম্বার, ব্যালান্স, টোটালের আলাদা-আলাদা ঘর—এইসব দেখেশুনে নিয়েছি কিনা।... কিন্তু—এই ঘরে যে আরও তিনটি প্রাণী কাজ করেন, তাঁদের আমার ক্যামোন লাগছে—এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই তাঁর জিজ্ঞাস্য ছিল না।...

[চৌধুরীর কাছে এসে—]

—চৌধুরী মশাই, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সন্ধ্যাদেবী একটা মেশিনের সঙ্গে

কাজ করেন ; কিন্তু তিনি নিজে মেশিন নন। আজ ওই মেশিনটার অসুখ হোক, সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার কোম্পানীর লোককে খবর দেবে। লোক আসবে, মেশিনের মেরামতী হবে। কিন্তু সন্ধ্যাদেবীর একটা অসুখ হোক, তাঁর নিজের ক্যাজুয়াল লীভ্ কয়েকটা খরচ হবে। আর, সেই সময়ে আমি যদি তাঁর ঘরে যাই খবর নেবার জন্যে,—তাহলে তার অর্থ হবে : আমি বড্ড বেশি পার্সোন্যাল কথা জানতে চাইছি।

মজুমদার : না, না, রায়চৌধুরী, আপনি ভুল বুঝেছেন। ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের তিনজনের মধ্যে একটুও কৃপণতা নেই। সন্ধ্যাদেবীর কাছ থেকে যেটুকু ব্যক্তিগত খবর আপনি জানতে চেয়েছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি ব্যক্তিগত কথা আমরা এখানে আলোচনা করি। সন্ধ্যাদেবী তাঁর প্রয়োজন ও দুর্ভাগ্যের কথা যে বলতে পারেন নি—বোধহয় লজ্জায়। আমি বলছি, শুনুন—উনি বিয়ে করার কথা ভাবছেন।

সঞ্জয় : (উৎফুল্ল হয়ে) বিয়ে ? সুন্দর কথা। কন্‌গ্র্যাচুলেশন সন্ধ্যাদেবী! উইশ্ য়ু গুড্‌লাক।...নিশ্চয় নিশ্চয়, বিয়ে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, একটা মোহময় প্রয়োজন। (চৌধুরীর কাছে এসে হালকা সুরে)—এই জাতীয় কথার বাতাসে যৌবনের উত্তাপ লাগছে। আশা করি, আপনি খারাপ ভাবছেন না চৌধুরী মশাই ?

মজুমদার : না, না, উনি খারাপ ভাবেনই না। উনি আমাদের বন্ধু, গুরু, একসঙ্গে সব। জানেন তো, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একটা ঘরে কাজ করলে কী হয় ?

সঞ্জয় : জানি।...বলুন তো সন্ধ্যাদেবী—বিয়ের প্রয়োজনের কথাটা বুঝি, কিন্তু তার মধ্যে আপনার দুর্ভাগ্যের কথা এল কি ক'রে ?

সন্ধ্যা : কথাটা আসলে অন্য ধরণের। আমার দুর্ভাগ্যের মধ্যেই প্রয়োজন কথাটা এসে গেছে। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

সঞ্জয় : সে-তো সব মেয়েরই হয়।

সন্ধ্যা : আমি যাঁকে বিয়ে করব, তাঁকেও বাড়ি ছেড়ে আসতে হবে। আমরা যে কাজ করছি, তা বাড়ির অমতে এবং সমাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন আর আমাদের ফিরে যাবার সময় নেই। আমার বয়স হয়েছে। এখন আর আমি সতেরো বছরের অনভিজ্ঞা বালিকা নই।

[চৌধুরী সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দেখে। সঞ্জয় সেটা লক্ষ্য করে]

সঞ্জয় : ঠিক আছে, আপনার মনে শক্তি আছে, সাহস আছে ; কিন্তু এর মধ্যে দুর্ভাগ্যটা কোথায় ?

সন্ধ্যা : যে-রাস্তা আমরা বেছে নিয়েছি, সে-পথ দিয়ে এগোতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। যেখানেই থাকি না কেন, মাথা গোঁজবার জন্যে একটা ঘরের

দরকার, এক মুঠো ভাতের দরকার। অর্থাৎ, এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অফিসে আমার চাকরি করাটা প্রয়োজন।

সঞ্জয় : কেন আপনার ভাবী স্বামী? তিনি তো নতুন সংসারের ভার নিতে পারেন?

সন্ধ্যা : পারেন না। তিনি আই-এ পাশ মাস্টার। মাইনে পান মোট পঁচানব্বুই টাকা।

সঞ্জয় : (সঙ্গে সঙ্গে) আপনি কতো পান?

সন্ধ্যা : একশো দশ টাকা।

সঞ্জয় : (গম্ভীরভাবে এদিক-ওদিক পায়চারী ক'রে) একশো' দশ টাকা—কথাগুলো শুনতে ক্যামোন লাগে চৌধুরীমশাই?—এইজন্যেই বোধহয় আপনি বলেছিলেন—আপনার মেয়ের বয়স সতেরো বছর, ইচ্ছে করলে অন্তত আরও তিন-চার বছর আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন; তার পরে আর না। আপনি হয়তো ভাবছেন, হঠাৎ যদি আপনার মেয়ের জীবনেও সন্ধ্যাদেবীর মতো একটা দুর্ভাগ্য নেমে আসে!

চৌধুরী : না না না। ওটা আমি ভাবিনি।...রায়চৌধুরী, বয়স আমার গালে দাগ কেটেছে, আমি বুড়ো হয়েছি। আবার সময় আমাকে শিখিয়েছেও অনেক। নির্মালী আমার একমাত্র মেয়ে। সে যদি নিজের জীবনের রাস্তা খুঁজে নেয়, আমি কি ক'রে বাধা দোব? কেন বাধা দোব? মেয়ের জীবনের এমন দীর্ঘ চলনপথ বেঁধে দেবার ক্ষমতা যদি আমার থাকত, একমাত্র তখনই বাধা দেওয়ার প্রশ্ন উঠত।...তবু, ও যেখানেই যাক না কেন, একমাত্র কন্যার বাপ হিসেবে, ম্যারাপ বেঁধে, শঙ্খ-উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে মেয়েকে বিয়ে দেবার ইচ্ছে তো একটা আছে। তার জন্যে আয়োজনও আছে। আমি সেইটের কথাই ভাবছি।

সঞ্জয় : ও, আপনি শঙ্খ-উলুধ্বনির কথা, ডেকরেশনের খরচের কথা ভাবছেন? তা, সে তো কোনো বড় সমস্যাই নয়।

চৌধুরী : না হলে তো ভালোই ছিল রায়চৌধুরী। কিন্তু হয় যে!...একটা মেয়েকে বিয়ে দেবার খরচ, একটা ছেলেকে মানুষ করার খরচ—আমার মতো মানুষের পক্ষে সমস্যাই, রায়চৌধুরী।

[হাতে তুলে-নেওয়া একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে সঞ্জয় খেলা করতে থাকে]

সঞ্জয় : কী অদ্ভুত জিনিস—টাকা! (মজুমদার সশব্দে হাসে)—কী মজুমদার, হাসলেন যে? এরকম কোন দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা কি আপনারও আছে?

মজুমদার : (ম্লান হেসে) আমাকে দেখে আপনার কি রকম মনে হয়?

সঞ্জয় : আপনার মতো বয়সের ছেলেকে আমি এই শরৎকালেই এয়ারওয়েজ অফিসে রেঙ্গুন-টোকিও-কাশ্মীরের টিকিট বুক করতে দেখেছি। তারা সব হলিডে করতে যাচ্ছে। কিন্তু দেখলেই তো হয় না।

মজুমদার : (হাসে) হয় না-ই তো। দ্যাখার পরে তাদের জিজ্ঞাসা করা দরকার—তাদের ঘরবাড়ি, জমিজমা সব বন্ধক আছে কিনা!

সঞ্জয় : (বিস্মিত হয়ে) আপনার ঘরবাড়ি বন্ধক আছে ? ঘটনাটা কী ?

মজুমদার : (উত্তেজিত হয়ে) ঘটনাটা খুবই ছোট্ট, রায়চৌধুরী। আমি রোজই এঁদের বলি—আপনারা সুখী। আপনাদের সমস্যা কোন সমস্যাই নয়। শুনুন—আমার বাবার লাখ টাকার বিজনেস ছিল। বিজনেস ফেল মারল। উদ্ধার করার শেষ উপায় হিসেবে ঘর বাড়ি বন্ধক রেখে বাবা, ঠিক যখনই নতুন উদ্যমে কাজে হাত দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর হল অসুখ—তার নাম, ক্যান্‌সার।... আপনি জানেন বোধহয়—এই ব্যাধিটা এলে একলা যায় না। বাবা গেলেন—সঙ্গে প্রত্যেকটা টাকা, প্রতিটি পয়সা নিয়ে গেলেন! (অল্পক্ষণ বিরতি নিয়ে) —শরৎকালে এয়ারওয়েজ অফিসে—দিল্লী-রেঙ্গুন-কাশ্মীরের টিকিট বুক করতে যাদের দেখেছেন—তারা আমি নই, রায়চৌধুরী।

সঞ্জয় : (সহানুভূতির সঙ্গে) এখন আপনি কী করছেন ?

মজুমদার : এই—কেরানীর কাজ।

সঞ্জয় : ঘরবাড়ি ?

মজুমদার : আমাদের বাড়ি-জমির দাম দু'লাখের চেয়েও বেশি। আমি মাকে এইসব ঘরদোরের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলতেই যেন বাঁচিয়ে রেখেছি। আমার কেবল চেষ্টা, মার সঙ্গে মাথা গুঁজে থাকার জন্যে শুধুমাত্র দু'কাঠা জমিও যদি উদ্ধার করতে পারি! কিন্তু, ক্রমে-ক্রমে বুঝতে পারছি—ওটা আমার দ্বারা হবে না। কোনো আশা নেই। আমার এই একশ' কুড়ি টাকা মাইনেতে এ-জীবনে আর হবে না।

সঞ্জয় : দু'কাঠা জমি উদ্ধারের জন্যে কতো টাকা লাগবে মজুমদার ?

মজুমদার : পাঁচ হাজার টাকা।

[সঞ্জয় টেবিল থেকে ক'বাণ্ডিল টাকা তুলে নিয়ে এগিয়ে দেয়]

সঞ্জয় : নিন।

মজুমদার : (হাসে) আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন, রায়চৌধুরী!

সঞ্জয় : (দৃঢ় কণ্ঠে) ঠাট্টা নয়। টাকা নিলে এইভাবেই নিতে হবে। এই টেবিলে, কম করেও, আশী হাজার টাকা পড়ে আছে। জানেন, ইচ্ছে করলে, রাত্রের ভেতরে, আপনি কী হয়ে যেতে পারেন ?

[সবাই স্তব্ধ। একটু পরে চৌধুরী সহজ হবার চেষ্টা করে]

চৌধুরী : ও ধরণের সাধু কথা আমরা অনেক বলেছি, রায়চৌধুরী। হাজার হাজার টাকার হিসেবে ক'রে ক'রে যখন হাত বিষোয়, চোখ টাটায়, তখন এক রাত্তিরের ভেতরে কী হতে পারা যায়, সে আলোচনা ক'রে ক'রে আমরা অনেক দালান

তুলেছি। আবার পরের দিন এই দুটো হাত দিয়েই একশ' পঁচাশী টাকা মাইনে—হাত পেতে নিয়েছি।

সঞ্জয় : সেইজন্যেই আমি সাধুকথা বলি নি, চৌধুরীমশাই।...আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা পরিষ্কার উত্তর চাইছি—এই আশী হাজার টাকা দিয়ে আপনাদের প্রত্যেকের তাবৎ সমস্যার তাৎক্ষণিক একটা সমাধান হতে পারে, কি পারে না ?

চৌধুরী : (শঙ্কিত হয়ে) আপনি যদি সাধুকথা না বলে থাকেন, তাহলে এই বিষয়ে আর কিছু না-বলাই ভালো হবে। এ বড় বিপজ্জনক জায়গা...এখানে দেয়ালেরও চোখ-কান আছে।

সঞ্জয় : সেইটেই তো সবচেয়ে বেশি দুঃখের কথা, চৌধুরী মশাই। দেওয়ালেরও চোখ-কান আছে ; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, আমাদের—মানুষদেরই চোখ-কান নেই। অথচ, আমাদের জীবনগুলোকে ঘিরে থাকে বেশ কিছু সঙ্গীন, বিপজ্জনক মুহূর্ত।...যেমন(মজুমদারকে)—যে কোন মুহূর্তে প্রদীপ মজুমদারকে তাঁর মায়ের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হতে পারে ; (আবার চৌধুরীকে)—যেকোন মুহূর্তে একমাত্র মেয়ে নির্মালী চৌধুরীমশাইকে নিরাশ করতে পারে ; যে কোন মুহূর্তে সন্ধ্যা দেবী—

সন্ধ্যা : কিন্তু রায়চৌধুরী, আপনার কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি কী বলতে চাইছেন ?

সঞ্জয় : আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাইছি। সাধারণভাবে জীবন-যাপনের জন্যেও আপনাদের টাকার খুব দরকার। আমি আপনাদের প্রত্যেককে বিশ হাজার ক'রে টাকা দিতে চাইছি।

সন্ধ্যা : কোথেকে দেবেন ?

সঞ্জয় : এ থেকে—এই টেবিল থেকে।

সন্ধ্যা : এখান থেকে ? কিন্তু এ থেকে দেবেন কী ক'রে ? এ তো আপনার টাকা নয় !

সঞ্জয় : নয়ই তো। কিন্তু বলতে পারেন, এ কার টাকা ? বলুন—কার টাকা ? আপনি বলতে পারবেন না ; কারণ, এ কারও টাকা নয়। আপনার না, আমার না, কারও না। বলতে পারেন—সকলের। কাল আপনি যে একশ' দশ টাকা পাবেন, সেও আপনার টাকা নয়। কিন্তু আপনার প্রয়োজনের তুলনায় সেই টাকা ক'টাও এতো কম যে তার প্রত্যেকটা পয়সা আপনি নিজের বলে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।...এই বিশ হাজার টাকা আপনি নিয়ে যান ; পথের মধ্যে তা থেকে একশো দশ টাকা পড়ে গেলেও আপনার গায়ে লাগবে না। কিন্তু যদি কোন গরীব লোক—যার একশো দশ টাকার খুবই দরকার—ওই টাকা ক'টা পায়, তাহলে ভেবে নেবে, ও তার নিজেরই টাকা, এবং সেই ভেবেই খরচ করবে।...দিনকাল বদলে গেছে, সন্ধ্যাদেবী, টাকার যার জেনুইন দরকার, টাকা তার।

সন্ধ্যা : কিন্তু দরকার তো একা আমারই নয়।

সঞ্জয় : নয়ই তো!—দরকার চৌধুরীমশাইয়ের, মজুমদারের, সক্কলের।... নিন।—চৌধুরী নিন বিশ হাজার, মজুমদার নিন বিশ হাজার, আর আপনি—

সন্ধ্যা : আপনি চুরি করতে বলছেন...ডাকাতি করার কথা বলছেন।

সঞ্জয় : (একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে) চুরি-ডাকাতি ঠিক না—

সন্ধ্যা : চুরি না তো কী ? টাকা হচ্ছে অফিসের ক্যাশের। কাল সই করার পরে, এই আশী হাজারের মধ্যে থেকে আমার হাতে তুলে দেওয়া হবে একশো দশ টাকা ; তার চেয়ে বেশি আর একটা পয়সাতেও আমার অধিকার নেই। অথচ, আপনি প্রত্যেককে বলছেন বিশ হাজার ক'রে নিয়ে যেতে।...এটা চুরি না ?

সঞ্জয় : আচ্ছা, ধরে নিন, চুরি। তারপর ?

সন্ধ্যা : আমি চেয়ে খাব, ভিক্ষে করে খাব, না খেয়ে থাকব, সে-ও ভালো ; তবু ও-টাকায় আমার দরকার নেই। ছি ছি ছি!...না না—আপনি ঠাট্টা করছেন... নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।

সঞ্জয় : ঠিক ঠাট্টা না ; আবার, ঠাট্টাও বলতে পারেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মগুলো যখন লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে জুয়ো খেলে, তখন আশী হাজার টাকার এদিক-ওদিক করাটা—ঠাট্টা বললেও বলতে পারেন।

সন্ধ্যা : না, না। এ ধরনের ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। দয়া ক'রে এসব কথা বন্ধ করুন ; আমার অসহ্য লাগছে।...কখনও-সখনও বিপদে পড়লে ক্যাশ থেকে পাঁচ দশ টাকা নিয়ে যাই, মাইনে পেলেই ফেরত দিয়ে দি। যতক্ষণ না ফেরৎ দিতে পারছি, আমার বুক ধুকপুক করতে থাকে। লোকের টাকা নিয়ে খেলা করার যোগ্যতা আমার এর চেয়ে বেশি নেই।

সঞ্জয় : যোগ্যতা বলে তো কোন স্থির বস্তু নেই!

সন্ধ্যা : আছে, আছে ; আমার একটা একশো-দশ টাকার যোগ্যতা আছে। তার বেশি আমার কিছু দরকার নেই। একসঙ্গে এতো হাজার-হাজার টাকা দেখতে পাওয়াটাই আমার দুর্ভাগ্য। এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য কাঁধে নেওয়ার মতো ছেলেমানুষী আমি করতে চাইনা, রায়চৌধুরী। চৌধুরী মশাই করুন, মজুমদার করুন, আমাকে বলবেন না—আমি পারব না।

চৌধুরী : আপনি কি সত্যি-সত্যি চুরি করার কথা বলছেন নাকি রায়চৌধুরী ?

সঞ্জয় : একে চুরি করা বলে না, আমি তা বলতে পারব না।...আমি একটা পরিষ্কার কথা বলছি। টাকার চিন্তাই আপনাদের পঙ্গু করে ফেলেছে। এই আশী হাজার টাকা আপনাদের কাজে লাগান ; তাতে আপনাদের জীবনের রং বদলে না গেলেও দুর্ভাবনা কমবে।

চৌধুরী : ঠিক তার উলটোটাই হবে, রায়চৌধুরী। দুর্ভাবনাই আমাকে গ্রাস করবে, আমার জীবনের রং বদলে যাবে।...কিন্তু আপনি এসব বলতে পারছেন কি ক'রে ?

সঞ্জয় : বলতে পারছি, এই জন্যে, নিজের সন্তানকে মানুষ করতে না পেরে ভাগ্য-ভাগ্য বলে কপাল চাপড়ানোর অভ্যেস আমার নেই।

চৌধুরী : না না, সন্ধ্যা ঠিকই বলেছে। আমি যদি আমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে না পারি, তাহলে আমি বরং পথে নামব, তবু—

সঞ্জয় : দিনকাল বড় খারাপ চৌধুরী। পথও আজকাল সবাইকে ঠাঁই দেয় না।

চৌধুরী : হোক।...চোদ্দ বছর চাকরি হল—কিছু না থাকলেও আমার সন্তানদের সামনে, তাদের মায়ের সামনে আমি অন্তত একটা মানুষ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি। বাপ হিসেবে, স্বামী হিসেবে কিছু সম্মান আমি পেয়েছি। কাল সকালে আমাকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ ওদের চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে—না না না, আমি পারব না এই বয়সে আমি চোর হতে পারব না।

মজুমদার : (চিৎকার ক'রে) পারব না। পারব না—এ অসম্ভব।

সঞ্জয় : (মজুমদারের খুব কাছে এসে) কী অসম্ভব মজুমদার ?

মজুমদার : সারাটা জীবন আমি জেলে পচব। আর আমার মা—মা মরে যাবে, রায়চৌধুরী। লক্ষ টাকার জীবন আরম্ভ ক'রে, সর্বস্ব হারিয়ে মা আজ বন্ধকী জমিতে লোকের ঘরে মাথা গুঁজে বেঁচে আছে ; আর, বেঁচে আছে একমাত্র আমার মুখের দিকে চেয়ে। আমি এই কেরানীর মাইনে দিয়েই মার সেবা করব। জেলে আমি যেতে পারব না।

সঞ্জয় : কিন্তু আপনাদের জেলে যেতে কে বলছে ?

মজুমদার : আপনি বলছেন !

সঞ্জয় : একবারও বলিনি। আমি বরং একটু আগে বলেছিলাম—আমি জেলের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করি, কিন্তু জেলের ভেতরে ঢোকা এতো সহজ নয়।

মজুমদার : তার মানে ! এই টেবিল থেকে, চারজন মানুষের মধ্যে থেকে আশী হাজার টাকা উধাও হয়ে যাবে, তার পরেও আমরা ছাড়ান্ পেয়ে যাব ? এটা কি সম্ভব ?

সঞ্জয় : সম্ভব, মজুমদার, সম্ভব। এই সঞ্জয় রায়চৌধুরী ছ'টা ক্যাশরুমের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছে। সেই ছ'টা ক্যাশরুমের এক-একটা আপনাদের এই গোটা ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ফার্মকে কিনে নিতে পারে। আমি ছ'টা ক্যাশরুমের ঠিকানা দিচ্ছি, আপনারা গিয়ে খবর নিয়ে আসুন, শুনবেন—প্রত্যেকটাতে একটা-না-একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেছে ; আর প্রত্যেকটা ঘটনার সঙ্গে হাজার হাজার টাকা জড়িয়ে আছে ; কিন্তু দেখবেন, প্রত্যেকটা ক্যাশরুমের কর্মচারীরা হাসি মুখে কাজ করে চলেছে। আর, তাঁদের মধ্যে চোদ্দ বছর কেন, বিশ বছর চাকরি-করা মানুষও আছে। কিন্তু কই ? (চৌধুরীকে)—কেউ তো জেলে যায়নি !

চৌধুরী : তাহলে আপনি আপনি—

সঞ্জয় : আমার বাকসের তলায় কয়েকটা পেপার-কাটিং পাবেন—ছটা রহস্যময়

ঘটনার নিষ্ফল তদন্তের সুদীর্ঘ বর্ণনা। খবরের কাগজ থেকে কেটে ছ'খানা সার্টিফিকেটের মতো ক'রে রেখে দিয়েছি—মাঝে মাঝে দেখি মজা করার জন্যে।...(বাহু উন্মুক্ত ক'রে)—এটা কিসের দাগ জানেন, সন্ধ্যাদেবী ? পুলিশ থেকে আরম্ভ ক'রে সবাই জেনেছিল, অসীম সাহসের সঙ্গে ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে তাদের গুলি লেগে সঞ্জয় রায়চৌধুরী লুটিয়ে পড়েছিল। আসলে, আমার গায়ে লেগেছিল ব্যাঙ্কের দারোয়ানের গুলি—যে দারোয়ান এখন তিনশ' গরুর মালিক হয়ে দুধের বিরাট ব্যবসা করে। আমিই তাকে স্থিত করে দিয়েছি। আর আমি ? এখন আমি one of the most efficient hands in the Cash rooms ! আমাকে highest initial দিয়ে এখানে ডেকে এনেছে। কাল আপনি একশো পঁচাশী টাকা মাইনে পাবেন ; কিন্তু একমাস পুরো হলে আমি পাব তিনশো পঞ্চাশ টাকা। আর চাকরি আমি আরম্ভ করেছি মাত্র আট বছর। চোদ্দ বছর হতে এখনও অনেক দেরি।

মজুমদার : কিন্তু আমরা কী বলব, রায়চৌধুরী ?

সঞ্জয় : (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত মজুমদারের দিকে চেয়ে) আপনাদের কিছু বলতে হবে না। আপনারা আজ চারটে বাজার পরে নিজের নিজের ঘরে চলে যাবেন। কাল যথাসময়ে, যথানিয়মে এসে দেখবেন, কথা বলবার জন্যে অনেক নির্বাক সাক্ষী এখানে উপস্থিত রয়েছে।...এইখানে পড়ে থাকবে দুটো সিলিণ্ডার—একটা অক্সিজেনের আর একটা অ্যাসিটিলিনের। এদিক-ওদিক এমন কিছু জিনিস পড়ে থাকবে, যেগুলো পরীক্ষা ক'রে বিস্ফোরণ পদার্থ বলে ল্যবরেটরীর কর্মকর্তারা রিপোর্ট পাঠাবেন। ওইখানে সড়কি-বেঁধা একটা লোক পড়ে থাকবে। ওখান থেকে একটা দড়ি ঝুলতে থাকবে। এখানে সেখানে এমন কয়েকটা আঙ্গুলের ছাপ থাকবে, যে আঙ্গুলের আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মই হয়নি। চৌধুরী মশাই, আপনি প্লাস্টিকের আঙ্গুল দেখেছেন ? দেখেন নি !...আরও দেখবেন—এই টাকার সিন্দুকের দরজাটার একটা টুকরো উড়ে গেছে, ভেতরে পড়ে আছে কয়েকটা আধপোড়া নোট। আর, সিন্দুকের চাবিটা হাতে নিয়ে, স্পেশ্যাল ডিটেক্‌টিভ অফিসারের পেছনে-পেছনে ঘেমে-নেয়ে ঘোরাঘুরি করছেন আপনাদের ওই জেনারেল ম্যানেজার !

সন্ধ্যা : এতো সব আমি সহ্য করতে পারব না। দয়া ক'রে আমাকে রেহাই দিন আপনারা।

সঞ্জয় : আপনাদের শুধু একটা কাজ করতে হবে—শুধু একটা। চাবিটা আমার হাতে দিয়ে আপনারা অফিস থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর সকালে অফিসে এসেছেন—এর বাইরে আপনারা আর কিছু জানেন না। আপনাদের শুধু এইটুকু বলতে হবে। কেবল এই একটুখানি সাহায্য করতে হবে।...ভেবে দেখুন, কেবল এইটুকু সাহায্যের বিনিময়ে আপনারা জীবনের সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত

হতে পারবেন। এইসব টাকা আপনাদের—বলুন, বলুন, কী বলতে চান আপনারা। বলুন চৌধুরী মশাই।

চৌধুরী : আপনি জানেন, টাকার আমার খুব দরকার—খুবই দরকার। টাকার চিন্তায় আমি অকালে বুড়ো হয়ে গেছি। টাকা আমার চাই—টাকা আমার চাই। নির্মালীর জন্যে, ছেলেটার জন্যে আমার টাকা চাই।...কিন্তু তার জন্যে ডাকাতি—না না না—

সঞ্জয় : (সঙ্গে সঙ্গে) দেখুন চৌধুরী—যারা ব্যাঙ্ক লুট করে, তারা সবাই মদ খাবার জন্যেই করে না, ভাত খাবার জন্যেও অনেকে করে।

চৌধুরী : কিন্তু এই ফার্মের এতোগুলো টাকার লোকসান—এ-দিয়েও তো অনেকের অন্ন জুটবে।

সঞ্জয় : আপনারা বড় সরল মানুষ।...আপনি ভাববেন না চৌধুরী! এই আশী হাজার টাকা লোকসান হবার পরেও আপনাদের এই ম্যানেজার জল খাবে না—মদই খাবে! কিন্তু তার বদলে—সামর্থ্যহীন এক পিতা ছাঁদনাতলার শঙ্খ-উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে মেয়েকে নতুন ঘরে পাঠাতে পারবে ; একজন যুবক মার থাকার জন্যে দু'কাঠা জমি উদ্ধার করতে পারবে। গোপনে বাগদত্তা এক তরুণী মনের মতো একটা সংসার পাততে পারবে।.. কী ভাবছেন সন্ধ্যাদেবী?

সন্ধ্যা : আপনাকে আমি প্রাণ ভ'রে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু এ-টাকা আমি খরচ করতে পারব না, আমার সেই যোগ্যতা নেই।

সঞ্জয় : (বিরক্ত) আবার আপনি সেই যোগ্যতার কথা বলছেন! সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে যোগ্যতা বাড়ে, সন্ধ্যাদেবী। আপনার পে-স্কেলটা মনে আছে তো? সেটা হয়তো এইরকম : ৮০ টাকা—৫ টাকা—১১০ টাকা—এফিসিয়েনসী বার ৭½ টাকা—১২৫ টাকা—শেষ। কিন্তু জীবনে, হঠাৎই, এমন কিছু যোগ্যতা এসে যায়, যার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাটা শিখতে হয়। ধরে নিন, আপনার একজনকে ভালবাসার যোগ্যতা আছে, সেটা কি আপনার পে-স্কেলের সঙ্গে হুবহু মেলে?

সন্ধ্যা : আমি পারব না—পারব না—আমি মরে যাব।

সঞ্জয় : মরে যাব! আই-এ পাশ করা মাস্টারের ৯৫ টাকার সঙ্গে আপনার ১১০ টাকা জুড়ে একটা দ্বৈত সংসার আরম্ভ করবেন। এক-একটা ক'রে নতুন মুখ সংসারে আসবে সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটা ক'রে সমস্যা আপনাদের দুজনকে ঘিরে ধরবে। আপনার পে-স্কেলের শেষের দিক থেকে উলটে পড়লে যেরকম হবে। তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি আপনাদের জীবনে হাহাকার নেমে আসবে। (ঘুরে)—একটা কথা বলে যাই, চৌধুরী, আমার টাকার দরকার নেই। তা যদি হত, তাহলে আমি আজ এখানে চাকরি করতে আসতাম না। আপনারা হাসিমুখে চাকরি করুন, সেইটেই আমার লাভ।

চৌধুরী : বুঝেছি রায়চৌধুরী—আমি সব বুঝেছি। কিন্তু আমি যে এখন থেকেই আমার ঘরের সামনে পুলিশের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

সঞ্জয় : আজ আপনি জেলে যাবার ভয় করছেন। কিন্তু, আপনার ছেলেকে যাতে একদিন জেলে যেতে না হয়, সে-সম্পর্কে কিচ্ছু ভাবেন নি। অথচ, তার ব্যবস্থা যদি আপনি জেলে না গিয়েই করতে পারেন, তাহলে আপত্তি কি? বলুন সন্ধ্যা দেবী, বলুন মজুমদার?

মজুমদার : আমি কিছু ভাবতে পারছি না, রায়চৌধুরী!

সঞ্জয় : আপনাদের কিচ্ছু ভাবতে হবে না। বলুন, ঠিক আছে? (মজুমদার নীরব)। ঠিক আছে সন্ধ্যাদেবী? (সন্ধ্যা নীরব)। ঠিক আছে চৌধুরীমশাই? (চৌধুরী অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে)।...ঠিক আছে! (সঞ্জয় ফোন তুলে নেয়) হ্যালো একসচেঞ্জ! Please put me to six two four six...(থামে)...কে বলছ? ও, That's fine over to pilot two...Pilot two? Sanjay here...Speaking...Caravan. Yes yes yes yes. Two to three. Alright, Fine, (ফোন রেখে দেয়। একটা শেলফ-এর ফাইলের আড়াল থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ বার ক'রে আনে) মজুমদার, নোটের বাণ্ডিলগুলো আপনি এই ব্যাগটার মধ্যে ভ'রে নিন। কী দেখছেন? হাতে বেশি সময় নেই—তাড়াতাড়ি করুন—

[সঞ্জয় ব্যাগে টাকা ভরতে থাকে। মজুমদার ভয়ে-ভয়ে সাহায্য করে]

মজুমদার : এসব খুব—খুব বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে, রায়চৌধুরী!

সঞ্জয় : বন্ধকী ঘর-জমিতে থাকার চেয়েও কম বিপজ্জনক, মজুমদার।

[দুজনে টাকা ভরে। এমন সময়ে সন্ধ্যা চিৎকার করে ওঠে]

সন্ধ্যা : দরকার নেই। আমি এমনি মরব, সেও ভালো, এ টাকা আমার চাই না। রায়চৌধুরী, আমি আপনার পায়ে ধরছি—আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রেহাই দিন। আমি পারব না।

[ক্রুদ্ধ সঞ্জয় বিরক্তিভরে সন্ধ্যার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে; তারপরে, দ্রুতবেগে চৌধুরীর কাছে আসে]

সঞ্জয় : একটা কথা মনে রাখবেন, চৌধুরী। আপনার মেয়ে নির্মালীর জীবন ধ্বংস হয়ে গেলেও সন্ধ্যাদেবীর কোন ক্ষতি হবে না। এই একটা ঘরের মধ্যে সারা জীবন একসঙ্গে চাকরি করলেও আপনি ভাবছেন না যে বিপদের সময়ে আপনাকে সাহায্য করার মতো লোক এঁদের মধ্যে থেকে পাবেন। উলটে, আপনার জীবনের একটা শুভমুহূর্তকে নষ্ট করে দেবার মতো মানুষের অভাব কখনও হবে না।

সন্ধ্যা : না না না, আমি নষ্ট ক'রে দিতে চাই নি...ওটা আমি কখনও করব না। —আমি শুধু রেহাই চাইছি।

সঞ্জয় : চারজন লোকের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে এধরণের কাজ করা যায় কি? ভেবে দেখুন; আমার হাতে মাত্র ক' মিনিট সময় আছে।

সন্ধ্যা : (মুখ মুছে) তাহলে তাই হোক। আমার জন্যে কারও শুভ মুহূর্ত যেন নষ্ট না হয়!

[সন্ধ্যা টাইপরাইটারে মাথা রাখে। সঞ্জয় সেটা দেখে; কাজ করতে থাকে]

সঞ্জয় : সম্বল না থাকলেও অন্ততঃ অল্প সাহস থাকা দরকার সন্ধ্যাদেবী!...মজুমদার, Could you please give me a hand ?

[মজুমদার মন্ত্রমুগ্ধের মতো সাহায্য করে। সময় যায়।...হঠাৎ]

চৌধুরী : রায়চৌধুরী, আমি পারব না। আমার মেয়ের কঙ্কণ পরার আগে আমি হাতকড়া পরতে পারব না। আমার বুড়ো দেহে এতো সব সহ্য হবে না।... বন্ধ করুন রায়চৌধুরী, বন্ধ করুন—!

[সঞ্জয় টাকা-ভরা বন্ধ করে। রেগে ওঠে। কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ব্যাগ থেকে নোটগুলো বার ক'রে ফেলে]

সঞ্জয় : (নোটের উপর হাত রেখে) বেশ কথা!...হাতে-তুলে-দেওয়া সোনার তাল দূরে ঠেলে-দেওয়ার মতো মানুষে ভর্তি বলেই পৃথিবীটা আজ হা-হুতাশে ভরে গেছে।

[সঞ্জয় এক-একবারে প্রায় কুড়ি বাণ্ডিল ক'রে টাকা সিন্দুকে তুলতে থাকে। তিনবারে টেবিলের সব টাকা সিন্দুকে ভরে ফেলে। প্রত্যেকবার, সিন্দুকের কাছ থেকে টেবিলের দিকে টাকা নিতে আসার সময় এক একটা বাক্য উচ্চারণ করে]

—১৮৫ টাকায় যদি কারও বিয়ের আসরে (চৌধুরীর দিকে চেয়ে)—শঙ্খ-উলুধ্বনি ওঠে, ভালো কথা।...

—১১০ টাকায় যদি কারও গোপন প্রেমে স্বপ্নের রং ধরে, (সন্ধ্যার দিকে চেয়ে)—ভালো কথা।

—বন্ধক-রাখা জমি নিলাম হয়ে যাওয়ার আগে কেউ যদি (মজুমদারের দিকে চেয়ে)—১২০ টাকা থেকে, খেয়ে দেয়ে, পাঁচ হাজার টাকা জমাতে পারে, ভালো কথা।

[সিন্দুকের দরজায় তালা মেরেছে, এমন সময়ে দরজায় শব্দ। সবাই উত্তেজিত। সঞ্জয় দরজা খুলে দেয়। ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার : হ'লো আপনাদের? চারটে কিন্তু বাজল!

[সঞ্জয় এগিয়ে এসে সিন্দুকের চাবিটা ম্যানেজারকে দেয়]

—তারপর? কেমন দেখলেন রায়চৌধুরী?

সঞ্জয় : (সম্পূর্ণ নতুন মানুষের কণ্ঠস্বরে) ভালোই দেখলাম, স্যর।...চৌধুরী আর সন্ধ্যা দেবী সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। আপনি যেসব কথা শুনেছিলেন, তার কোনটাই সত্যি নয়। এঁরা ভালো লোক, এখানেই থাকুন।...শুধু ইনি—

[মজুমদারের দিকে আঙ্গুল তোলে। অফিসের সবাই বিস্মিত]

—আমার মতে, মজুমদারকে এখানে রাখার দরকার নেই। উনি অবশ্য, এমনিতে, ঠিকই আছেন—বিশেষ চিন্তা করার মতো কিছু নেই। তবু, কিছুদিনের জন্যে ওঁকে অন্য কোন ব্রাঞ্চে ট্রান্‌স্‌ফার করাই ভালো হবে। দরকার হলে, পরে আবার এখানে আনতে পারেন।

ম্যানেজার : বেশ। তাই করা হবে।...অশেষ ধন্যবাদ, রায়চৌধুরী। আসুন।

[দুজনে বেরিয়ে যায়। বাকী সবাই বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দা পড়ে]

ভাস্বতী

সত্যপ্রসাদ বরুয়া

চরিত্রাবলী ঃ

লেখক
ভাস্বতী
মা
বাবা
বিমল
হিমাংশু

প্রাসঙ্গিক

'শাশ্বতী' নামক সংকলন থেকে, 1956। মূল স্বত্ব—শ্রীসত্যপ্রসাদ বরুয়া, উজানবাজার, গৌহাটি-১। বরুয়া অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে, তারপরে সরকারী প্রচার-বিভাগে চাকুরীরত ছিলেন। এঁর অন্য নাটক—'শিখা', 'বনহংসী' (Wild Duck-এর অনুবাদ) ইত্যাদি। 'নাটক এবং অভিনয় প্রসঙ্গ' এঁর আলোচনামূলক রচনা। অভিনেতা হিসেবেও বরুয়ার সুখ্যাতি আছে।

[মঞ্চে বিশেষ সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই। কালো 'সাইক্লোরামা' বা পর্দা একটা পেছনে ঝুলিয়ে দিলেই হবে। মঞ্চের একদিকে একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর ছোট টেবিল একটা; টেবিলের ওপরে খান দুয়েক বই আর একটা টেবল-ল্যাম্প। বসার চেয়ারটা টেবিলের সঙ্গেই, ড্রয়ার যেদিকে। পট উঠলে দেখা যায়, প্ল্যাটফর্মের ওপরে চেয়ারে বসে লেখক লিখছেন। টেবল-ল্যাম্পের আলোয় তাঁর মুখ, লিখতে-থাকা-বই, এসব ভালো করেই দেখা যাচ্ছে।

মঞ্চের বাকি অংশ কিন্তু অন্ধকার।

কোনো চরিত্রই মঞ্চের ওপর নড়াচড়া করে না, ঠাঁই বদল ক'রে ক'রে সংলাপ বলে না। লেখকও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় বসে থাকবেন। অন্যান্য চরিত্রাবলী ঠিক যে-জায়গায় আত্মপ্রকাশ করবে, সেইখানে থেকেই কথা বলবে, অঙ্গভঙ্গী না ক'রে—যেন এক-একটা ফটো কথা বলছে।

'লেখক' একটা বড়ো বইয়ে কী-যেন লিখতে আরম্ভ করেছেন, কিন্তু এগোতে পারছেন না। কোন একটা শব্দ লিখছেন, কাটছেন, কিছু ভাবছেন, আবার লিখছেন। দু'চারবার এইরকম করার পর মুখ দিয়ে একবার 'ভাস্বতী' শব্দটার উচ্চারণ দর্শক যেন অনুমান করতে পারে। লেখক তৃতীয়বার 'ভাস্বতী' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা প্রেক্ষাগৃহের ধ্বনি-তরঙ্গে মৃদু কম্পন তোলে। দর্শক যেন 'ভাস্বতী' শব্দটির প্রতিধ্বনি শোনে—'ভাস্বতী! ভাস্বতী!! ভাস্বতী!!!' আর, সঙ্গে-সঙ্গে লেখকের সামনে ভাস্বতী-র আবির্ভাব হয়—]

ভাস্বতী : কী বললেন? ভাস্বতী?

লেখক : হ্যাঁ, ভাস্বতী। কেন, কোন আপত্তি আছে নাকি?

ভাস্বতী : আপত্তি না থাকার কোন কারণ নেই। আপনি হয়তো নাটক লিখছেন,—লেখক। কিন্তু আমার নামে আপনার নাটকের নামকরণ না করলেও পারতেন।

লেখক : আপত্তি করার অধিকার হয়তো তোমার থাকতে পারে মানছি, কিন্তু আমি নিরুপায়।

ভাস্বতী : কেন?

লেখক : তোমাকে নিয়েই নাটক লিখছি যখন, তোমার নামটা ধার না ক'রে পারি কি ক'রে, বলো?

ভাস্বতী : আমাকে নিয়ে নাটক লিখছেন?

লেখক : হ্যাঁ।

ভাস্বতী : আমাকে নিয়ে সবাই এভাবে কেন যে টানা-হ্যাঁচড়া করে, বুঝতে পারি না।

লেখক : টানা-হ্যাঁচড়া করে এই জন্যেই যে তুমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম—তুমি অসাধারণ।

ভাস্বতী : ধন্যবাদ। আপনার মুখে আত্মপ্রশংসা শুনে সত্যিই ভালোলাগছে। কিন্তু বলুন তো—আমাকে কেন অসাধারণ বললেন ? আমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনখানটায় ?

লেখক : তোমার মতো বিদূষী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে আমাদের সমাজে চট করে দেখা যায় না। তার ওপর—

ভাস্বতী : তার ওপর—আমি গান গাই, নাচি, ঘোড়ায় চড়ি, সাইকেল, মোটর, এমনকি এরোপ্লেনও চালাই। কিন্তু এইসবের জন্যে আপনি নিশ্চয় আমাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ব'লে ভাবেন নি !

লেখক : ভাবলে কি ভুল হবে ?

ভাস্বতী : স্বামী বেঁচে থাকতেই আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাচ্ছি ; এই জন্যেই যে আমার ওপর আপনাদের কড়া নজর, সেকথা আমি জানি। সেইজন্যেই আমাকে ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। আর, সেইজন্যেই আমাকে উত্যক্ত করার এই চরম পন্থা আপনিও বেছে নিয়েছেন—

লেখক : তোমাকে উত্যক্ত করার ?

ভাস্বতী : নিশ্চয় !

লেখক : কিভাবে ?

ভাস্বতী : আপনি আমার কথা ভাবতে থাকার ফলে আপনার চিন্তার ঢেউগুলো আমার মনে আঘাত ক'রে আমাকে অযথা অস্থির করে তুলবে !

লেখক : আচ্ছা ! সে-ক্ষেত্রে আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি—এখনই।

ভাস্বতী : আপনি আমার কথা লেখার জন্যে কলম ধরেছেন। কিন্তু কতোখানি জানেন আমাকে ? আপনারা আমার বাইরের রূপটাই দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন আমার বাইরের আচরণ ; কিন্তু আমার মনের ভেতরে কী আছে, তার কোন খবর রাখেন ?

লেখক : রাখতে পেরেছি কি পারিনি, তা বলতে পারব না ; তবে, চেষ্টার ত্রুটি করি নি।

ভাস্বতী : আপনার এই নাটকে, হয়তো, শেষে গিয়ে, আমাকেই সব দোষের ভাগী করবেন !

লেখক : এরকম ভাবার কি কোন যুক্তি আছে ?

ভাস্বতী : আমি ভালো করেই জানি, আমার প্রতি কারও কোন সহানুভূতি নেই।

লেখক : আমাকে সহানুভূতিহীন ব'লে ভাবাটা তোমার পক্ষে বোধকরি উচিত হয়নি।

ভাস্বতী : আপনি লেখক, আপনি নাট্যকার। আপনারা সাধারণত বাইরের দিকটাই নেড়েচেড়ে দেখেন। মানুষের ভেতরটা জানার চেষ্টা করেন না। তাই বলছি—আপনারা, মানে, আপনিও সহানুভূতিহীন।

লেখক : তোমার ধারণা সত্য নয়। আমি তো একজন সামান্য ও সাধারণ লেখক। আমার বইয়ের নায়ক-নায়িকাদের প্রতি জেনে শুনে অবিচার করার দুঃসাহস আমার নেই। যে সমস্ত খ্যাতিমান লেখক, যাঁরা কলমের এক আঁচড়ে চরিত্রের রূপ বদলে দিতে পারেন, তাঁরাও সহানুভূতিহীন ঠিক নন। যাই হোক, একটা কথা বলি, বিশ্বাস করবে ?

ভাস্বতী : বলুন, কী কথা ?

লেখক : তোমার প্রতি আমার অফুরন্ত সহানুভূতি আছে বলেই তোমাকে আমার নাটকের নায়িকা করেছি। আমি তোমাকে জানতে চাই। আমি চাই যে দর্শক-পাঠকরাও তোমাকে জানুন, তোমাকে বুঝুন—

ভাস্বতী : কিন্তু এই কৌতূহল কি অস্বাভাবিক নয় ?

লেখক : ছোটবেলায় তোমার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর তুমি তোমার স্বামীর ঘর করতে গেলে না। বাপের ঘরে থেকে পড়াশোনা করলে। এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছো। আমরা সকলে আশা করেছিলাম, তুমি আবার সংসারের ঝামেলায় না গিয়ে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু এখন তুমি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছো জানতে পেরে, আমাদের মনে কৌতূহল জাগাটা স্বাভাবিক নয় কি ?

ভাস্বতী : আর সেইজন্যেই আমাকে আপনার নাটকের নায়িকা করেছেন, যাতে দর্শক-পাঠকের মনেও ওই ধরণের কৌতূহল জাগিয়ে নাটকটাকে সার্থক রচনা করে তুলতে পারেন ?

লেখক : তুমি, একা আমার নয়, সমস্ত লেখকেরই মূল দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছো।

ভাস্বতী : আপনি আমার ছোটবেলায় বিয়ে হবার কথা তুলেছেন। কিন্তু তার জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারেন না। ছোটবেলায় বিয়ে নাহলে আজ নিশ্চয় আমার এমন অবস্থা হত না!

লেখক : প্রচলিত সমাজবিধি অনুসারে তোমার বিয়ে হয়েছিল—আজ থেকে আঠারো বছর আগে।

ভাস্বতী : তখন আমার বয়স এগারো।

লেখক : সেই বিয়ের জন্যে তুমিও আজ কাউকে দায়ী করতে পার না।

ভাস্বতী : বিয়ে দিয়ে আমাকে বিদায় করার জন্যে আমার মা যে খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল।

লেখক : সেইজন্যেই বোধহয় তোমার বাবা-মা তোমার বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়েছিলেন—সমাজের নিয়মটাও থাকুক, আর তোমারও কল্যাণ হোক বলে—

ভাস্বতী : কিন্তু মা অতো অস্থির হয়ে না পড়লে—

[ভাস্বতীকে অন্ধকার ঘিরে ধরে। মাকে দেখা যায়]

মা : মেয়ে বড় হ'লে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো মা-বাবার কর্তব্য। আমাদের পরিবারে মেয়েদের চিরকাল ওই বয়সেই বিয়ে হয়েছে। আমাকে আমার মা-বাবা এগারো বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিল। ভাতুমণির (ভাস্বতীর) বিয়ের জন্যে আমি বিশেষ চিন্তিত হয়েছিলুম ওর উদাসীন স্বভাবটার জন্যে—

[মা থাকতেই বাবাকে দেখা যায়। মার মুখে পরার মতো তাঁরও মুখে নীল বা বেগুনী আলো পড়ে]

বাবা : সত্যি বলছি, ভাতুমণিকে অত কম বয়সে বিয়ে দিয়ে বিদায় করার কথা আমি ভাবিই নি। অতএব, তোমার খারাপ লাগলেও আমাকে বলতেই হবে যে ভাতুমণির বিয়ে আমাকে দিতে হয়েছিল—তোমারই জন্যে।

মা : সব দোষ আমার ওপর ওইভাবে চাপিয়ে দিলেই হবে নাকি? আমি ভাতুমণিকে বিয়ে দেবার কথাই বলেছিলুম; কিন্তু, ওই ছেলেকেই জামাই করতে হবে, এমন কথা কখনও বলিনি।

বাবা : তা অবশ্য বলোনি।

মা : ওই ছেলেকেই দিতে হবে, এমন কথা তো বলিই নি, বরং জোর দিয়ে এই কথাটাই বারবার বলেছিলুম যে শহরে মানুষ আমার মেয়ে, গাঁয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না।

বাবা : সেই সময়ে আমার অবস্থাটা ক্যামোন ছিল, একবার মনে ক'রে দ্যাখো দিকি। বাবা গোঁ ধরলেন গাঁয়ের ছেলে বিমলের হাতেই ভাতুমণিকে সমর্পণ করতে হবে ব'লে। বাবার মতের বিরুদ্ধে আমি যাই কি ক'রে?

মা : এতোই পিতৃভক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ছেলেটাকে একবার দেখতেও গেলেন না?

বাবা : জামাই তোমার পছন্দ হয়নি বুঝেই তো বিমলের পড়ার সুযোগ নিয়ে ভাতুমণিকেও লেখাপড়া শেখাবো বলে স্থির করলুম। বাবা আপত্তি করতে পারলেন না। করবেনই বা ক্যামোন ক'রে? বিমল তখনও পড়ুয়া ছেলে, নিজের রোজগার নেই, সংসার পাতার কথা সেও তোলে নি।

মা : এবং একবছরের মধ্যে বাবা স্বর্গে গেলেন।

বাবা : বাবা যাওয়ার কিছুদিন পরে গেলেন মা। আমার পক্ষে ব্যাপার সব সহজ হয়ে পড়ল। আমার কথার ওপরে কথা বলার কেউ রইল না।...বাবা-মা স্বর্গে যাবার একবছরের মধ্যে বিমলের হল টি-বি। সেই পরিস্থিতিতে ভাতুমণির ওখানে গিয়ে বিমলের সঙ্গে ঘরসংসার পাতার কথাটা চাপা পড়ে গেল।

লেখক : বিমল যখন ভালো হয়ে উঠল, তখন কেন ভাস্বতীকে স্বামীর ঘরে পাঠালেন না?

মা : আমি কিন্তু পাঠাতে বলেছিলুম।

বাবা : 'পাঠিয়ে দিন' বললেই তো আর পাঠাতে পারি না! টি-বি আজকালই খুব সহজ হয়ে গেছে ; কিন্তু সে সময়ে অসুখটাকে সবাই ভয় করত। তার ওপর, ডাক্তার স্বয়ং আমাদের বাড়ি এসে তোমাকেই বলেছিল যে সংসার-পাতার কথা বিমল আর তুলবে না। তুমিই বলো—সেই অবস্থায়, বিমলের কাছে থাকার জন্যে ভাতুমণিকে পাঠিয়ে দেওয়াটা কি সম্ভব ছিল ?

মা : বিমল যে আবার বিয়ে ক'রে একজোড়া ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে, এখন কি ক'রে তার সংসারটা চলছে ? সময় থাকতেই বাধা দেওয়া উচিত ছিল।

[মা অদৃশ্য হয়]

বাবা : হ্যাঁ, উচিত ছিল সময় থাকতেই বিমলকে বাধা দেওয়ার। বাধা দিলেই এই নতুন সমস্যাটার সমাধান সহজ হয়ে যেতো।

লেখক : মেয়ের প্রতি আপনার যে স্নেহ, তাকে কিছুটা অস্বাভাবিক রূপে গভীর বলতে হয়।

বাবা : অস্বাভাবিক ভাবে গভীর ? মানে ?

লেখক : মানে বুঝতে গেলে মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রএডের কাছে যেতে হয়। কিন্তু সে সব তথ্য-তত্ত্ব যুক্তি এবং সময় আমার হাতে নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে—আপনার অবচেতন মনে দুটো শক্তি সমান্তরাল ভাবে কাজ করছিল—

বাবা : দুটো শক্তি ?

লেখক : হ্যাঁ, দুটো শক্তি! নিজের মতের বিরুদ্ধে মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় আপনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। ওইভাবে বিয়ে দেওয়াটা আপনার কাছে খুবই অন্যায় মনে হয়েছিল। তাই সব সময়েই উপায় খুঁজছিলেন, কিভাবে করতে পারি তার—

বাবা : তার পরে—

লেখক : আপনি ভেবেছিলেন, জামাইয়ের অসুখের অজুহাতে কিংবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি বলেই আপনি ভাস্বতীকে বিমলের ঘরে না পাঠিয়ে, আদিতে করা অন্যায়, মানে, যে অন্যায় আপনি করেছেন ব'লে ভেবেছিলেন, তার প্রতিকার করলেন। হ্যাঁ কি না—বলুন—

বাবা : বলতে পারব না। কথাগুলো—ঠিক আপনার মতো—অতো খুঁটিয়ে ভাবিনি।

লেখক : এবং—আপনার এই প্রচেষ্টায় প্রেরণা জুগিয়েছিল—কন্যার প্রতি আপনার ভালবাসা বা মোহ। এই ধরণের ভালবাসা বা মোহকেই ফ্রএড বলেছেন ঈদিপাস কমপ্লেকস। তাই আমি মনে করি, বর্তমান বিপর্যয়ের জন্যে আপনিও আংশিকভাবে দায়ী।

বাবা : আংশিকভাবে কেন, যদি বলেন সম্পূর্ণভাবে, তাহলেও আমি কিছু মনে করব না।

লেখক : আপনার স্বীকারোক্তি আপনার মহত্ত্বেরই প্রকাশ।

বাবা : যে-জট আমিই পাকিয়েছি, তা খুলতে পারছি না ব'লে আজ আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। বিয়ের পরেও, মেয়েকে ঘরে রেখে, স্বামীর ঘরে যেতে না দিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে, এম-এ পাশ করিয়ে, ডকটরেট পাওয়ার সুবিধে করে দেওয়ার ফল আমি আজ ভালভাবেই পাচ্ছি।...ভাতুমণি এখন প্রফেসর হিমাংশু শইকীয়াকে বিয়ে করতে চাইছে।

লেখক : (লঘুভাবে) তাই নাকি? বেশ রোমান্টিক হয়ে পড়েছে ব্যাপারটা, দেখছি।

বাবা : ব্যাপারটা আপনি খুব হালকা করে দিচ্ছেন। আমার সমস্যাটা আপনি একটু সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করুন।

লেখক : বুঝেছেন বরুয়া, সমস্যা যতো গভীরই হোক না কেন, হালকাভাবে নিলে, তার সমাধানটাও সোজা হয়ে পড়ে। নইলে, গভীর সমস্যার সঙ্গে নিজের মনকেও গভীর করে ফেললে, দুদিকের চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বাবা : ভাতুমণি যদি আমার একমাত্র মেয়ে হত, তাহলে চিন্তার কারণ হয়তো কিছুই থাকত না। কিন্তু আমার আরও দুটি মেয়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে। এর ভাগ্যে যা ছিল, তাতো হল। তার সঙ্গে অন্য দুজনের ভবিষ্যৎ আমি অন্ধকার করে তুলতে পারি না।

লেখক : পড়াশোনা ক'রে ভাস্বতীর জ্ঞানের পরিধি বেড়ে গেছে। নিজে সবকিছু ভেবে দেখতে শিখেছে। মেয়ের মনও একটা নির্দিষ্ট গড়ন নিয়েছে। সমস্যার জটিলতাও বেড়েছে সেই কারণে।

[মাকে দেখা যায়]

মা : আগে শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে মুখ খোলার অধিকার আমার ছিল না। আমার যা বলার ছিল, ওঁকেই বলেছিলুম। কিন্তু আমার কথা উনি শুনেও শুনলেন না। শ্বশুর-শাশুড়ি থাকার জন্যে আমিও জোর দিয়ে নিজের মতটা প্রকাশ করতে পারি নি। কিন্তু আজ হালচাল বদলে গেছে। আজ আর উনি আমাকে অবহেলা করতে পারেন না।

বাবা : তোমাকে বা তোমার মতামতকে আমি কোনদিন অবহেলা করতে চাই নি। আমার কী করা উচিত, এখনও দ্যাখো, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি। বলো, কী করতে হবে—

মা : বিমলের ওখানে ভাতুমণিকে পাঠিয়ে দিন।

বাবা : সতীনের দাসীগিরি করার জন্যে ?

মা : আমার মেয়ের ভাগ্যে যদি তা-ই থাকে, তাকে খণ্ডাবে ক্যামোন ক'রে ?

বাবা : কিন্তু ভাতুমণি এখন তো আর আঠারো বছর আগের সেই ছোট মেয়েটি নয়। ডকটরেট-পাওয়া, কলেজের প্রফেসর। মেয়েকে তুমি জোর ক'রে বিমলের কাছে পাঠাবে ক্যামোন ক'রে ? বিমল যদি বিয়ে না করত, তাহলেও একটা কথা ছিল। এখন যদি মেয়ে বলে, যাব না, আমি কি জোর করতে পারি ?

মা : এইভাবেই আপনি মেয়ের মাথা খেয়েছেন।...ছেলেবন্ধুরা সব বাড়িতে আসে ; আমি চাই বারণ করে দিতে ; আপনি বলেন, থাক, কিছু বোলো না, মেয়ে দুঃখ পাবে। ছোকরা-প্রফেসর ঘরে আসে মেয়েকে পড়াতে ; আমি বারণ করতে চাই ; আপনি বলেন, কলেজের শক্ত পড়া, একটু দেখিয়ে দিচ্ছে, দিক না। পড়ায় আর পড়ানোয় আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু পড়ানোর নামে এতো হলায়-গলায় ক্যানো ? এসব ব্যাপারে গোড়া থেকেই আমার আপত্তি ছিল—পড়াশোনা ক'রে হবেটা কী ? মেয়ে যে, সে মেয়েই থেকে যায়। মা-বাবার চেয়ে বেশি বুঝদার কখনও হতে পারে না। মেয়ের কিসে ভালো হবে, কিসে মন্দ হবে, সেকথা মেয়ের চেয়ে আমরা বেশি ভালো ক'রে বুঝি।

লেখক : তাহলে আপনি মেয়েকে বোঝান না কেন ?

বাবা : হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমিই একটু বোঝাওনা।

মা : লাই দিয়ে দিয়ে আপনি মেয়েকে মাথায় তুলেছেন, এখন আপনাকেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

[মা অদৃশ্য হয়]

বাবা : সেইজন্যেই আমি বলেছিলুম, বিমলকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে দেওয়া ঠিক হয় নি। বাধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেওয়া হল না যখন—

[দর্শক বিমলকে দেখতে পায়]

বিমল : হয়তো বাধা দেবার অধিকার আপনি হারিয়েছিলেন।

লেখক : ওকথা কেন বলছ বিমল ?

বিমল : বলছি এই জন্যেই যে—আমার অসুখ ভালো হয়ে যাবার পরে ভাস্বতীকে নিয়ে আসার কথা বাবাকে কয়েকবারই বলেছিলুম। কিন্তু ওঁরা আমার প্রস্তাব একটা-না-একটা অজুহাতে অগ্রাহ্য করেছিলেন।

বাবা : অসুখের কথা যদি ছেড়েও দি, বিমল, তখনও তুমি বেকার ছিলে।

বিমল : আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস রাখা উচিত ছিল। তখনও উপার্জনের ঠিক পথটা খুঁজে পাই নি। যদিও আজ আমি যাহোক ক'রে সংসারটা চালাচ্ছি।

লেখক : যাহোক ক'রে নয়, বেশ ভালোভাবেই চালাচ্ছ।

বিমল : শহুরে ছেলে না হলেও আমি ভাস্বতীর অযোগ্য স্বামী ছিলুম না। আমার রূপ-গুণ স্বভাব-চরিত্র দেখেই আপনারা কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

বাবা : এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বিমল : আপনারা বিয়েটা দিয়ে দিলেন ; কিন্তু বিয়ের পরে আমাদের যাতে মনের মিল হয়, আমরা যাতে একে অপরকে চিনতে পারি, তার কোন সুযোগ আপনারা দিলেন না।

বাবা : ভাতুমণি তো তখন খুবই ছোট্ট মেয়ে ; সুযোগ দিলেও যে সে—

বিমল : ভাস্বতীর বয়স বাড়ার পরেও আপনাদের ব্যবহারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। আপনাদের সবসময়ে চেষ্টা ছিল ওকে আড়ালে রাখার। তারই ফলে

আমাদের দুজনের মধ্যে এমন-এক ব্যবধানের সৃষ্টি হল যে আমরা ক্রমে-ক্রমে পরস্পর-অচেনা হয়ে গেলুম। তার ওপর, পড়তে দিয়ে, এবং নানান ধরণের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিয়ে, ভাস্বতীর মনকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সবরকম চেষ্টাই আপনারা করেছিলেন।

বাবা : এটা তোমার অহেতুক সন্দেহ। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, আজ আর সেসব কথা আলোচনা করে লাভ কী? তুমি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতে—আমার যা-ই করা অনুচিত হোক না কেন—তাহলে হয়তো ভাস্বতীর অন্তর জয় করাটা তোমার পক্ষে অসম্ভব হত না, আর আমাকেও অযথা অপরাধী করতে হত না।

[বাবা অদৃশ্য হন। ভাস্বতীর মুখে আলো পড়ে]

ভাস্বতী : এই ধরণের সন্দেহই তো ওঁর প্রতি আমার মনকে বিরূপ করে তোলায় সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশী। ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সুযোগ বাবা দেননি ; তবু ওঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল। ওঁর ব্যবহার যদি আমার আশানুরূপ হত, তাহলে সেই শ্রদ্ধাই হয়তো আমাদের সম্বন্ধকে নিবিড় করে তুলত।

লেখক : তোমার বক্তব্য খুব ভালো ক'রে বুঝতে পারলাম না।

ভাস্বতী : স্কুলের পড়া শেষ ক'রে আমি নাম লেখালাম কলেজে, ছেলেদের সঙ্গে পড়ার সুযোগ পেলাম। সেই সময়ে ক্লাসের ছেলেরা আমার সঙ্গে পড়াশোনার আলোচনা করত, কথা বলত, গল্প করত। এসব হয়তো উনি মনে-মনে অপছন্দ করতেন। সুযোগ পেলেই, এইসব কথা তুলে আমাকে ঠাট্টা করতেন, কথা শোনাতেন। এবং এইজন্যেই আমি ভাবতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, ওঁর মনটা গড়পড়তা সাধারণ লোকের চেয়েও ছোট।

লেখক : কিন্তু বিমলের এই সন্দেহ, ইংরেজীতে যাকে বলে জেলাসী, সেটা যে প্রেমেরই একটা অভিব্যক্তি, একথাটা, সুশিক্ষিতা নারী হিসেবে তোমার বোঝা উচিত ছিল।

ভাস্বতী : স্বীকার করছি, বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনকে আকর্ষণ করার শক্তিও ওঁর থাকা উচিত ছিল। মা-বাবা আমাকে একটু বেশি ভালবাসেন, সবসময়ে কাছে রাখতে চান—এটাও অবশ্য একটু একটু ক'রে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। কিন্তু তবুও স্বামীর প্রতি আমার মনোভাবের পরিবর্তন হল না। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে উনি বাবাকে বলেছিলেন। তবু, বাবার আমাকে না-পাঠানোটাও ভিত্তিহীন বলে ভাবার কারণ খুঁজে পাই নি।

বিমল : না-পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল—অনুপ চালিহা।

লেখক : অনুপ চালিহা ?

বিমল : হ্যাঁ, অনুপ চালিহা। যাঁর সঙ্গে উনি প্রায়ই নদী তীরে বেড়াতেন, রেস্তোরাঁয় চা খেতেন, সিনেমা দেখতেন—

ভাস্বতী : মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধকে কলঙ্কিত করে তোলে আপনাদের মতো লোকই, যাদের মন খুবই সংকীর্ণ।

বিমল : তোমাদের এই সহজ সম্পর্কের কাহিনী কলেজের সকলের মুখে মুখে ঘুরত। আমি কিন্তু একদিনের জন্যেও একথা তুলিনি। অতএব, আমাকে সংকীর্ণমনা বললেও সে অভিযোগ মেনে নিতে আমি প্রস্তুত নই।

লেখক : অনুপ চালিহার সঙ্গে গড়ে ওঠা তোমার সম্পর্ককে তুমি নির্দোষ বলে ভাবলেও ওকে তোমার এতো কাছে আসতে দেওয়াটা বোধহয় উচিত হয়নি। অবশ্য, এরজন্যে আমি তোমাকে দায়ী করি না। দায়ী যদি করতেই হয়, তোমার বাপ-মাকেই করতে হবে। অভিভাবক হিসেবে তোমার ওপর যতটা কর্তৃত্ব করা উচিত ছিল, ততখানি তাঁরা করেন নি।

ভাস্বতী : অনুপ চালিহার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোটা সমাজের ক্ষুদ্রমনা লোকেরা যতোই খারাপ ব'লে ভাবুক না কেন, আমি এমন কিছু করি নি, যার ফলে আমার বাপ-মার বা আমাদের পরিবারের সম্মানে কলঙ্ক পড়তে পারে।

লেখক : সেটা অবশ্য তোমার ঘোর শত্রুরা মুখ ফুটে না বললে ও মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য।

বিমল : এসব কথা ওঠার পরেও আমি একবার ভাস্বতীকে নিয়ে যাব ব'লে এসেছিলুম। সেবারেও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

লেখক : আর সেইজন্যেই বোধহয় তুমি স্থির করলে—ভাস্বতীর আশায় না থেকে আবার বিয়ে করাটাই যুক্তিযুক্ত ?

বিমল : পুনর্বিবাহ করাটা আমি খুব বড়ো করে ভাবিনি, মা-ই ছাড়লেন না। বিধবা মা, নাতি-নাতনীর মুখ দেখার জন্যে হাঁফিয়ে উঠছিলেন।

ভাস্বতী : নিজের জন্যে একটা আলাদা সংসার পাতার এই সহজ উপায়টাই উনি বেছে নিলেন। আর, ওঁর জীবন থেকে বাদ পড়ে গেলাম আমিই !

লেখক : এমনটা হওয়ার জন্যে তুমি দুঃখ পেয়েছিলে ?

ভাস্বতী : অস্বীকার করব না, আঘাত পেয়েছিলাম।

লেখক : কেন ?

ভাস্বতী : আমি লেখাপড়া করেছি, স্বামীর ঘরে না গিয়ে বাবার কাছে আছি ; তবু, কোনদিন কল্পনাই করিনি যে হোমের আগুন সাক্ষী রেখে আমাদের দু'জনের মাঝখানে আর একজনের আবির্ভাব হবে, উনি এভাবে হঠাৎ বিয়ে করবেন।...একথা ঠিক যে আমরা দুজনে দুজনকে চেনা-জানার সুযোগ পাইনি ; কিন্তু তাই ব'লে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা যে এভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, কখনও ভাবতে পারিনি। প্রথম দিকের মানসিক আঘাতটা সহ্য হয়ে আসার পর ধারণা জন্মাল যে, উনি যেন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এই পথটা বেছে নিয়েছেন। মনের মধ্যে এই ভাবটা আসার পরেই ভেতর থেকে ওঁর সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলার জন্যে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম।

লেখক : বিমল বিয়ে করলেই বা ; তাই ব'লে তার ঘরের দরজা তো আর তোমার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়নি।

বিমল : আমার বাড়ির সব্‌বাই ভাস্বতীকে সমাদরে গ্রহণ করার জন্যে সবসময়ে উদ্‌গ্রীব। এখনও যদি আসতে চায়—

ভাস্বতী : মিথ্যে কথা।...আমার পক্ষে, আপনার কাছে গিয়ে ঘর-সংসার করা অসম্ভব প্রস্তাব। আপনার ব্যবহারই আমাকে বাধ্য করেছে নিজেকে নতুন ভাবে গ'ড়ে তুলতে। আমার সামনে আজ যে পৃথিবী উন্মুক্ত হয়েছে, অতীতের স্মৃতি তাকে মলিন করতে পারবে না।

বিমল : বেশ, তোমার নতুন জীবনকে তুমি বরণ করে নাও। আমার শুভেচ্ছা রইল।

[বিমল অদৃশ্য হয়]

লেখক : দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পরে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চাওয়াটা বিমলের পক্ষে শোভনীয় হয়নি—একথা বললে খুব অন্যায় হয় না।

ভাস্বতী : শুধু অশোভনীয় তো নয়ই, ওটা আদিম মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

লেখক : আদিম মনোবৃত্তিকেও অনেক সময় সমর্থন করা যায়, যদি সে মনোবৃত্তির উৎস থাকে অন্তরের অন্তস্থলীতে, যদি তার পরিচালক হয় গভীর অনুভূতি। কিন্তু তোমার প্রতি বিমলের সে রকম কোন গভীর অনুভূতি থাকার প্রমাণ আমি পাইনি। থাকলে, হয়তো বিমল দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে এতটা ব্যস্ত হত না। তাছাড়া, তোমার অন্তরে বিমলের জন্যে কণামাত্র ভালবাসাও যদি থাকত, তোমাদের সম্বন্ধ তাহলে নিবিড় হয়ে উঠত, এবং এত সহজে ওকে প্রত্যাখ্যানও তুমি করতে পারতে না।

ভাস্বতী : এই সহানুভূতিটুকুর জন্যে ধন্যবাদ।

লেখক : (হেসে) আমি যে একেবারে হৃদয়হীন নই, তার একটু পরিচয় পেলে তাহলে !

ভাস্বতী : (লঘু ভাবে) হ্যাঁ, পেলাম। আমার আগের মন্তব্য উঠিয়ে নিচ্ছি।

লেখক : এখনই উঠিও না। আরও একটু এগিয়ে যাওয়াটাই বোধহয় সমীচীন হবে।...ঠিক আছে, বলে যাও ; তোমার কথা শুনতে বেশ ভালোলাগছে। একজন মানুষকে, একটা চরিত্রকে, বোঝবার চেষ্টা যে কতোখানি তৃপ্তিদায়ক, সেকথা আমার চেয়ে বেশি কে উপলব্ধি করতে পারবে ?...হ্যাঁ...বলো।

ভাস্বতী : আমাদের দুজনের, অর্থাৎ আমার আর ওঁর মধ্যে ভালবাসা যদিও জন্ম নেয়নি, তবু অনেক রাত আমি অনিদ্রায় কাটিয়েছি, ওঁর সঙ্গে একটা মানসিক সাযুজ্য গড়ে তোলার পথ খুঁজেছি। কিন্তু ওঁর আর আমার মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তাকে সরিয়ে দেবার কোন উপায় খুঁজে পাইনি।... না পেয়ে, হতাশ হয়েছি।

লেখক : হতাশ হয়েছো এইজন্যে যে তুমি বিমলের মধ্যে অমন কোন মহত্ব খুঁজে

পাওনি, যাকে ভরাট ক'রে তুলে, জীবনকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং এই কারণেই, বিমল তোমার মনকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে নি। হ'তে পারে, এজাতীয় আকর্ষণের শক্তি গভীর ভালবাসার চেয়ে অনেক কম। তবু বিবাহিত জীবনকে সুখের আর শান্তির করে তুলতে এ-ই যথেষ্ট।

ভাস্বতী : ঠিক এইভাবে আমি আগে ভাবিনি ; যদিও এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনার ধারণা সত্যি।.. কী কারণে বলতে পারব না, আমার স্বামী কোন সময়েই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আদায় করতে পারেন নি। এমন কি, অসুখের সময়েও তাঁর প্রতি আমার মনে বিশেষ কোন দরদ জেগে ওঠেনি। আমার কথাটা হয়তো খুবই কর্কশ শোনাচ্ছে ; হয়তো আমি আদর্শ স্ত্রীর মতো কথা বলছি না, কিন্তু আমি সরলভাবেই আপনার কাছে আমার মনের কথা ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি। একথা সত্যি যে স্বামীর সান্নিধ্যে আসার বেশি সুযোগ আমি পাইনি ; তবু যেটুকু সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, তাতে তাঁর মধ্যে দেখেছি বিশুদ্ধ আদিম বর্বরতা। এইটেই আমার মনকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। আপনি যে মহত্ত্বের কথা বললেন, তার কোন অস্তিত্বই আমি তাঁর মধ্যে দেখিনি।

লেখক : কাব্য ক'রে বলতে গেলে—ওর সংস্পর্শে তোমার হৃদয়-পদ্ম পাপড়ি মেলল না।—কী বলো?

ভাস্বতী : আমার যে একটা হৃদয় আছে, আমার অন্তরে যে কোমল অনুভূতি আছে, সেকথা আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম অনুপ চালিহার সংস্পর্শে এসে।...কিন্তু—হিমাংশুর প্রতি গড়ে ওঠা আকর্ষণের গভীরতা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে।

লেখক : হিমাংশু তোমার সহপাঠী?

ভাস্বতী : আমার সহপাঠী হলেও হিমাংশুর সঙ্গে পরিচয় বেশিদিন হয়নি। ঘনিষ্ঠ হবার পরে অনুভব করেছি—পরস্পর মিলনের জন্যেই যেন আমরা দুজন অনেকদিন ধরে পথ চেয়েছিলাম।

লেখক : হিমাংশুরও নিশ্চয় তোমার মতো এমনি একটি সংস্কৃতিবান হৃদয় আছে। সেইজন্যেই বোধহয় তোমরা একজন আর একজনকে আকর্ষণ করতে পেরেছো। এবং বোধহয় সেইজন্যেই তুমি এখন হিমাংশুকে বিয়ে করতে যাচ্ছ।

ভাস্বতী : আমি এখন চাইছি, আমার জীবনের স্রোত একটা নির্দিষ্ট গতিতে বয়ে চলুক ; এবং এই যাত্রাপথের সহযাত্রী হবে হিমাংশু। হিমাংশুর প্রতি গড়ে ওঠা যে গভীর আকর্ষণ আমাকে অভিভূত করেছে, হয়তো তাকেই বলে প্রেম... ভালবাসা ; তারই মধ্যে আমি আমার সত্তাকে উপলব্ধি এবং পরিপুষ্ট করতে পারব ব'লে মনে করি।

লেখক : হিমাংশুরও মনের কথা এইটাই?

[হিমাংশুকে দেখা যায়]

হিমাংশু : সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে আমি প্রস্তুত।

লেখক : ভুলে যেও না, জীবনটা রোমান্স নয়। তোমাকে বুঝতে হবে যে প্রেম সাময়িক অন্তর-উচ্ছ্বাসের চেয়েও গভীর।

হিমাংশু : আমি জানি।

লেখক : শুধু এইটুকুই না। তোমাদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে যুক্তির বেদীতে।

হিমাংশু : দিয়েছি।...ফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়ে পিষে ফ্যালে বৈজ্ঞানিক, তার পরেও ছড়িয়ে থাকে ফুলের সুগন্ধ ; ঠিক সেইভাবে আমাদের ভালবাসার সুবাসও বেড়ে চলেছে, কমেনি।

লেখক : তুমি তাহলে ভাস্বতীকে বিয়ে করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

হিমাংশু : সিদ্ধান্তে আমি স্থির। অটল আমার সংকল্প।

লেখক : ভাস্বতীর বাপ-মার সম্মতি তুমি পাবে না।

হিমাংশু : পাব না ব'লেই বা এতো নিশ্চিতভাবে বলছেন কেন ?

লেখক : ভাস্বতীর মা পুরনো যুগের লোক। ভাস্বতীর বাবাও নন সংস্কারমুক্ত।

হিমাংশু : কিন্তু এটা তাঁরা বুঝেছেন—ভাস্বতীর কল্যাণ হবে ব'লে আঠারো বছর আগে তাঁরা যা করেছিলেন, তার ফল তাঁদের আশানুরূপ হয় নি। ভাস্বতীর জীবনে নিস্ফল হয়েছে হোমাগ্নির সামনে উচ্চারণ করা পবিত্র মন্ত্র।

লেখক : ব্যাপারটা তুমি যতো সহজে বুঝেছো, তাঁরা হয়তো ততো সহজে বুঝতে চাইবেন না।

হিমাংশু : কিন্তু ভাস্বতীর জীবন বিষময় করে তোলাটাও নিশ্চয় তাঁদের কাম্য নয়। ভাস্বতীর জীবন সুখ আর আনন্দে ভরে উঠুক—একথা মুখ ফুটে না বললেও অন্তরে-অন্তরে তাঁরা নিশ্চয়ই চান।

লেখক : ভাস্বতী, কী ভাবছ ? তোমার বাবা-মা তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করেন। তুমি তাঁদের আশায় কুঠারাঘাত করবে ?

ভাস্বতী : আজ আমি যা করতে যাচ্ছি, সে-কাজ মা-বাবার পরিপূর্ণ সমর্থন থাকলে সত্যিই খুব আনন্দের কথা হত। কিন্তু কেন-যে সমর্থন করতে পারছেন না, আমি জানি না।...বাবা-মার অন্তরে আঘাত দেওয়াটা আমার পক্ষে যেমন অনুচিত, তেমনি আমাকেও দুঃখ দেওয়াটা তাঁদের উচিত নয়। আমার মনের কথা, আমার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করা কি তাঁদের কর্তব্য নয় ? তবে যদি তাঁরা না বোঝেন কিংবা বোঝবার চেষ্টা না করেন, এবং পুরনো সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়।

লেখক : কিন্তু বাপ-মার আশীর্বাদ ছাড়াই এতবড়ো একটা কাজ করতে তোমার সাহস হয় ?

ভাস্বতী : আমার বিশ্বাস, অমি তাঁদের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব না। সক্রিয়ভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করলেও, নিস্ক্রিয় থেকেও তাঁরা অন্তর

থেকে নিশ্চয়ই অনুমোদন জানাবেন, এবং আশীর্বাদ করবেন, যেন কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

লেখক : বিমলের দিক থেকে বাধা আসতে পারে।

হিমাংশু : সম্ভবত আসবে না। এলেও, সে-বাধা আমরা অতিক্রম করব।

লেখক : আমাদের এই কাজ সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করবে।

ভাস্বতী : (অল্প উত্তেজিত হ'য়ে) সমাজের কথা আমাকে বলবেন না। আমাদের বেলায় সমাজ সবসময়ে সজাগ ; কিন্তু পুরুষের বেলায় সমাজ ঘুমোতে থাকে। আমার স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে সমাজ কেন বাধা দিল না? কেন সমাজ তখন আমার স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিল না আমার প্রতি ন্যস্ত তাঁর দায়িত্বের কথা? এখন আর সমাজের দোহাই দেবেন না। পুরুষের তৈরি নীতি-নিয়মের কথা বললে আমার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সমাজ সবসময়ে আমাকে পিষে মারবে, এটা আমি আর সহ্য করব না।

লেখক : তোমার মতো আদর্শ নারীর প্রতি লোকের আস্থা কমে যাবে।

ভাস্বতী : আমি আদর্শ নারী হতে চাই না।

হিমাংশু : ভাস্বতীর মতো যারা, তারা মনের দুঃখভার নামানোর মতো শক্তি পাবে। এবং এমন লোকের সংখ্যা সমাজে খুব কম নয়। তারা ভাস্বতীকে পূজো করবে—পথের দিশারী ব'লে।

লেখক : সংসারের পঙ্কিলতা তোমাদের প্রেমকে মলিন করে তুলবে।

হিমাংশু : সেই পঙ্কিলতা থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকবে ভাস্বতী—কল্যাণী গৃহিণীরূপে ; মাতৃত্বের গৌরবে ও হবে গরবিনী!

লেখক : কিন্তু সে-পথ—ভোগের পথ, কামনার পথ, প্রকৃতির পথ। সে-পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে তোমাদের প্রেম মুক্তির স্বাদ পাবে না। তার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে মোহানন্দময় অসংখ্য বন্ধনের মাঝে।

ভাস্বতী : আমাদের ভালবাসাকে আপনি স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু অনুমোদন করতে পারছেন না আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্তকে। তার মানে, আপনার অন্তরও সংস্কারমুক্ত নয়। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে, আমাদের যাত্রা জয়যুক্ত হোক ব'লে আশীর্বাদ করতে লেখক-নাট্যকার-সাহিত্যিক আপনিও সংকোচ বোধ করছেন!

লেখক : তুমি ভুল বুঝেছো। কোনো সংকোচ আমার নেই। আমি শুধু তোমাদের জন্যে মহত্তর জীবনের কল্পনা করেছি।

হিমাংশু : আপনার কল্পনা বাস্তব-বিমুখ।

লেখক : না—আমার কল্পনা বাস্তব থেকেই সংগ্রহ করে। তার গতিপ্রবাহ তার প্রাণশক্তি।

ভাস্বতী : আপনি কাপুরুষ। সত্যকে সুন্দরভাবে, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সৎসাহস আপনার নেই।

লেখক : শোন ভাস্বতী। দৃশ্যমান জগৎটাই কেবল বাস্তব নয়। সত্যের অঙ্কুর শুধুমাত্র তারই মধ্যে নিহিত হয়ে নেই। জাগতিক সীমা অতিক্রম ক'রে সে কেবলই বিস্তারিত, প্রসারিত হচ্ছে মানুষের ভাবজগতের দিকে, তার অন্তরতমের অভিমুখে, আত্মার অনির্বচনীয়তার কেন্দ্রে। আমি শিল্পী, আমি নাট্যকার, আমি সাহিত্যিক, আমি দ্রষ্টা। আমার কল্পনা কেবলমাত্র বস্তুজগতে আবদ্ধ থাকে না, থাকতে পারে না। তাই আমি চাই—তোমাদের সংস্কৃতিবান হৃদয়ে আজ বোধন হোক সেই প্রেমের, যে প্রেম দেহের বন্ধন চায় না, স্বীকার করে আত্মার মিলন ; যে প্রেম লৌকিকতার সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম ক'রে অসীম প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে শেখাবে। শেখাবে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, ভোগ-বাসনা-নিবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, মধুর মিলন-আনন্দকে অন্তরাত্মার গভীরতায় উপলব্ধি করতে মাত্র এই প্রেমই সত্য। এই প্রেমই অক্ষয় ও চিরন্তন, এই প্রেমই দেয় অনির্বচনীয়তার সন্ধান।

হিমাংশু : কিন্তু মাটির মানুষ আমরা। আপনার আদর্শ প্রেমের কল্পনা ধুলোবালির পৃথিবীর, রক্তমাংসের মানুষের জন্যে নয়। এই পৃথিবীটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার জন্যে আমাদের অপরিসীম মোহ। এই মোহপানে বদ্ধ থাকা ছাড়া আমাদের অন্য পন্থা নেই।

লেখক : হিমাংশু, তুমি পুরুষ। তোমার মনের গতিপ্রবাহের রূপ ব'লে তুমি যা ভাবছ, ঠিক তা নয়! আমি বলব, তুমি নিজেকে চিনতে পারো নি। রক্তমাংসের মানুষ হলেও তোমার একটা হৃদয় আছে। এই হৃদয়ে আছে একটি চিরন্তন কামনা—কল্পনার মানসী প্রিয়াকে পৃথিবীর কোন এক নারীর মধ্যে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। আজ ভাস্বতীর মধ্যে হয়তো তুমি দেখতে পেয়েছো তোমার মানসী প্রতিমার মূর্তিমতী রূপ। সেইজন্যেই ভাস্বতীর প্রতি গড়ে ওঠা আকর্ষণের মোহ তোমাকে অভিভূত করে ফেলেছে। কিন্তু যদি বিবাহের মধ্যে দিয়ে এই বন্ধনকে চিরন্তন করতে চেয়ে থাকো, তাহলে তোমাকে হয়তো হতাশ হতে হবে। তোমার হৃদয়ের গতি-চাঞ্চল্যই তোমাকে তৃপ্তির স্বাদ নিতে দেবে না, নিত্য-নতুনের সন্ধানে সে আবার স্থিরতা হারাবে।

ভাস্বতী : আপনি পুরুষ-হিমাংশুর অন্তরের চঞ্চল-গতির কথা ভাবছেন। কিন্তু আমার মনের কথা ভাবছেন না। আমি নারী। অভিসারিকার মতো আমি এগিয়ে এসেছি—হিমাংশুর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলব ব'লে। হিমাংশুর অস্তিত্ব আমি অনুভব করতে চাই নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়ে। ধূপ যেমন জ্বলে-জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়, আমি নারী, আমিও নিজেকে শেষ করে দিতে চাই হিমাংশুর ভালবাসার মধ্যে।

লেখক : তোমার এমন রূপ তো আমি কল্পনা করি নি।

ভাস্বতী : আপনি ভুল করেছিলেন।

লেখক : তুমি যে সাধারণ নও, তুমি যে অনন্যা—ভাস্বতী, তুমি। আমি

ভেবেছিলাম, ধীমান পুরুষের মতোই গতিশীল হবে তোমারও হৃদয়, কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে সে দাঁড়িয়ে পড়বে না, বিচিত্র রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ক'রে সে এগিয়ে যাবে অনন্তের পানে।

ভাস্বতী : আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার আশাকে, আপনার কল্পনাকে আমি রূপ দিতে পারলাম না।

লেখক : আমার সামনে ভাস্বতীর দুটো আলাদা রূপ দেখতে পাচ্ছি। একজন আমার মানসকন্যা অশরীরী ভাস্বতী, অন্যজন হলে তুমি।

ভাস্বতী : কাকে আপনি বেছে নেবেন আপনার নাটকের নায়িকারূপে? আমাকে নিশ্চয় নয়!

লেখক : একটু আগে পর্যন্ত দুটো রূপই বিলীন ছিল একের মধ্যে। ভাস্বতীর একটা রূপই আমি মানসপটে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু এইবার বিচ্ছেদ রচনা তোমার সঙ্গে। তোমরা যাও তোমাদের পথ দিয়ে, আমি বাধা দেব না। আর, আমি যাই আমার পথে, রূপ দিতে থাকি আমার রচনায় আমার কল্পনাকে, আমার আদর্শকে। আমার মানসকন্যা, আমার কল্পনার ভাস্বতী উদ্ভাসিত হোক ধ্যানলোকের ভাস্বর জ্যোতিতে। সাংসারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম ক'রে, আমার সাহিত্যে, ভাস্বতীর প্রেম ত্যাগ-মাধ্যমে হয়ে উঠুক অম্লান, হোক সুন্দর।

ভাস্বতী : আমি যাই এখন?

লেখক : যাও। কিন্তু যদি কখনও আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারো, আবার ফিরে এসো। সেই পরমলগ্নের জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ চেয়ে থাকব।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে নাটকের সমাপ্তি জানায়]

দ্বীপ

হিমেন্দ্রকুমার বড়ঠাকুর

চরিত্রাবলী :

পুরুষ :

বৃদ্ধ
খীরেশ্বর
ভাস্কর
বিজন

নারী :

আঘোনী
সাবিত্রী
মঞ্জুলা

প্রাসঙ্গিক

'আমাদের প্রতিনিধি', রঙালী বিহু সংখ্যা, 1894 শক। মূলস্বত্ব—শ্রীহিমেন্দ্র কুমার বড়ঠাকুর, জোড়হাট, আসাম। বড়ঠাকুর বৃত্তিতে ইঞ্জিনীয়ার। সম্প্রতি ইনি কিছুদিনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রবাসী। এ'র পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বাঘ' জনসমাদর লাভ করেছে। বড়ঠাকুরের চিন্তার ভঙ্গি মৌলিক।

[**স্থান :** বন্যাতাড়িত একটি ক্ষুদ্র ভূ-ভাগ। মঞ্চের ডানদিকে, মাঝামাঝি একটা প্রায়-শুষ্ক গাছ, তার গায়ে একটা ছোট ডাল। পশ্চাৎপটে নীল আকাশ, তার বুকে বড়-বড় মেঘের টুকরো কয়েকটা। রোদের উজ্জ্বল আলো। জলের শব্দ।

মঞ্চে কর্মব্যস্ত অবস্থায় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখা যায়। গায়ে জীর্ণ জামা, মুখে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি। বৃদ্ধের বয়স ষাটের মতো হবে। একটা দড়ি টেনে-টেনে নৌকা কিংবা ভেলা একখানা তুলছে বোধহয়। দড়ির অন্য মুখটা নেপথ্যে, বাঁদিকের পেছনের কোণে।

নাটকের নির্দেশনায় ব্যবহৃত ডানদিক ও বাঁদিক নির্ধারিত হয়েছে, দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে—অভিনেতাদের দিক থেকে নয়]

বৃদ্ধ : এঃ, ভালো ক'রে ধর; ছেড়ে দিস্‌নি। দেখে...দেখে...এহ্‌ হেঃ—(বৃদ্ধ পিছলে পড়ে যায়, আবার ওঠে)—এহ্‌, এখানটা এ্যাতো পিছল...কোমর ভেঙ্গে যাবে দেখছি এদের সঙ্গে! (চেঁচিয়ে বলে)—এই, শ্যাওলাটা খুঁচে সরিয়ে দে, নইলে, এতোবড়ো ভ্যালাটা তুলব ক্যামন করে? (দড়ি টেনে এনে গাছে একপাক দিয়ে স্বগতোক্তি করে)—ক্যামোন মজা! গোটা গ্রাম ভেসে গেল, এখন এই পাগলা বুড়োই হল তরণ-তারণ!

[বৃদ্ধ দড়ি টেনে এনে বাঁধে। দড়ির অন্য মুখটা নেপথ্যে, বাঁদিকের পেছনের কোণে। দড়িটা ফুলতে এবং ওঠা-নামা করতে থাকে—যা থেকে বোঝা যায়, নেপথ্যে ভেলাটা হাবুডুবু খাচ্ছে। আবহ-শব্দে জলের কলকলানি]

বৃদ্ধ : আয়, আয়, উঠে আয় এবার—(ডালটার ওপর বসে এবং হাঁফায়)—আমার রাজ্যে কতোদিন থাকবি, উঠে এসে তার হিসেব দে। (হঠাৎ নেপথ্যের বাঁদিকে চোখ পড়ায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে)—এই—এই—ঘরে ঢুকছিস ক্যানো? বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় বল্‌ছি!

[ওইদিক থেকে খীরেশ্বরের প্রবেশ। রোগা-পাতলা যুবক, বয়স একুশ না আটাশ, ধরা যায় না]

খীরেশ্বর : বৌদিদিকে ঘরেতে থাকৃতি দিয়েন দাদু!

বৃদ্ধ : ক্যানো দোব?

খীরেশ্বর : অবস্থা বড় কাহিল দাদু! ছেইল্যাটার খুবই খারাপ।

বৃদ্ধ : ভালো কথা। তাহলে ঘরের ভাড়া দে।

খীরেশ্বর : ঘরের ভাড়া?

[এই সময়ে অনেক দূরে হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা যায়]

বৃদ্ধ : দস্তুরমতো ঘরের ভাড়া। নইলে, এম্‌নি থাকতে দুব নাকি?...শুধু ঘরের ভাড়াই না, এই যে তোরা আমার রাজ্যে পা দিলি, তার জন্যে এন্‌ট্রি ট্যাক্স দে।

খীরেশ্বর : সেইটা আবার কী?

[হেলিকপ্টারটা মাথার ওপর এসে পড়েছে। শব্দটাও জোর হয়েছে। বৃদ্ধ ওপরে চেয়ে রেগে বলে—]

বৃদ্ধ : এইতো একটু আগে এসেছিল...ফড়িংয়ের মতো আবার আসে যে! (হেলিকপ্টারের প্রতি—)—ওই হেলিকপ্টার, গেলিনি এখান থেকে? গেলিনি?

[হেলিকপ্টারের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আঘোনী বুড়ী এসে খীরেশ্বরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে]

আঘোনী : খীরেচর রে, বাচ্চাটার অসুখ মন্দর দিকে গৈলচে।

বৃদ্ধ : কোন্ বাচ্চা?

আঘোনী : মোর লাতি, বাবা! পরশু পানি আহাতে মোর বড় পোর কাল হল। ত্যাখন থিক্যা পানিতেই ভাসি ফিরসি! বাবা! ভ্যালাখানায় খীরেচর কোনো-মতে তুইল্‌লে বৌকে আর ছৈল্যা দুটা।

বৃদ্ধ : দুটো ছেলে? সে-ছেলেটা কোথায়?

খীরেশ্বর : কাইলে প্রভাতকাল—নাই।

বৃদ্ধ : নাই?

খীরেশ্বর : রাতেই। কুথায় য্যান্, ভ্যালা থিক্যা সরি পড়িল।

বৃদ্ধ : স'রে পড়ল?

খীরেশ্বর : সরি পড়িল। শেষ নিশাই বোদয়। দিচাং-এর মুখেতেই হবে্য।

বৃদ্ধ : ক্যানো—তোরা তুললি নি ক্যানো?

খীরেশ্বর : জান্‌তি পারলে ত' তুইলব! মোরা জানতিই পারলম না—ক্যাখন প'ড়ল! পরে দেখি—নাই!

[আঘোনী চোখের জল মোছে]

আঘোনী : বৌটার চোখের পানি শুকাল বাবা—মোরও।

খীরেশ্বর : ভালোই হৈচে। ত'রা আবার চিৎকার আরম্ভ কইরবি নি। ত'দের চিৎকার শুনি শুনি মোর কান-ফাটা হৈলচে। (বৃদ্ধের প্রতি)—হেথা কলাগাচ আচে?

বৃদ্ধ : কলা গাছ? কলা গাছ দিয়ে কি করবি?

খীরেশ্বর : ভ্যালাখান অল্প রিপেয়ার করৃতি নাগবে।

বৃদ্ধ : তুই গোড়া থেকেই ভ্যালাটা ঠিক ক'রে নিস্‌নি ক্যানো? তা'লে দুধের বাচ্চাটা জলে পড়ত নি।

খীরেশ্বর : সময় পেলম কুথা? দিচাং-এর বাঁধ ভাঙি পর্ব্বত সমান পানি ছুটি আহিল্। দাদা আগবাড়ি দ্যাখ্‌তি গৈ কুথা যে ভাসি গে'ল, হিসাবেই নাই।

মুই কোতেম্ম মাকে, বৌদিদিকে ঘরের চালে তুললম ; কোলেরটাকে বৌদিদি ধয়েরল। তার বড়টাকে মুই মার পিঠে তুললম। তারপর—পানি গৈ ঘরের ছাদ পাইল। তারই মাকে ভাস্যাই কলাগাচ কয়খান কাটলম।

বৃদ্ধ : তার পরে ?

খীরেশ্বর : তারপর—কার ছাদ কুথা ভাসি গেল ! দিচাং-এর পাগলা পানি আহি লৈ গেল মোদিগকে।

আঘোনী : আজি আপুনি আমাদিগকে বড় রক্ষা কয়েরলেন বাবা !

[বাঁদিক থেকে সাবিত্রীর প্রবেশ। তেইশ-চব্বিশ বছরের গ্রাম্য বধূ। চোখের কোলে অনেক অশ্রুজলের চিহ্ন]

সাবিত্রী : মাগো।

আঘোনী : কি হল ? ছেইল্যা ছাড়ি আহিলি ক্যান্ ?

সাবিত্রী : ছেইল্যাটা কিরকম করে মা ! মোর বড় ভয় না'গচে।

আঘোনী : চল্ মা চল্ ! কী জানি—হরি কার কপালে কতো দুখ নিখচেন !

[সাবিত্রী ও আঘোনী বাঁদিকে যায়। এতক্ষণ বৃদ্ধ কী যেন ভাবছিল। এবার বলে—]

বৃদ্ধ : ঠিক আছে। তোদের আর ঘরের ভাড়া দিতে হবেনি।

খীরেশ্বর : গত দুইদিন-দুইরাতি মোরা এই ভ্যালাখান্তেই ভাসি ঘুরিছি দাদু। মোদের হাতে পইচা দূরস্থান, মোদের কাইটলেও রক্ত বা'র হব নি।

বৃদ্ধ : তোদের এন্ট্রি-ট্যাক্স্ও দিতে হবে নি...সব মাফ ক'রে দিলুম। (সহসা, উৎসাহে)—এই, তুই কাঠ ধরতে পারবি ?

খীরেশ্বর : কাঠ !

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, কাঠ। সেবারের বন্যায় আমি ভেসে আসা অনেক কাঠ তুলেছিলুম।... এবারে একলা আর পারব নি। (নেপথ্যের তথা প্রেক্ষাগৃহের দিকে আঙুল তুলে)—ওইটে দেখছিস্...ওইটে !

খীরেশ্বর : কোন্টা ?

বৃদ্ধ : ওইটে। ইস্স্, মস্ত কাঠ...আমার একমাস যাবে।

খীরেশ্বর : কুথা কাঠ দ্যাহেন ? সেইটা শ্যাওলা ! বড় বেগে বৈছে।

বৃদ্ধ : শ্যাওলার পেছনে রে কানা, ভালো ক'রে দ্যাখ্‌না। এঃ চলে গ্যাল। (নেপথ্যে আর একটা কাঠ ভেসে আসতে দেখে)—ওইটে, ওইটে...ওই যে... এই দিকেই আসছে ! চল্ চল্ ধরতে পারলে—ইঃ এই এ্যাকটা কাঠেই আমার দু'মাসের রান্না চলে যাবে।

খীরেশ্বর : রান্ধা-বাড়া ? (শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় জিব দিয়ে বার কয়েক চেটে)—খাবার কিছু আচে নেকি দাদু ? মোরা দুইদিন দুইরাতি কিছু খাই নাই।

বৃদ্ধ : খাবার পাবি কোথায় ? দেখছিস নি, চারদিকে জল ?...তোদের গাঁয়ের

ছেলেরা আমাকে ক্ষ্যাপায়, বলে, 'পাগলা বুড়ো জলাভূমিতে এ্যাকা-এ্যাকা থাকে'। এ্যাখন দেখছিস্ তো—এই বন্যায় আমার এই জলাভূমির টিলাটাই শুধু টি'কে আছে, বাকি সব জলের তলায় চলে গেছে।

খীরেশ্বর : বড় ভোঁক নাগচে দাদু। ভোঁকে পেটের কেঁচোটিও মরচে।

[দূর থেকে মোটরলঞ্চের অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যায়]

বৃদ্ধ : আমার কলসীতে কিছু চি'ড়ে ছিল—

[খীরেশ্বর আশান্বিতভাবে তাকায়]

—কিন্তু কাল সনঝায় সেও শেষ হয়ে গেছে। এ্যাখন তোর য্যামোন উপবাস, আমারও তেমনি উপবাস।

[খীরেশ্বর আশাহত হয়ে পড়ে। নেপথ্যে মোটরলঞ্চের শব্দ অল্প জোরাল হয়েছে। প্রথমে বৃদ্ধ, পরে খীরেশ্বর সেইদিকে তাকায়]

বৃদ্ধ : কী ওটা?

খীরেশ্বর : ভট্‌ভটি-নাও বোদয়।

বৃদ্ধ : এইদিকেই এগিয়ে আসছে! পারমিশন তো নেওয়া নেই।

খীরেশ্বর : কিবা খাদ্যবস্তু আইনচে বোদয়, দাদু!

বৃদ্ধ : যিইই আনুক, আমার এখানে নৌকা বাঁধতি হলে ট্যাকস দিতে হবে।

[আঘোনীর প্রবেশ]

আঘোনী : ছেইল্যাটা যে ঘনে-ঘনে বমি ক'রচে বাবা!

বৃদ্ধ : বমি করছে? ওষুধ-পত্তর কিছু খাওয়াস নি? এই ভয়ংকর জলের মাঝখানে এ্যাখন আমি কী করি?

খীরেশ্বর : য্যানত্যান প্রকারে টাউনে লয়্যা যাতি হবে, দাদু! (নেপথ্যের বাঁদিকের পেছন-কোণে-থাকা ভেলাটার দিকে চেয়ে বলে)—ভ্যালাখান কমজোর হৈলচে। কলাগাচ আচে? আরও দুখানমতো কলাগাচ...পাইলে—

বৃদ্ধ : এখানে কলাগাছ পাবি কুথায়?

আঘোনী : কলাগাচ দি' কী ক'রবি বাপা! পানিতে ঈ করাল সোঁত, তার মাঝে তুই কি ভ্যালা চালাতি পা'রবি?

[নেপথ্যে মোটরলঞ্চের শব্দ উচ্চগ্রামের হয়েছে। বোঝা যায়, লঞ্চটা কাছে এসেছে]

খীরেশ্বর : পা'রব, পা'রব; ক্যান পা'রব নি? ঈর থিক্যা ক'ত পাগল পানীর মাঝে ভ্যালা চালাইচি। এ্যাহন মাত্র অলপ খাতি হবে। বড় ভোক নাগচে। ভোকে পেট বিষাই যৈচে। (নিজের পেটটা খামচে ধরে। মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি)—আজি দুইদিন-দুইরাতি কিচু খাই নাই।

[নেপথ্যে, ডানদিকের পেছনের কোণ থেকে বিজনের চিৎকার শোনা যায়]

বিজন : (নেপথ্যে) এই বুড়ো, এই—দড়িটা ধরো তো দেখি—

[সঙ্গে সঙ্গে সেইদিক থেকে একটা দড়ির মুখ বিজন ছুঁড়ে দেয় ; বৃদ্ধ ধরে, খীরেশ্বর সাহায্য করে। মোটরলঞ্চের শব্দ বন্ধ হয়েছে। বৃদ্ধ নেপথ্যের ডানদিকের পেছনের কোণের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে—]

বৃদ্ধ : এখানে নৌকো বাঁধেন যদি, পয়সা দিতি হবে।

[নেপথ্য থেকে বিজন জবাব দেয়]

বিজন : (নেপথ্যে) দোব, দোব...দড়িটা টানো তো!

[বৃদ্ধ ও খীরেশ্বর দড়ি টেনে গাছে বাঁধে। ডানদিক থেকে ভাস্করের প্রবেশ। তার পায়ে কাদা। সাতাশ-আটাশ বছরের টগবগে যুবক, দেহে পরিচ্ছন্ন সাজ-পোষাক]

ভাস্কর : তোমরা কি বন্যায় ভেসে এসেছো ?

আঘোনী : মোরা বড় অসহায় মানুষ, বাবা! মোর নাতিটার বড় বিপদ। মোদিগকে সহায় দিয়েন, বাবা!

বৃদ্ধ : (ভাস্করকে) নৌকো বাঁধার জন্যে পয়সা দিন।

ভাস্কর : পাবে, পাবে, দাঁড়াও না। (আঘোনীকে)—কোথায় তোমার নাতি ?

খীরেশ্বর : সে-ই ঘরে।

ভাস্কর : কী হয়েছে ?

আঘোনী : বমি করতিচে।

ভাস্কর : বমি করছে ? চলো তো, চলো।

[ভাস্কর, আঘোনী এবং খীরেশ্বর বাঁদিকে যায়। পেছনে-পেছনে বৃদ্ধও যাচ্ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে ডানদিক থেকে বিজন এবং মঞ্জুলা দেবী প্রবেশ করায় সেইদিকে ঘুরে তাকায় এবং ফিরে আসে। বিজন সাতাশ-আটাশ বছরের যুবক। গায়ে ফুলতোলা কাপড়ের শার্ট, কাঁধে ঝুলিয়ে-নেওয়া ক্যামেরা।

প্রথমে বিজন বৃদ্ধের দিকে পিছন ফিরে প্রবেশ করে, এবং নেপথ্যের ডানদিকে চেয়ে চেয়ে বলে—]

বিজন : এসো, বৌদি। দেখো, দেখো, বড্ড কাদা এখানে। এঃ—দিলে তো কাদায় পা!

[একই দিক থেকে মঞ্জুলার প্রবেশ। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স্কা মহিলা। অতি আধুনিক সাজ-পোষাক]

মঞ্জুলা : ঈস্‌স্‌। আমার শাড়িটা এ্যাকবারেই গ্যাল।

বিজন : এ্যাড্‌ভেঞ্চার আর কাকে বলে। বেশ থ্রিলিং—না ?

বৃদ্ধ : ট্যাক্সটা দি' যাবেন কিন্তু—

[বিজন ঘুরে তাকায়]

বিজন : কে হে তুমি ? কিসের ট্যাক্স ?

[বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—]

বৃদ্ধ : পোর্ট ট্যাক্স।

মঞ্জুলা : কী আশ্চর্য !

বিজন : পোর্ট ট্যাক্স ?

বৃদ্ধ : আমার বন্দরে জাহাজ বাঁধলেন, পোর্ট ট্যাক্স দিতে হবে নি ? শুধু পোর্ট ট্যাক্সই না, এই যে উঠে এলেন, তার জন্যে এন্‌ট্রি ট্যাক্সও দিন।

বিজন : বাঃ, এ-তো কম নয় ! তুমি কে ?

বৃদ্ধ : আমি এই দ্বীপের রাজা।

মঞ্জুলা : ইন্টারেস্‌টিং !

বিজন : তুমি তাহলে রাজা সেজে ট্যাক্স তুলে বেড়াচ্ছ ? পুলিস জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে জানো ?

বৃদ্ধ : পুলিস ? কুথায় পুলিস ? দেখছ নি চতুরদিকে জল ? এখানে তোমাদের পুলিস আসবে ডিউটী দিতে।...এ হল আমার রাজ্য। এখানে আর কারও রাইট্‌ নাই।

বিজন : বাঃ, এ তো বেশ ইংরেজী বলে ! এই, কে তুমি ?

বৃদ্ধ : তোমার মতো ছেলেকে আমি ইংরাজী শেখাতি পারি, বাবা ! জানো—চল্লিশ বছর আমি হাইস্কুলের ইংরাজীর মাস্টর ছিলুম ? শেষে, পেনসন নিয়ে গ্রামে ফিরি গিয়ে দেখলুম—আমার বাড়ি জমি সব গেছে !

বিজন : গ্যাছে ?

বৃদ্ধ : রেভিনিও সেল্‌-এ গেছে। আত্মীয়-স্বজনেরা এ্যড্‌ভার্স-পজেশন্‌ করে নিয়্যা নিয়েছে। বেদখল। পঁচিশ বছর ধ'রি মনি-অর্ডার ক'রে খাজনার টাকা পাঠ্‌য়েছি, একটাও জমা পড়ে নি। সব টাইম-বার্‌ড্‌ হয়ে গেছে।

মঞ্জুলা : আইনের এসব কথা তুমি কোথায় শিখলে ?

বৃদ্ধ : পরে। বাড়ি-জমির জন্যে কেস্‌ করলুম। তখন বুঝলুম—আইন-কানুন কী, উকিল-মুহুরী-হাকিম এই সব কী বস্তু ! এর আগে কিছুই জানতুম নি। ছিলুম ইস্কুল-মাস্টর। দিন, ট্যাক্স দিন তো এ্যাখন।

[শেষ বাক্যটা ছিল মঞ্জুলার উদ্দেশ্যে ; কিন্তু উত্তর দিল বিজন—]

বিজন : দিন, বললেই হল ? ট্যাক্স তোলবার কী রাইট্‌ তোমার ?

বৃদ্ধ : বেশি তর্ক কোরো নি বাবা। তর্ক করলে পেনাল্‌টি দিতে হবে।

বিজন : বাব্‌বাঃ—এতো দেখছি ভীষণ সাংঘাতিক।

বৃদ্ধ : খুব সাংঘাতিক লোক আমি। ঘর নাই—জমি নাই—ধন নাই, সোনাদানা নাই, গাঁয়ে আমার কোন ঠাঁই নাই। বাধ্য হয়্যা আমি চলে এসে এই জলায় আছি—এ্যাকা এ্যাকা মেছো-ভূতের মতো।...দাও, ট্যাক্স দাও। পোর্ট ট্যাক্স

সাড়ে সাত টাকা, এন্ট্রি ট্যাক্স জনপ্রতি তিন টাকা করি ন'টাকা, তর্ক করার জন্যে পেনাল্টী দশ টাকা—মোট সাড়ে ছাব্বিশ টাকা। এর ওপর, ঘর-ভাড়া যদি লাগে তো বোলো—মাসে সতেরো টাকা।

মঞ্জুলা : ঘর ?

বিজন : কোথায় ঘর ?

বৃদ্ধ : (বাঁদিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে, গম্ভীরভাবে) দেখছো নি ?

বিজন : ওইটে তোমার ভাড়ার ঘর ? ওই খড়ের ঝুপ্ রীটা ?

বৃদ্ধ : খবর্দার, হাসবে নি। ওইটেই এই রাজ্যের গভর্ণমেন্ট হাউস। দেখছো নি—চতুর্দিকে বন্যার জল সব ডুবিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই রাজ্যটা এখনও ডোবাতে পারে নি।...ঢেউগুলো অবশ্য খুবই সচেষ্ট। কলকল তুলছে। ঘাই মারছে।...শুনছো জলের শব্দ ? (জলের শব্দ। বৃদ্ধ নেপথ্যের ডানদিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে)—খবর্দার! এই বানের জল, এগোবি নি, এগোলেই মরবি। এই ঢেউগুলো, ঘা মারছিস্ ক্যান ? পিছিয়ে যা—গো ব্যাক্...গো ব্যাক্—

[বৃদ্ধ ডানদিকের উইংস্-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বন্যার জলকে শাসন করে। একই সময়ে বিজন ও মঞ্জুলা কথা বলে—]

বিজন : মানুষটা পাগল।

মঞ্জুলা : মনের দুঃখে পাগল হয়ে গেছে বোধহয়।...ভাস্করটা কোথায় গ্যাল ?

বিজন : আর কাজ কী ? চাকরি-বাকরি রিজাইন দিয়ে এ্যাখন দেশসেবায় মেতেছে।

মঞ্জুলা : তুমি আর কী বলছ ? তোমার তো চাকরিই নেই! সবেধন ওই আই-এ-এস'এর আশায় ওৎ পেতে বসে আছো।

বিজন : তবে, আমি যদি ঈ-অ্যাণ্ড-ডি-র ইঞ্জিনীয়ারের চাকরি পাই, ভাস্করের মতো রিজাইন দিতে পারব না কিন্তু।

মঞ্জুলা : ওই যে আসছেন উনি! ঘরটায় ঢুকে কী করছিল ?

[দুজনে বাঁদিকের নেপথ্যে তাকায়। সেইদিকে ভাস্করের ডাক শোনা যায়—]

ভাস্কর : এই বিজন, লাঞ্চটা বেঁধেছো ?

বিজন : কী করছটা তুমি ? আসছো না ক্যান ?

[বাঁদিক থেকে ভাস্করের প্রবেশ]

মঞ্জুলা : ওখানে তুমি কী করছিলে ?

ভাস্কর : লোকগুলোর বড় বিপদ। জানো বৌদি, মেয়েটার স্বামী মরেছে পরশু; ভ্যালা থেকে এ্যাকটা বাচ্চা কোথায় যে পড়ে গ্যাল, বলতে পারে না; আর এ্যাকটা বাচ্চার খুব অসুখ।

বিজন : আরে, এসব দুঃখের কাহিনী তো সবসময়ে লেগেই আছে। এদিকে যে বড্ড দিগ্‌দারী হচ্ছে, জানো ? না, জানো না ?

ভাস্কর : কী ?

মঞ্জুলা : (বৃদ্ধকে দেখিয়ে) ওই ওঁকে ট্যাক্‌স্ দিতে হবে ?

ভাস্কর : আমাকেও বলছিল একটু আগে। দিয়ে দাও ক'টা টাকা বৌদি। বেচারা বুড়ো মানুষ !

বিজন : বাহ্, বললেই দিতে হবে নাকি ?

ভাস্কর : দ্যাখো বিজন—বৌদি এ্যাতো বড়ো অফিসারের স্ত্রী ; দিলেই নাহয় টাকা কয়েকটা। কী হয়েছে ?

বৃদ্ধ : (ফিরে এসে) দিলুম বাপোকে।

বিজন : কী দিলে, দাদু ?

বৃদ্ধ : আচ্ছা ক'রে গাল্ দিলুম।

ভাস্কর : কাকে ?

বৃদ্ধ : এই বন্যাকে ! আমার রাজ্য ডোবাতি আসছে। চতুরদিকে অথই জল। তার মধ্যিখানে এই মাটির টুকরোটা য্যান ওদের চোখের বালি ! দ্যাখো নি, ঢেউগুলো ক্যামন ক'রে ধাক্কা মারে···য্যান ধাক্কা দি' দিয়েই ভাগায়ে দেবে ! (ডানদিকে তাকিয়ে চেঁচায়)—সাবধান, এ্যাক পাও এগোবি নি...গো ব্যাক্...গো ব্যাক্ !

[বৃদ্ধ আগের মতো ডানদিকের উইংস্-এর পাশে এগিয়ে গিয়ে নেপথ্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে থাকে]

মঞ্জুলা : ইনি কিভাবে বন্যা কন্‌ট্রোল করছেন, দেখেছো ?

বিজন : রিয়েলী ভাস্কর, তোমরা এঁকে ফ্লাড-কন্‌ট্রোলের চীফ ইঞ্জিনীয়ার করতে পারো।

ভাস্কর : বাস্তবিক ! সরকার তো লেক্‌চার দিয়েই ফ্লাড-কন্‌ট্রোল করে আসছে। হাঁ হে বিজন, তোমার কাকা তো মিনিস্টার ?

বিজন : তাতে কী হয়েছে ?

ভাস্কর : তাঁকে বলো না—এই বৃদ্ধকে ফ্লাড-কন্‌ট্রোলের মিনিস্টার ক'রে নিন !

[এই সময়ে, ওপরে হেলিকপ্টারের শব্দ। বৃদ্ধ ফিরে আসে]

বৃদ্ধ : এই আরেকটা আপদ। আবার এয়স্‌ছে !

বিজন : ইয়েস, কালই কাকা আমায় বলছিলেন—হেলিকপ্টারে ক'রে ফ্লাড দেখতে যাবি ?

মঞ্জুলা : মোটরলঞ্চে বেশি ভালো লাগে, জানো ! বেশি এক্‌সাইটিং।

বৃদ্ধ : (ওপরে আঙুল তুলে) ওতে কে আছেন বটে ?

বিজন : মিনিস্টার বরুয়া। তোমার কি দরকার ?

বৃদ্ধ : মিনিস্টার ? চতুরদিকে জল, মাথার ওপর মিনিস্টার,...কিসের মিনিস্টার উনি ?

বিজন : রেভিনিউ মিনিস্টার।

বৃদ্ধ : (ক্রোধে জ্বলে ওঠে) রেভিনিউ, রেভিনিউ, রেভিনিউ! আমার ঘরবাড়ী সব রেভিনিউ-সেলে গেছে। (হেলিকপ্টারকে)—গেলি নি এখান থেকে ? গেলি নি ?

[হেলিকপ্টারের শব্দ শোনা যায় না। মঞ্জুলাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বিজন বলে—]

বিজন : বুড়োর রাগটা দেখছো ?

বৃদ্ধ : ওহে, আমার ট্যাক্সটা দাও।

বিজন : আরে, তুমি ভোলো নি এ্যাখনও ?

বৃদ্ধ : বেশি লেট্ কোরো নি, লেট্ ফাইন দিতি হবে।

ভাস্কর : এ যে দেখছি বেশ ইংরেজী বলে !

মঞ্জুলা : (মঞ্জুলা ব্যাগ খুলতে থাকে) দাঁড়াও, দাঁড়াও, পয়সা বার করছি।

বৃদ্ধ : এ্যাখন কিন্তু তিরিশ টাকা পুরো দিতি হবে।

বিজন : ক্যানো—সাড়ে ছাব্বিশ টাকা তো ছিল ?

বৃদ্ধ : ছিল—। এ্যাখন নাই। সাড়ে তিন টাকা লেট্-ফাইন লাগছে। মোট তিরিশ টাকা।

[মঞ্জুলা তিনখানা দশ টাকার নোট বার করে ; বৃদ্ধ প্রায় থাবা দিয়ে নিয়ে নেয়]

মঞ্জুলা : আঃ—অমন থাবা দিয়ে নিচ্ছো ক্যানো ?

বৃদ্ধ : তিরিশ টাকা! হাঃ হাঃ হাঃ—এই তিনটে দশ টাকার নোট ভালো ভালো খাবার খাতি পাব।...এই ছেলেটা! এই—!

[বাঁদিকের নেপথ্যের উদ্দেশ্যে মুখ ক'রে খীরেশ্বরকে চেঁচিয়ে ডাকে ; নেপথ্য থেকে খীরেশ্বর উত্তর দেয়—]

খীরেশ্বর : (নেপথ্যে) যেছি দাদু !

ভাস্কর : পেটের জ্বালায় মানুষটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

মঞ্জুলা : অন্য জ্বালাও আছে।

[খীরেশ্বরের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বাঁদিকে এগিয়ে গিয়েছিল ; এখন সেইদিক থেকে খীরেশ্বর প্রবেশ করায় উইংস্-এর কাছে দু'জনে মুখোমুখি হয় ; ওরা কথা বলে। এবং মঞ্জুলা-বিজন-ভাস্কর ডানদিকের একপাশে তাকিয়ে থাকে]

খীরেশ্বর : দাদু।

বৃদ্ধ : তোর নামটা কী য্যান বলেছিলি ?

খীরেশ্বর : খীরেচর।

বৃদ্ধ : খীরেশ্বর।...চল্,! আমরা ভালো দামী এ্যাকটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খায়ে আসি।...চল্।

খীরেশ্বর : (বিস্মিত হয়ে) দাদু!

বৃদ্ধ : কী খাবি ?! মোগলাই পরোটা ? মটন-কারী ? পোলাও ? চল্, তিরিশ টাকা উড়াই দি আসি।...তিনটে দশ টাকার নোট—কেটে ভেজে খাতি হবে। চল্ চল্।

[বৃদ্ধ খীরেশ্বরকে নিয়ে পশ্চাদপটের কাছে চলে যায়। দুজনে কথা বলতে থাকে। কিন্তু তাদের কথা শোনা যায় না। এই সময়ে, মঞ্চের সম্মুখভাগে বিজন-মঞ্জুলা-ভাস্কর কথা বলে—]

বিজন : বুড়োটা খুব হিউমারাস্!

ভাস্কর : আমি বলেছিলাম না, কিছু ভিজে চিঁড়ে কিংবা ছোলা-মটর নিয়ে চলো। তোমাদের যে তর্ সইল না। তোমরা ভেবেছিলে—বন্যা দেখতে আসাটা এ্যাকটা ফান্, এ্যাকটা স্ফূর্তি, এ্যাকটা পিক্‌নিক্। এ্যাখন দেখছো তো ?

বিজন : বছর-বছরই তো এ্যামোন হয়ে থাকে।—দিস ইজ নো ওয়াণ্ডার!

ভাস্কর : সেইজন্যেই তো বলি—আমাদের জাতটা এই নদীর পাড়ে থাকার উপযুক্ত নয়।

মঞ্জুলা : আমি খাবার জিনিস একটু এনেছি জানো ? আমাদের লেডিজ ক্লাব থেকে।

[বৃদ্ধের সঙ্গ ছেড়ে খীরেশ্বর এগিয়ে আসে]

খীরেশ্বর : অ' দিদি—খাদ্যবস্তু কিছু আছে নেকি ? আমাকে দিবেন নেকি ?

মঞ্জুলা : দোব, দোব, একটু সবুর করো। এই বিজন—লঞ্চে সেই ব্যাগটা আছে, নিয়ে এসো না ভাই।

বিজন : উইথ প্লেজার!

[বিলিতি কায়দার একটা হাসি হেসে বিজন ডানদিকে যায়। গ্রাম্য সুরে চিৎকার করতে-করতে খীরেশ্বর বাঁদিকে যায় ; বলতে বলতে যায়—]

খীরেশ্বর : উরে মা...উরে বাব্‌বাঃ, খাদ্যবস্তু আইন্‌চে—আহ্‌ আহ্‌।

ভাস্কর : কী এনেছো বৌদি ?

মঞ্জুলা : সেই লাড্ডুগুলো—সেই যে আমাদের লেডিজ ক্লাব থেকে লড়াইয়ের জোয়ানদের জন্যে পাঠানো হয়েছিল।

ভাস্কর : অ'—তা কী হল ?

মঞ্জুলা : (মুখ ফুলিয়ে) জোয়ানরা কী অসভ্য জানো—লাড্ডুগুলো ফিরিয়ে দিলে ?

ভাস্কর : ক্যানো ?

মঞ্জুলা : বলে পাঠালে—নাড়ুর দরকার নেই, বন্দুক চাই। জোয়ানগুলো একদম ম্যানার্স জানে না!

[**খীরেশ্বর এবং আঘোনীর প্রবেশ**]

ভাস্কর : এতোদিনের বাসী নাড়ু—খারাপ হয়ে যায় নি ?

মঞ্জুলা : খুব সম্ভব, হয় নি। শুকনো মিষ্টি তাড়াতাড়ি পচে না।

[আঘোনী এবং খীরেশ্বর ইতিমধ্যে সারি দিয়ে আশায়-আশায় চেয়ে থাকে। মঞ্চের সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কাণ্ড-কারখানা দেখতে থাকে]

আঘোনী : মন্দ হলেও দিয়েন, মা।

খীরেশ্বর : দুই দিন-দুই রাত্তি কিছু খাই নাই, দিদি। এ্যাহন কি আর ভাল-মন্দ বাছ-বিচার আচে ?

বৃদ্ধ : আপনারা কি নাড়ুগুলো ফ্রী দিবেন নেকি ?

মঞ্জুলা : (অবাক হয়ে) নইলে কি আমরা পয়সা নোব নাকি ? কী-যে কথা বলো না!

বৃদ্ধ : তাহলে বেশ কথা। পয়সা নিলে সেলস-ট্যাকস্ দিতি হবে কিন্তু।

[বিজনের প্রবেশ। হাতে একটা ব্যাগ]

বিজন : এই নাও ব্যাগ।

মঞ্জুলা : খোলো তো ভাই।

[বিজন ব্যাগটা খুলে মঞ্জুলাকে দেয় এবং স'রে গিয়ে ক্যামেরা ফোকাস করে। আঘোনীরা মঞ্জুলার কাছে স'রে আসে]

আঘোনী : দিয়েন মা, মোর বৌটার জন্যিও দুটামান দিয়েন।

বিজন : দাঁড়াও, দাঁড়াও, বৌদি—ক্যামেরাটা ফোকাস করে নি'।

[মঞ্জুলা নাড়ু বিলোয়। বিজন ফটো তোলে]

বিজন : এই, এদিকে একটু তাকাও তো, একটু হাসি-হাসি মুখ করো।...হ্যাঁ, হয়েছে...আঃ, থ্যাঙ্ক য়্যু!...খুব সুন্দর হবে ছবিটা। 'ডেপুটি কমিশনারের মিসেস এ্যাতো ইন্টিরিয়র জায়গায় গিয়ে ফ্লাড রিলিফের কাজ করছেন'—এ্যাক্‌কেবারে হেডলাইন!

মঞ্জুলা : (স্বল্প লজ্জার ভঙ্গিতে) ব্যাকগ্রাউণ্ডের মেঘ আর জলটা উঠেছে তো ?

ভাস্কর : তোমরা এসব কী বলছ বৌদি ? মানুষের এ্যামোন বিপদের সময়ে—

বৃদ্ধ : বলতে দাও বাবা! কথা বলার ওপরে তো ট্যাকস্ নেই।

খীরেশ্বর : উস্ মা!

আঘোনী : কী হল বোপাই, কী হল ?

খীরেশ্বর : পানি—

[**ভাস্কর খীরেশ্বরকে ধরে। আঘোনী বাঁদিকে দ্রুত প্রস্থান করে**]

ভাস্কর : খাবার জল আছে ?

মঞ্জুলা : জল ?

বিজন : ওগুলো কি জল নয় ?

ভাস্কর : ও-জল খুবই নোংরা...মানুষ খেতে পারবে না।

খীরেশ্বর : পানি !

ভাস্কর : আমাদের লঞ্চে জলের বোতল আছে না ?

বিজন : তার চেয়ে, এ্যাকটা পুরো রেস্টুরেন্টই এখানে উঠিয়ে আনলে হয়।

[এক ঘটি জল নিয়ে আঘোনীর প্রবেশ]

খীরেশ্বর : পানি !

আঘোনী : এই-যে পানি...খা বোপাই।

[আঘোনী খীরেশ্বরকে জল দেয়। খীরেশ্বর জল খেয়ে সুস্থির হয়। বৃদ্ধ কবিতার সুরে আবৃত্তি করে—]

বৃদ্ধ : ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়ার, নট এ ড্রপ টু ড্রিংক !—কোলরিজ।

খীরেশ্বর : নাড়ুগুলা—পচা !

বৃদ্ধ : মনগুলোও পচা !

মঞ্জুলা : উঃ—এ্যাতো পচা-পচা গন্ধ এ্যাকটা আসছে।...ওক ওক।

[বমির ভাব করে, নাক চেপে ধরে। সকলে চারিদিকে তাকায়]

বিজন : কিছু পচেছে বোধহয়।

ভাস্কর : হঠাৎ এল গন্ধটা।

বৃদ্ধ : জলে ভাসি এয়সৃছে—ওই যে।

ভাস্কর : কী ?

বৃদ্ধ : এ্যাকটা মরা গরু—এ্যাকেবারে পচা। ভাসতি-ভাসতি উঠি এয়সছে আমারই দ্বীপের উপকূলে ! দাঁড়াও, কোসট্যাল গার্ডদের দিয়ে হটায়া দি' আসি।

[ডানদিক দিয়ে বৃদ্ধের প্রস্থান]

বিজন : এইটুকু রাজ্যে দেখছি, বুড়ো নিজেই গভর্ণর, ট্যাকস্-কালেকটর, কোসট্যাল গার্ড—সব !

মঞ্জুলা : উঃ—কী পচা-পচা গন্ধ !

[মঞ্জুলার মুখ বিকৃত হয়ে যায়]

ভাস্কর : এই হচ্ছে রিয়েলিটি, বুঝেছো বৌদি। মনে আছে, আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে তুমি কী বলেছিলে ?

বিজন : কী ?

ভাস্কর : এ্যাতো বৃষ্টির পর আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গ্যাছে, চলো, আমরা মোটর-লঞ্চে ক'রে ফ্লাড দেখে আসি।...য্যানো, এ্যাকটা আউটিং।

বিজন : আঃ—তুমি এ্যাতো ক্রিটিক্যাল।

ভাস্কর : বুড়ো ভেডবডিটা হঠিয়ে দিয়েছে। (মঞ্জুলাকে)—গন্ধটা ঝপ ক'রে কমে গ্যাল, দেখেছো বৌদি ?

মঞ্জুলা : চলো, আমরা এবার যাই।

[বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : ভাসায়ে দিছি। আই এ্যাম সরি, মাদাম! আমার রাজ্যের কোসট্যাল সার্ভিসটা ইমপ্রুভ করতি হবে।

ভাস্কর : (আঘোনীদের) এ্যাখন তোমরা কী করবে ?

বিজন : (জনান্তিকে, মঞ্জুলাকে) এ আবার ভীড় বাড়াচ্ছে, দেখছ বৌদি !

খীরেশ্বর : (ভাস্করকে) কইতি পারি নে সার !

আঘোনী : যোয়াবার বানপানি মোরা সাতদিন উপবাস ছিলম, বাবা। সিবারেই মোর বুড়াটি গত হল।

বৃদ্ধ : তোরা গ্রামের বাস তুলি দি' আমার রাজ্যে থাকি যা। খাজনা-পত্তর দি' সুখেই থাকবি। কোনো ভয় নাই।

আঘোনী : মোর শহুরও বানপানিতেই ময়েরছেন, বাবা।

বিজন : হাঃ হাঃ হাঃ—তিন-তিনটে জেনারেশন !

[মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বলে—]

মঞ্জুলা : হেসো না বিজন। (আঘোনীকে)—তোমার কটা ছেলে ?

আঘোনী : (খীরেশ্বরকে দেখিয়ে) এইটা ছোট ছেইল্যা মা। এ্যাহন এইটাই আছে। মাঝু ছেল্যাটা গ্রহনী হয়্যা মরল, চারি বৎসর হল, এ্যামোনি পানির দিনে। বড়টা মরল পরশু ; পব্বত সমান পানি মা......

খীরেশ্বর : অঁ—মরা নাই হয়ত বা...হারাইলচে—

আঘোনী : আরো এ্যাটটা ছেইল্যা হারাইলচে মা...সেইটা মোর লাতি...এ্যাককেবারে বাচ্চা। পরশু শেষ নিশা ভ্যালা থিক্যা কুথা-যে সরি পড়িল, মোরা জানতিই পারলম না।

[চোখের জল মোছে]

খীরেশ্বর : বড় সোঁত যে !

বৃদ্ধ : বড্ড স্রোত। এই স্রোতে দেশের ভবিষ্যৎও ভেসে যায়।

মঞ্জুলা : এ্যাত্তো বিপদের মধ্যে তোমরা থাকো। (ভাস্করকে)—ও ভাস্কর, তোমরা ইঞ্জিনীয়াররা কিছু করতে পারোনা ক্যানো ?

[আঘোনী ও খীরেশ্বর বাঁদিকে প্রস্থান করে। যেতে যেতে 'বাচ্চাটার যে কী হল' ইত্যাদি বলতে থাকে]

ভাস্কর : তুমি কি মনে করো বৌদি যে, ব্রহ্মপুত্র নদীটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না ? চতুর্দিকে পাহাড়-ঘেরা একটা উপত্যকা। এখানে যতো মেঘ জমে, তার এ্যাকটুকরোও বাইরে যেতে পারে না। তা থেকে, দেশে কতোটা বৃষ্টি

হবে, তার হিসেব নখের ডগায় উঠিয়ে নিতে পারি ; সেইমতো ড্যাম তৈরি ক'রে, জল ধরে রাখতে পারা যায়...নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিজন : তাহলে করছ না ক্যানো ?

[ভাস্কর বিজনের কথার উত্তর না দিয়ে মঞ্জুলাকেই বলতে থাকে]

ভাস্কর : তুমি শুনে অবাক হবে, বৌদি—ফ্লাড কনট্রোল ডিপার্টমেন্টের কোন ড্যাম নেই, ড্যাম সারাবার পয়সা নেই, পাহাড়ে জল ধরে রাখার কোনো চেষ্টা নেই। তারা মেটিরিয়লজিক্যাল স্টাডী করে না ; কী-পরিমাণ মেঘ হয়েছে, তা মাপবার কোন উপায় নেই তাদের, কোনো যন্ত্রই নেই।

মঞ্জুলা : তারা তাহলে করেটা কী ?

ভাস্কর : তারা ?—তারা নদীর পাড়ে-পাড়ে আল বেঁধে দেয়। ব্যস, ওই পর্যন্ত। তা নিয়ে যদি কথা বলো, তাহলে তুমি হচ্ছো আপস্টার্ট, বাক্যবাগীশ।

বৃদ্ধ : অর্থাৎ তোমরা এই উপত্যকায় বাস করার উপযুক্ত না।

ভাস্কর : ব্রহ্মপুত্রের মতো নদীর তীরে যে-জাতি বাস করে, সেই জাতকে তেজী হতে হবে, কর্মদক্ষ হতে হবে, প্র্যাক্‌টিক্যাল হতে হবে।

বৃদ্ধ : আর, তা নাহলে ?

বিজন : নইলে কী ?

বৃদ্ধ : থাম, আমি বলব। নইলে...রেলগাড়ি দেখেছো ?

[খীরেশ্বরের প্রবেশ। নিঃশব্দে সামনের জলের দিকে কিছু একটা দেখতে থাকে]

বিজন : রেলগাড়ি ?

মঞ্জুলা : রেলগাড়ি দিয়ে কী হবে ?

বৃদ্ধ : প্রায় দু'হাজার ট্রিপ্।

বিজন : তার মানে ?

বৃদ্ধ : ষাট লাখ অসমীয়াকে এই উপত্যকা থেকে প্যাক্‌আপ্ ক'রি পাঠাবার জন্যে মাত্র দু'হাজার ট্রিপ দরকার। দিনে পনেরো ট্রিপ্ করি মাত্র ছ'মাস।

ভাস্কর : তার মানে—রিফিউজী ?

বৃদ্ধ : কারণ, তোমরা এই উপত্যকায় থাকার উপযুক্ত না।

ভাস্কর : ঠিক বলেছো। ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর অনেক সভ্যতা বন্যায় ধ্বংস হয়ে গ্যাছে।

[ডানদিকে দেখিয়ে খীরেশ্বর চিৎকার করে ওঠে ; সকলে সেইদিকে তাকায়]

খীরেশ্বর : দাদু ! সেইটা সাপ !...সাপ, সাপ, সাপ...

বৃদ্ধ : সাপ। কুথায় সাপ ?

[মঞ্জুলা খুব ভয় পায়]

মঞ্জুলা : সা—প !
বিজন : কোথায় ? কোথায় ?
খীরেশ্বর : ওই—পানিতে ভাসি আইসচে ।
বৃদ্ধ : এই দিকেই আসছে ।
ভাস্কর : এখানে উঠবে নাকি ?
মঞ্জুলা : অঁ—উঠে পড়েছে যে !

[বাঁদিক থেকে আঘোনীর প্রবেশ]

বিজন : ও বাবা, মস্ত সাপ ! মারো...মারো !
বৃদ্ধ : খবর্দার ! কেউ মারবে নি । জলে ভাসি আসা সাপ কিচ্ছু করবে নি ।
আঘোনী : অয়...অয়...ঈদিকেই আইসচে ।
মঞ্জুলা : বিজ—ন !
বিজন : ভাস্কর !
ভাস্কর : তোমরা ভয় পেও না তো ! স'রে যাও ।
খীরেশ্বর : গাচটাতে উইঠবে বোদয় !

[সকলের অভিনয় থেকে বোঝা যায় : মঞ্চের সামনের ডানদিকের কোণ দিয়ে একটা সাপ ঢুকেছে...গাছের গুঁড়ি অবধি পোঁছেছে । বৃদ্ধ লাফ দিয়ে ডালটায় ওঠে, লাঠি দিয়ে ঠকঠক ক'রে গাছের গায়ে মারে, এবং সামনের বাঁদিকের নেপথ্যের উদ্দেশ্যে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—]

বৃদ্ধ : এখানে না, এখানে না । ওই ঝোপে যাই ওঠ্ বাবা...ওই ঝোপে ।
আঘোনী : যায়...যায় ।
ভাস্কর : ভয় নেই, বৌদি, চলে যাচ্ছে ।

[সকলের অভিনয় থেকে বোঝা যায়—সাপটা সামনের বাঁদিক দিয়ে নেপথ্যে চলে গেছে]

বিজন : মারো না সাপটাকে কিছু একটা দিয়ে ।
বৃদ্ধ : খবর্দার, কেউ মারবে নি, কেউ মারবে নি । লেট্ হিম্ লিভ্ । ও-ও তো—

[কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ মঞ্চের ডানদিকে সম্মুখভাগে স'রে আসে । মঞ্জুলা এতোক্ষণ ধ'রে সমেনের বাঁদিকের নেপথ্যে চেয়েছিল]

মঞ্জুলা : ওই গাছটায় উঠেছে । যদি নেমে আসে ?

[বাঁদিক থেকে সাবিত্রীর প্রবেশ, এলোমেলো চুল]

সাবিত্রী : মা ! মা !
আঘোনী : কী হৈচে ?
সাবিত্রী : ছেইল্যাটার কিবা এ্যাট্টা হৈচে মা । বেগাই আয়েন ।

ভাস্কর : কী হল ? চলো তো, চলো।

[দ্রুত ভাস্কর, খীরেশ্বর এবং সাবিত্রীর বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান। সেইদিকে চেয়ে বৃদ্ধ বলে—]

বৃদ্ধ : এর'ম দৃশ্য অনেক দেখলুম! আমি কী করব? আমি তো কিস্সু করতি পারব না!

[মঞ্জুলা গাছে-ওঠা সাপটার দিকে চেয়ে ছিল]

মঞ্জুলা : আমাদের এবার যাওয়া উচিত ছিল, জানো বিজন! অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে।

বিজন : ভাস্কর আবার ওখানে গ্যাল ক্যানো?

বৃদ্ধ : তোমরা তাড়াতাড়ি যাও বাবা। আমার দ্বীপটার যে ফটো তুলেছো। কাগজে ভালো করে ছাপ্‌য়ে দিও।

[ভাস্কর দৌড়ে আসে]

ভাস্কর : খুব সাংঘাতিক অবস্থা, বৌদি, ছেলেটাকে এ্যাখনই স্যালাইন দেওয়া দরকার।

মঞ্জুলা : কী হয়েছে?

ভাস্কর : শাদা-শাদা পায়খানা, শাদা-শাদা বমি ; ছেলেটার কলেরা হয়েছে।

বৃদ্ধ : কলেরা? কলেরা হয়েছে?

[বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান]

বিজন : কলেরা!

মঞ্জুলা : কী সাংঘাতিক! ওর জার্ম থেকে আমাদেরও তো কলেরা হতে পারে!

বিজন : এই ভাস্কর, কলেরা না গ্যাস্‌ট্রো-এন্‌টেরাইটিস্?

ভাস্কর : (বিরক্ত হয়ে) শাট্ আপ্‌, বিজন! (মঞ্জুলাকে)—ছেলেটাকে আমাদের যেমন করেই হোক, টাউনে নিয়ে যেতে হবে বৌদি।

মঞ্জুলা : আমাদের সঙ্গে?

ভাস্কর : নইলে কিসে?

[আঘোনীর প্রবেশ]

আঘোনী : আমাদিগকে জীবন দান করেন, মা। ছেইল্যাটাকে য্যান-ত্যান-প্রকারে হাসপতালে—

বিজন : কী যা-তা বলছ? কলেরার পেশেণ্ট্‌কে আমাদের লঞ্চে নিতে পারি নাকি?

[মঞ্জুলার মুখ শুকিয়ে যায়]

মঞ্জুলা : চলো বিজন, আমরা যাই, চলো ভাস্কর।

[আঘোনী অতি করুণভাবে মঞ্জুলার কাছে নিবেদন করে]

আঘোনী : ছেইল্যাটা ভেয়াগি যায়েন না মা। মোর স্বামী গে'ল, শহর গে'ল,

পুত্র গে'ল, নাতি গে'ল ; বংশেতে পলিতা জ্বাইলবার আছে এই ছেল্যাটা। তাকে ছাড়ি যায়েন না মা।

ভাস্কর : দাঁড়াও বৌদি, আমি ছেলেটাকে নিয়ে আসছি। এ্যাখনও সময় আছে। স্যালাইন পেলে হয়তো বেঁচে যাবে।

বিজন : শোনো ভাস্কর, আমরা ওকে নিতে পারব না।

ভাস্কর : না পারলে চলবে ক্যানো ? চোখের সামনে মরতে দেখেও ছেড়ে যাবে ? (আঘোনীকে)—চলো, ছেলেটাকে নিয়ে আসি।

[ভাস্কর ও আঘোনী দ্রুত বাঁদিকে যায়]

মঞ্জুলা : ভাস্কর। শোনো!

[ভাস্কর ফিরে আসে]

ভাস্কর : কী ?

[মঞ্জুলা ভাস্করকে হাত ধ'রে অনুনয় করে]

মঞ্জুলা : চলো ভাস্কর, ছেলেটাকে বাদ দাও। যদি আমাদেরও কলেরা হয় ?

ভাস্কর : কী বলছে' বৌদি ! আমাদের ক্যানো কলেরা হবে ?

বিজন : হলে, তখন কী করবে ?

ভাস্কর : হলে, চিকিৎসা করাব। আমরা তো টাউনে থাকি...বাড়ির কাছেই হস্‌পিট্যাল।

মঞ্জুলা : না, না, ওসব কথা বোলো না। চারিদিকে জল, দূরে এ্যাকটা মরা গরু গ'লে পচে দুর্গন্ধ হয়ে আছে। ওদিকে ওই সাপটা এদিকে এ্যাকটা কলেরা পেশেণ্ট—চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

[বিজন ইতিমধ্যে দড়ি খুলতে আরম্ভ করেছে]

ভাস্কর : বাচ্চাটাকে না নিলে আমিও যাব না, বৌদি।

মঞ্জুলা : ভাস্কর, বিরক্ত কোরো না। আমরা যাই চলো।

[বিজন দড়ি খুলে গুটোতে থাকে]

বিজন : চলো, চলো। জল বাড়ছে। লঞ্চটার কিছু হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভাস্কর : তোমরা একটু দাঁড়াও বৌদি, আমি ছেলেটাকে নিয়ে আসি।

[ভাস্কর বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে]

বিজন : বৌদি, চলো, আমরা যাই। ভাস্কর থাকুক।

মঞ্জুলা : ওকে রেখে গিয়ে জ্যাঠাইয়ের কাছে আমি কী বলব ? (চেঁচিয়ে ডাকে)—ভাস্কর !

বিজন : এইরকম ওর সবসময়েই লেগে আছে। সেইজন্যেই তো কারও সঙ্গে মিলে-জুলে থাকতে পারে না। এই নিয়ে ক'বার চাকরিতে রিজাইন দিলে জানো ? এ্যাকটা আপ্‌স্টার্ট !

[ভাস্কর আসে]

ভাস্কর : একটু...আর একটু থাকো, বৌদি। ওরা ছেলেটাকে আনছে। বিজন, দড়ি টেনে লঞ্চটা আরও কাছে নিয়ে এসো তো!

মঞ্জুলা : আমি ছেলেটাকে নিতে পারব না, ভাস্কর। আমারও তো ফ্যামিলী আছে। এ্যাকটা কলেরা রোগী—

ভাস্কর : তাহলে তোমরা যাও, আমি যাব না।

মঞ্জুলা : তুমি যাবে না?

ভাস্কর : না!

মঞ্জুলা : জ্যাঠাইকে আমি কী বলব?

ভাস্কর : বলবে যে ভাস্কর জলে ডুবে মরেছে।...এ্যাতো নিষ্ঠুর তোমরা! ছেলেটাকে আনল ব'লে। (বিজন যাবার উপক্রম করতেই)—খবরদার বিজন, যেতে পারবে না। দড়িটা আমাকে দাও দিকি...দেখি, তুমি ক্যামোন ক'রে লঞ্চ স্টার্ট করো।

[বিজনের হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নেবার জন্যে ভাস্কর থাবা মারে ; কিন্তু তার আগেই বিজন লাফ দিয়ে ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে—]

বিজন : চলে এসো, বৌদি—

[প্রস্থান]

মঞ্জুলা : এসো ভাস্কর...ওঠো।

[প্রস্থান]

ভাস্কর : বৌদি, বৌদি! (লঞ্চ স্টার্ট্ করার শব্দ)—একটুক্ষণ বৌদি। বাচ্চাটাকে হস্‌পিট্যালে নিয়ে যেতেই হবে...স্যালাইন পেলেই ও বেঁচে যাবে, পৃথিবীর বুকে আবার থাকতে পারবে।...একটু দাঁড়াও। (লঞ্চ চলে যাওয়ার শব্দ)—বিজন, লঞ্চটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসো...বাচ্চাটাকে হস্‌পিট্যালে দিতে হবে।...বৌদি!... বি-জ-ন!

[লঞ্চটা চলে যায়, তার শব্দ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যায়। ডানদিকের নেপথ্যে, দূরে তাকিয়ে ভাস্কর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁদিক থেকে খীরেশ্বর প্রবেশ ক'রে মঞ্চ অতিক্রম করে। এবং ভাস্করের পেছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধের ওপর দিয়ে দূরের দিকে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে বলে—]

খীরেশ্বর : চলি গে'ল?

[ভাস্করের সম্বিৎ ফিরে আসে। ধীরে ধীরে বলে—]

ভাস্কর : চলে গ্যাল।

[কিছুক্ষণ দু'জনেই নির্বাক]

খীরেশ্বর : ছেইল্যাটার কী হবে এ্যাহন?

ভাস্কর : বিছানায় শুইয়ে দাও গিয়ে।

[বাঁদিক দিয়ে খীরেশ্বরের প্রস্থান। **আবহ-শব্দে জলের গর্জন**। মঞ্চে ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের সাক্ষী হিসেবে। নিঃশব্দে বৃদ্ধ প্রবেশ করে]

বৃদ্ধ : গ্রীষ্মকালে কোন কোন নদী শুকিয়ে শুকিয়ে মরি যায়। (ভাস্কর ঘুরে বৃদ্ধের দিকে তাকায়)—আমাদের এই উপত্যকায় মানব সভ্যতার নদীটাও শুকিয়ে মরি গ্যাছে। (ভাস্কর বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে)—তাড়াতাড়ি কর্ বাবা! জল বাড়ি আসছে। ভ্যালাটাকে এ্যাখনই ঠিক ক'রি নাও।

ভাস্কর : এই ভ্যালা দিয়ে ছেলেটাকে আমরা বাঁচাতে পারব ?

বৃদ্ধ : কিন্তু তাছাড়া তো অন্য উপায় নাই। জল বাড়ছে ; একটু পরে এই আশ্রয়ও আর থাকবে নি।

[খীরেশ্বরের প্রবেশ]

খীরেশ্বর : দাদু, দড়ি আচে ?

বৃদ্ধ : কী করবি ?

খীরেশ্বর : এ্যাট্টা কলাগাচ খুলি যেচে, বাঁধতি হবে গো।

[ইতিমধ্যে ভাস্কর বাঁদিকে নেপথ্যের পেছন কোণে থাকা ভেলাটা দেখতে থাকে]

ভাস্কর : কলাগাছ আর আছে ?

বৃদ্ধ : কলাগাছ নাই, তবে ভাসি-আসা কাঠ আছে। (খীরেশ্বরকে)—যা না—ওই ঘরটার পেছনে—

[রুদ্ধশ্বাসে আঘোনীর প্রবেশ]

আঘোনী : ছেইল্যাটার চোখ উলটি গ্যাল, বাবা।

ভাস্কর : ছেলেটার অসুখ বাড়ছে।

বৃদ্ধ : জলও বাড়ছে। এই খীরেশ্বর, হাত চালা...হাত চালা। (দূরে সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে)—দূরে, ওই জলের ঢল আসছে।

খীরেশ্বর : দাদু, ওগুলা শ্যাওলা-ঝাঁজী, দ্যাহেন না ?

ভাস্কর : ওকি ব্রহ্মপুত্রের জল নাকি ?

বৃদ্ধ : ব্রহ্মপুত্রের মেয়ের ঢলানি ! এই খীরেশ্বর, ভ্যালাটা তাড়াতাড়ি ঠিক করি নে !

[বাঁদিক দিয়ে খীরেশ্বরের প্রস্থান]

ভাস্কর : ও একলা কি পারবে ? দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।

[বাঁদিক দিয়ে ভাস্করের প্রস্থান]

আঘোনী : ছেইল্যাটার চোখ উলটি গ্যাল বাবা। ঐদিকে মুখে দিবার কিছু নাই—ঔষধ নাই, পথ্য নাই, আনকি—খাবার পানিও এ্যাকফোঁটা নাই, বাবা।

বৃদ্ধ : ও কি জল চাইছে ?

আঘোনী : তার মুখে কথা নাই বাবা। ওঁঠ দুইটা শুকাই যেচে, চোখের কোলে কালি পড়ি যেচে, ফুলা-ফুলা গাল-দু'খান চেপেটা হয়্যা বুড়া মানুসের মতন হৈ যেছে।

বৃদ্ধ : হঁ্যা—চার বছর বয়সেই ও বুড়ো হয়ে গ্যাল!

আঘোনী : তার ওঁঠ কয়টা এ্যাকেবারে শুকাই গ্যাল বাবা! তাকে এটটু পানি দিতি হয়। বৌটিরও মাথা খারাপ হৈ গ্যাল; সেও কিবাখান করতিচে। সি ছেইল্যাটার মুখে বুকখান গুঁজি গুঁজি দিচে...কৈচে—তোকে মুই বাঁচাবই বাঁচাব। মুই—তোকে যমের ঘর থিক্যা ফিরাই আইনব।

[আঘোনী কাঁদতে থাকে। ভাস্করের প্রবেশ]

ভাস্কর : হয়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে। ওই কাঠটা বাঁধা হলেই আমরা স্টার্ট করতে পারব। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি করো। জল বেড়ে আসছে। একটু পরেই এ-দ্বীপ ডুবে যাবে।

আঘোনী : এইখান ভ্যালাতে মোরা ডাক্তারখানা পাইব, বাবা?

ভাস্কর : চেষ্টা করব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। ও দাদু, চলো, চলো। ভ্যালায় ওঠ।

বৃদ্ধ : আমি যাবনি।

ভাস্কর : যাবে না?

বৃদ্ধ : আমি গেলি আমার রাজ্যটা চালাবে কেটা?

ভাস্কর : দেখছ না, জল কিভাবে বাড়ছে? একটু পরে তোমার রাজ্যও ডুবে যাবে।

বৃদ্ধ : বন্যার সাধ্য কি আমার রাজ্য ডোবায়? এ-দ্বীপ ছাড়ি আমি যাবনি।

ভাস্কর : কিন্তু দ্বীপটা ডুবে গেলে তুমি থাকবে কি ক'রে?

বৃদ্ধ : গাছে উঠি পড়ব। আমার সব জমি রেভিনিউ-সেলে গেছে—গাছটাতো আছে!

[খীরেশ্বরের প্রবেশ]

খীরেশ্বর : হৈ গেল। রসিটা খুলতি হবে।...মা, বলচ। বৌদিদিকে, বাচ্চাটাকে তুলি চল্ গিয়া।

আঘোনী : চল চল বাপা।

[ঠিক এই সময়ে নেপথ্যে সাবিত্রীর আর্তনাদ শোনা যায়—]

সাবিত্রী : মা!...মোর বাচারে-এ!

[সঙ্গে সঙ্গে আঘোনী পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে যায়]

ভাস্কর : কী হল? কী হল?

খীরেশ্বর : কিবা হল—আঁ?

বৃদ্ধ : হয়ে গ্যাল নাকি?

[কথাগুলো প্রায় একসঙ্গে ব'লে তিনজনে অতি দ্রুত বাঁদিকে চলে যায়। মঞ্চের ডানদিকের মাঝখানে আঘোনী স্থির দাঁড়িয়ে থাকে।—তার মধ্যে যেন হাজার বছরের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। মঞ্চে অন্য সমস্ত আলো কমে যায়, শুধু আঘোনীর দেহের ওপর সামনে থেকে আলো পড়ে, শাদা কাপড় চকচক করতে থাকে। আবহে দ্রুত করুণ সংগীত। তার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্না-কাটি জড়িয়ে-মিশিয়ে শোনা যায়, এইভাবে—]

সাবিত্রী : (নেপথ্যে) বাচা, মোর বাচা...চোক মেলি চা মোর...

খীরেশ্বর : পানি...পানি

বৃদ্ধ : প্রাণ যায়নি মনে হচ্ছে—

ভাস্কর : পালস্ আছে...দ্যাখো—

[সাবিত্রীর প্রবেশ। উন্মাদিনীর মতো অঘোনীকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

সাবিত্রী : ছেইল্যাটাকে বাঁচাই দিয়েন মা! সে নহলে মুই ক্যামনে বাঁচি থাকি! মা!—মা!...মা!...

[আঘোনী নিশ্চল। সাবিত্রীর কথাগুলো যেন তার কানে প্রবেশ করেনি। আবহ-শব্দে একটা একটানা কান্না যায়। দ্রুত পদক্ষেপে বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : বেঁচে আছে...বেঁচে আছে!

সাবিত্রী : বাঁচি আচে?

বৃদ্ধ : বেঁচে আছে...বেঁচে আছে!

সাবিত্রী : বাঁচি আছে?

বৃদ্ধ : বেঁচে আছে। তুই মিছাই ভয় পেয়েছিলি।

সাবিত্রী : দাদু! মুই তাকে যমের ঘর থিক্যা ফিরাই আন্তি পাইরব নি?

বৃদ্ধ : পারবি। পারবি···ক্যানো পারবি নি? তোর নাম না সাবিত্রী?

সাবিত্রী : মোর বাচা রে···

[দৌড়ে চলে যায়]

বৃদ্ধ : তুমি এখানে এ্যাকা-এ্যাকা কী করছ, মা? ভ্যালাতে গৈ ওঠো, যাও।

[আঘোনী এতক্ষণে যেন চেতনা ফিরে পেল। আস্তে আস্তে বলে—]

আঘোনী : ছেইল্যাটা বাঁচল নি বাবা?

বৃদ্ধ : বেঁচে আছে। তাড়াতাড়ি করো। এক মুহূর্তও দেরি না।

আঘোনী : ঈ অথৈ পানির মাঝে, বিধবা বৌ, রুগী ছেইল্যা—সব বাঁচবে বাবা?

বৃদ্ধ : বাঁচাতি হবে!...এই আমাদের দেশ। চারিদিকে বন্যার জল, তার মধ্যে মরণমুখী ভবিষ্যৎ, বিধাতা বর্তমান—আমাদের দেশকে আমাদের বাঁচাতিই হবে।

[খীরেশ্বরের প্রবেশ]

খীরেশ্বর : মা, চল্, চল্, উঠি আহ্!...দাদু!

বৃদ্ধ : আমাকে ছাড়্। ভ্যালায় অতো লোক ধরবে নি, ডুবি যাবে।...তোরা তাড়াতাড়ি কর...তাড়াতাড়ি কর...জল ফুলি-ফুলি বাড়ছে। ওই শ্যাওলা-ঝাঁজীটা দেখছিস্ নি' স্রোতের মুখে কির'ম হু-হু ক'রে ভাসি গ্যালো!

[খীরেশ্বর ও বৃদ্ধ মঞ্চের সম্মুখভাগে ; আঘোনী পশ্চাৎভাগে]

খীরেশ্বর : ওই কাঠখান দেহিচেন দাদু ?

বৃদ্ধ : আমার একমাসের রান্না চলি যাবে। শুধু রাঁধবারই কিছু নাই !...এই বানের জল, খবর্দার, আর এক পা-ও আগে বাড়াবি নি, এক পাও আসবি নি...

[নেপথ্য থেকে ভাস্করের চিৎকার শোনা যায়]

ভাস্কর : ও দাদু ! দড়িটা আলগা করে দাও।

বৃদ্ধ : দিচ্ছি, দিচ্ছি। খীরেশ্বর...খোল্ না।

[খীরেশ্বর দড়ি খুলে বৃদ্ধের হাতে দেয়]

খীরেশ্বর : দাদু, ধরেন—

বৃদ্ধ : তোরা ওঠ্ গিয়ে, যা, ওঠ্। দেরি করিস না।

আঘোনী : আইজ ঈশ্বরেই আমাদিগকে আপোনার হেথা আশ্রয় দিয়াইচিল, বাবা!

বৃদ্ধ : এ্যাখন দেখলে তো, সেই আশ্রয় পুরোই মিছা—এ্যাকেবারে অস্থায়ী ! সময়ের স্রোতে আমার এই দ্বীপও গ্যাল ব'লি...একটু পরেই ডুবি যাবে। যাও...তাড়াতাড়ি করো...ভ্যালায় গৈ ওঠো তোমরা—কুইক্ !

[খীরেশ্বর ও আঘোনী বাঁদিকে যায়। আবহ-শব্দে জলের গর্জন। বৃদ্ধ দড়ি টেনে ধরে আছে। হঠাৎ কী মনে পড়ায় বাম-নেপথ্যে তাকিয়ে চেঁচায়]

বৃদ্ধ : এই খীরেশ্বর, এই !

[দৌড়ে খীরেশ্বরের প্রবেশ]

খীরেশ্বর : দাদু !

[বৃদ্ধ একহাতে দড়ি ধরে থকে, অন্যহাতে দশ টাকার নোট তিনখানা খীরেশ্বরের হাতে গুঁজে দেয়]

বৃদ্ধ : এই টাকাগুলো নিয়ে যা।

খীরেশ্বর : (খীরেশ্বর বিস্মিত হয়) দাদু, এয়া আপোনার পইচা!

বৃদ্ধ : (ধমকে ওঠে) নিয়ে যা—আর কথা ঝাড়তি হবে নি। এই জলের মাঝখানে টাকা দি' আমি ক'রবটা কী ?

খীরেশ্বর : দাদু !

বৃদ্ধ : জলের ঢল ওই আসছে। যা, যা, ওঠ গিয়া। টাকা ক'টা হাসপাতালে কাজে লাগবে, যা।

[খীরেশ্বর দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধ দড়িটা টেনে ধরে থাকে। নেপথ্যে ভেলাটা হাবুডুবু খাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে বৃদ্ধ চিৎকার করে]

—সাবধান, সাবধান। দড়ি ধরি থাকবি। খীরেশ্বর—বৈঠেটা ঠিক করি নে—আমি ছাড়ি দিচ্ছি...দেখিস্—

[দড়ি ছেড়ে দেয়। এবার বৃদ্ধ দূরের দিকে চেয়ে চিৎকার করে]

—ভয়ংকর স্রোত...ভালো ক'রি ধ'রি থাকবি...নইলে, এটাও পড়বে...ব্রহ্মপুত্রের মেয়ের ঢল !...একেবারে মুখের সামনে পড়লি যে তোরা।

[হেলিকপ্টারটা আবার আসে]

—এই হেলিকপ্টার, গেলিনে এখান থেকে, গেলিনে? আমার এয়ারস্পেসে ঢুকেছিস ক্যানো? পারমিশন নিইছিলি? গেট আউট!

[কাছে এগিয়ে-আসা জলরাশির দিকে চেয়ে]

—এই বানের জল, খবর্দার, আর বাড়বি নি। এক পা আগোলেই এই বুড়োই শিক্ষা দি' দেবে বাগাকে।...খবর্দার! আমার দ্বীপটাকে তোরা ধাক্কা দিচ্ছিস ক্যানো? এ্যাকেবারে তলাই দিবি নাকি?

[আবার হেলিকপ্টারের শব্দ। ওপরদিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ চিৎকার করে]

—রেভিনিউ—রেভিনিউ—রেভিনিউ! এই রেভিনিউ মিনিষ্টার! দেখছো নি, রেভিনিউ-সেলে আমার (চতুর্দিক দেখিয়ে)—সব জমি চলি যাচ্ছে?

[বন্যার জল এগিয়ে এসে গাছের গুঁড়ি স্পর্শ করে। বৃদ্ধও স'রে স'রে গিয়ে গাছের গুঁড়িতে ওঠে]

—আগায়ে আসছিস ক্যানো? তোরা আগায়ে আসছিস ক্যানো? আর একপাও এগোবি নি। তোদের এনট্রি-ট্যাকস্ দিতি হবে। এটা আমার রাজ্য, আমার দ্বীপ...এখানে কারও রাইট নাই...

[আবার হেলিকপ্টারের শব্দ। বৃদ্ধ গাছে উঠে চিৎকার করে]

—এই হেলিকপ্টার—গেট আউট...গেট আউট—

[নীচে তাকিয়ে, জলকে]

—ওই বানের জল, পিছায়ে যা...পিছায়ে যা...গো ব্যাক...গো ব্যাক...গো ব্যাক—

[মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে যায়। বৃদ্ধ একবার বন্যার জলকে, একবার হেলিকপ্টারকে গালি দিয়ে-দিয়ে স্থির হয়ে যায়। একটা মূর্তিতে পরিণত হয়। প্রায়-অন্ধকার মঞ্চে পেছনদিক থেকে একটুকরো আলো এসে বৃদ্ধ এবং গাছটিকে সিলুয়েট করে দেয়। আর একখণ্ড আলোয় দেখা যায়—মঞ্চের মাঝখান দিয়ে শ্যাওলার ঝাঁজী কয়েকটা দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। পট পড়ে]

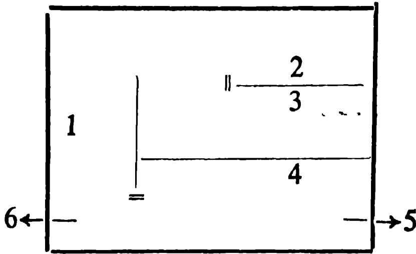
দৈনন্দিন

দুর্গেশ্বর বড়ঠাকুর

চরিত্রাবলী ঃ

ধীরেন—স্বামী
কমলা—স্ত্রী
গণেশ—চাকর
এবং জনৈক আনাজওলা

মঞ্চ



1 শয়নঘর
2 রান্নাঘর
3 রান্নাঘরের বারান্দা
এখানে টেবিলে খাওয়া-দাওয়া হয়
4 চাতাল
5 বাইরে যাওয়ার দরজা
6 ঘরের ভেতরে যাওয়ার দরজা

বিঃ দ্রঃ—শোবার ঘর এবং রান্নাঘরের ভিৎ চাতাল থেকে প্রায় দেড় ফুট উঁচু। দর্শক সাধারণত শোবার ঘর, বারান্দা এবং চাতালের ঘটনা দেখতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক ঃ

অপ্রকাশিত। মূলস্বত্ব—মহেন্দ্র বড়ঠাকুর, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, গৌহাটি-৩। বড়ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ' নামে প্রহসন প্রকাশিত হয়েছে। এঁর হাস্যরসাত্মক রেডিও-নাটক বেশির ভাগই অপ্রকাশিত রয়েছে।

[দৃশ্য আরম্ভ হয় এইভাবে : ধীরেন বাইরে থেকে খুব হাসিখুশী হয়ে প্রবেশ করে। শোবার ঘরে পরনের শার্ট খুলে চাতালে এসে হাতমুখ ধোয়। তারপর, ঘরে, ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে মাথা আঁচড়ায়। স্নো এবং সেন্টের শিশির খোঁজে টেবিলের ড্রয়ার টানে। এবং তার ভেতরের জিনিসগুলো এলোমেলো করে ফেলে। এই সময়ে কমলা প্রবেশ করে]

কমলা : ইস্‌স্‌! আজ ধরা পড়লে তো! (এই একই সময়ে রান্নাঘরের বারান্দায় গণেশ কিছু একটা মুখে পুরছিল। কমলার কথা শুনে—তাকেই বলা হচ্ছে মনে করে রান্নাঘরের ভেতর চলে যায়)—রোজই ভাবি, জিনিসগুলো আমি গুছিয়ে রেখে রেখে যাই, আর এলোমেলো করে দেয় কে? আজ বুঝতে পারলুম।

ধীরেন : এই, ওভাবে বোলো না, লক্ষ্মীটি। আমি ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে হাত দিয়েছি ব'লে সব দোষ আমারই ঘাড়ে চাপিও না তো! স্নো তো আমি মাখিই না। শুধু যেদিন দাড়ি কামাই, সেইদিনই একটুখানি নিই—তাও আয়নায় পুরনো ব্লেড ঘষার দরকার হলে। ব্লেড নতুন থাকলে তো কথাই ওঠে না!

কমলা : ওঠে; কথার পিঠেই কথা ওঠে। স্নো যদি মাখোই, তবে আনতে বললে আমার সঙ্গে ঝগড়া করো ক্যানো?

ধীরেন : ওসব ছাড়ো দিকি। শিশিটা কোথায় আছে, দাও।

[কমলা ড্রয়ার খুলে স্নোর শিশিটা বার করে দেয়]

কমলা : এই যে। (ধীরেন আঙ্গুলের ডগায় স্নো নেয়)—ওরে বাবা! ওভাবে খাব্‌লে নিলে কদিন যাবে?··· বাঃ, সেন্টের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করছে! শিশিটা কোথায় রাখলে? বড্ড রাগ হয় এইভাবে ছিপি না-এঁটে রাখলে।... তা, আজ হঠাৎ এতো সাজের ঘটা কেন?

ধীরেন : আচ্ছা, বলো তো—একটু আগে আমি কোথায় গিয়েছিলুম? ক্যানো গিয়েছিলুম?

[আলনা থেকে নিয়ে একটা শার্ট পরে]

কমলা : থাক, কথা ঘোরাতে হবে না।

ধীরেন : কথা ঘোরাতে চাইছি না। তোমার প্রশ্নের উত্তর বার করার জন্যেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

কমলা : কোথায় আবার যাবে? উঠ্‌নো-দোকানে গিয়ে সুপুরি চুরুট, এইসব খেলে বোধহয়।

ধীরেন : হল না। গেল মাস থেকেই উঠ্‌নো-দোকান আমার সুপুরি চুরুট বন্ধ করেছে। বলো, আমি কোথায় গেছলুম?

কমলা : আমি তো তোমার পেছনে-পেছনে ঘুরে বেড়াই না।

ধীরেন : তাহলে শোনো। কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি যে আমাকে একঘণ্টা ধ'রে লেকচার শোনালে, মনে আছে?

কমলা : মিছে কথা বলেছি নাকি? জোনাদিদি একবার না, দু'বার আমাদের খেতে নেমন্তন্ন করলে, ওদেরও অন্তত একবার খাওয়ানো আমাদের উচিত নয় কি?

ধীরেন : There you are! তোমার এই কথাগুলো নিয়ে কাল সারারাত, আজ সকাল, দুপুর আমি একনাগাড়ে চিন্তা করেছি, বুয়েচ? শেষে ভেবে দেখলুম, কথাটা সত্যি। আবার অন্য দিকে ভাবলুম—ধরো, জোনাদিদিকে যদি আমরা একবারও না খাওয়াই বা খাওয়াতে না পারি, তাহলে বা কী হবে? তিনি কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে ব'লে বেড়াবেন নাকি? কিন্তু তাঁকে একবার খাওয়ানোর জন্যে আমাদের এতো চিন্তাইবা করতে হচ্ছে ক্যানো? তারপরে ভেবে দেখলুম, এসব কোন যুক্তিই খাটে না। এসব হল লোকলজ্জার কথা, বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের।

কমলা : বেশ, তাহলে ডাকার দরকার নেই।

ধীরেন : দাঁড়াও, দাঁড়াও। রাগ করছো ক্যানো? এসব আমার মনেই উদয় হচ্ছিল। কার্যক্ষেত্রে তা তো করতে পারব না; আর তা আমি করবও না। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে গেলে, জোনাদিদিকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্যেই একটু আগে আমি বেরিয়েছিলুম।

কমলা : অর্থাৎ— ?

ধীরেন : অর্থাৎ—কুড়িটা টাকা ধার করে আনলুম।

কমলা : কার কাছ থেকে?

ধীরেন : সেই যে গেল হপ্তায় যে-লোকটা ধারের তাগাদা দেওয়ার জন্যে এসেছিল, আর আমাকে না পেয়ে, 'এমনি এসেছিলুম' ব'লে তোমাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেছল!

কমলা : ছিঃ ছিঃ, আবার তারই কাছে চাইতে গেছলে?

ধীরেন : না গিয়ে উপায় কী?

কমলা : আমি জানতে চাইছি—তুমি চাইলে কোন মুখে?

ধীরেন : অভাবই আবিষ্কারের মূল ব'লে একটা কথা আছে না? সেই সূত্র অনুযায়ী, সোজা গিয়ে গড়গড় করে বলে দিলুম—'শইকীয়া, আপনি বোধহয় ইতিমধ্যেই লোকের কাছে আমার বদনাম গাইতে শুরু করে দিয়েছেন। তা দিন, আমার আপত্তি নেই। কারণ প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটা শেষ আছে।'—শইকীয়া তো হা। ওদিকে গলগল করে আমি বলে গেলুম—'দেখুন শইকীয়া, ঈশ্বর আপনাকে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি দিয়েছেন। আমার মতো দশটা ধীরেনও যদি আপনার ধার শুধতে না পারে। আপনি কি গভীর গহ্বরে পড়বেন, বলুন তো?'—শইকীয়া কী বললে, জানো?

কমলা : কী?

ধীরেন : বললে—'বরুয়া, আপনি এতো সিরীয়াস হচ্ছেন ক্যানো ?' আমি বললুম—'সিরীয়াস হবো নাই বা ক্যানো ? আজ আমার আরও কুড়িটা টাকা ধার চাই, আর সে টাকা আমি আপনার কাছ থেকেই নোব।' এর পরের শইকীয়া যদি পকেট থেকে চট ক'রে কুড়িটা টাকা বা'র ক'রে আমাকে দেয়, তাহলে আমার স্ফূর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ হবে কিনা বলো ?

কমলা : (হেসে) হবে।

ধীরেন : সেণ্ট মাখব না মাখব না ?

কমলা : স্ফূর্তিতে কি সেণ্টই লাগায় গো !

ধীরেন : তবে কি মনের দুঃখে মানুষ সেণ্ট ঘষে ? তুমি কেঁদে কেঁদে স্নো-সেণ্ট মাখো নাকি ?

কমলা : খালি কথা ঘোরানো ! কোথায় যাবে, তা বলছ না কেন ?

ধীরেন : এই—একটা বিয়েতে যাবার কথা আছে।

কমলা : তাই বলো। কার ?

ধীরেন : আমাদের অফিসের শর্মার।

কমলা : ভাগ্যিস জিজ্ঞেস করলুম, তাই বললে ! নইলে তো আমি ধরতেই পারতুম না। স্ত্রীলোক হয়ে জন্মেছি বলে একথাটাও জানতে পারব না ?

ধীরেন : ওইতো, মুখখানা হাঁড়ি হয়ে উঠল ! তোমাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করেনি, তাই আমিও তোমাকে আর বলি নি ! এই লোকগুলো যে কী ! হ্যাঁ—বিয়ের জন্যে ডাকছিস তো ঘরের মেয়েদের আগে ডাক ; আমাকে ডেকে লাভ কী ? একপাত খাব, আর চলে আসব !

কমলা : আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে।

ধীরেন : হয় নি !...বিয়ের আসরে মেয়ে-বৌরা থাকলে দেখতে, আজ্ঞে, ভালোই লাগে।

কমলা : স্নো-পাউডার মাখা হয়েছে তো, এইবার যাও দিকি !

[কমলা চাতালে চলে যায়। বাইরে, তারে মেলে দেওয়া কাপড়চোপড় তুলতে থাকে। কাপড নিয়ে শয়নঘরে আসে। এই আসা-যাওয়া কাপড় রাখার মধ্যে দুজনের সংলাপ চলতে থাকে]

ধীরেন : শোনো, বিশ্বাস করো। তোমাকে নিয়ে ঘুরতে, বিয়ের নেমন্তন্নে যেতে, এ তো আমি সবসময়েই চাই। কিন্তু বিয়েতে যদি না বলে, কি করি বলো ?

কমলা : সত্যিই বলেছিল কিনা, কে জানে !

ধীরেন : ওরকম বলছো কেন ? ডাকলে, তোমাকে সঙ্গে নিতুম না ?

কমলা : সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে প্রেজেণ্ট-টেজেণ্ট একটা দিতে হবে, সেই ভয়েই তুমি আমাকে বিয়েতে নিয়ে যাচ্ছ না। সত্যি কথা বলতে এ্যাতো কৃপণতা কেন ?

ধীরেন : এবার দেখছি, বিয়ের খাওয়া ঘুচে গিয়ে বিষই খেতে হবে।

কমলা : তাতো বটেই, আমি কথা বললেই বিষ! আমার সঙ্গে কোথাও যাবার সময় স্নো-সেন্ট মাখা তো দূরের কথা, দাড়িগোঁফও কামাও না, ভালো জামা-কাপড়ও পরো না।

ধীরেন : এইবার যদি আমার মুখ খুলি, তাহলে খুবই খারাপ হবে, দেবী!

কমলা : উত্তর খুঁজে না পেলেই তুমি ওই কথা বলো।

ধীরেন : যখন-তখন বেড়াতে বেরোলে ভালো জামা-কাপড় আমি পাই কোত্থেকে? সেদিনের মতো ধোপা তো আর রোজ রোজ আমার পরার জন্যে অন্যলোকের টেরিকট-জামা ভুল করে রেখে যায় না! আর, দাড়ি কামাবার কথা বলছো? শনিবারে আমি, অন প্রিনসিপল, দাড়ি কামাই না; আর তুমি বেড়াতে বেরোবে প্রায়—শনিবারেই!

কমলা : শনিবারে না বেরিয়ে কোন্‌বারে বেরোব? অন্য সব বারে তুমি তো ফেরো ছটা কি সাতটা বাজলে। অফিসে কাজ কি তুমিই একা করো নাকি?

ধীরেন : একা আমার নয়, আজকাল সব চাকরেদেরই অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়—বিশেষ ক'রে, যাদের ঘরে আমার বৌয়ের মতো বৌ আছে।

কমলা : হবেই তো। কাজ না ক'রে ব'সে ব'সে আড্ডা মারলে কার দেরি হবে না? তাড়াতাড়ি কাজ শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম—এসব তোমাদের কুষ্ঠীতে লেখে নি।

ধীরেন : শোনো শ্রীমতী! সরকারী চাকরীই হোক, কি, বেসরকারী চাকরীই হোক, অফিসটা তোমার বাড়ি নয়। আমাদের ইচ্ছের ওপরে অফিস চলে না। সেখানে কাজের একটা নির্ধারিত নিরিখ আছে, একটা সময় আছে।

কমলা : বাঃ বাঃ, নির্ধারিত কাজ ক'রে ক'রে দেশকে একেবারে তুলে ধরেছো। আর আমরা, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাচ্চার নোংরা পরিষ্কার, পাল-পোষ ক'রে মরি। তার ভেতরে আবার আত্মীয়-কুটুমের আসা-যাওয়াও আছে। তা হ্যাগো, তোমরা কি দশটা থেকে রাত পর্যন্ত লাগাতার কাজই করতে থাকো?

ধীরেন : নাতো! কোন কোন দিন চারটে বাজতেই কাজ খতম হয়ে যায়।

কমলা : তাহলে চারটের সময় ঘরে আসো না কেন?

ধীরেন : সে তো বললুম!—কাজ শেষ হয়ে গেলেও অফিসের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সেটাই অফিসের ডিসিপ্লিন।

কমলা : সেটা আবার একটা ডিসিপ্লিন নাকি? বিনা কাজে দেড়-দু'ঘন্টা অফিসে বসে আড্ডা মারাটা ডিসিপ্লিনই নয়, দেব্‌তা!

ধীরেন : আড্ডা মারি, কে বললে?

কমলা : তাহলে সময় কাটাও কি ক'রে?

ধীরেন : সেইটুকু সময় আমার একেবারে নিজস্ব। তাতে থাকো তুমি, আমাদের বাচ্চাটা, কুড়ি-টাকা মাইনের চাকর, রান্নাঘর, বাজার, উঠ্‌নো-দেওয়া দোকানী,

আনাজওলা, আর ডাক্তার। অর্থাৎ, ঘরের কথা ভেবেই সেই সময়টুকু আমি কাটিয়ে দি'।

কমলা : অফিসে ব'সে ওভাবে বাড়ির কথা সত্যিই যদি ভাবতে, তাহলে আজ আর এই অবস্থা হত না।

ধীরেন : দ্যাখো কমলা! টাকা-পয়সা খরচ না ক'রে যেসব কাজ করতে পারা যায়, তার মধ্যে চিন্তাটাই হল পয়লা নম্বর। তবে, আমি ভাবি ব'লে আমাকে ঠাট্টা করছ কেন? চিন্তা হচ্ছে স্বর্গীয় বস্তু!...এই কালই তো, একটা বাড়ি তৈরির কথা ভাবছিলুম! ভাবতে আপত্তি কি? হয়তো একটা বাড়ি তৈরি আমার সারা জীবনে নাও হতে পারে—

কমলা : শুনে, বড় ভালো লাগছে। বলো না গো, অফিসে এইরকম আর কী কী ভাবো?

ধীরেন : ভাবছিলুম—তোমার ইংরেজী ম্যাগাজিন কেনার মাত্রাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা? ভাবি—এসব আমাদের পক্ষে বিলাসের সামগ্রী না জ্ঞানের ভাণ্ডার!

কমলা : কী বলতে চাও, খোলাখুলি বলছ না কেন?

ধীরেন : ভাবছিলুম—এই যে তুমি, ওইসব ম্যাগাজিনের একখানা দেখে দেখে আড়াইশো গ্রাম উৎকৃষ্ট ঘী, দুটো আণ্ডা, দুচাম্‌চে দৈ, একশো গ্রাম কিসমিস, অতি অল্প ভিনিগার, কতিপয় কালো মরিচ ইত্যাদি সহকারে নতুন নতুন, রুচিকর কী-সব বস্তু তৈরির চেষ্টা করো; এবং অবশেষে, সেই যে পাতলা মতো বস্তুটা শক্ত হয়ে যায়, আর শক্ত মতোটা হয়ে যায় চিট্‌চিটে! তাই থেকেই আমি ভাবতে লাগলুম—আমাদের দেশেই হিংচে-কলমী-নরসিংহ-নটে এই যেসব শাকসব্জী-গাছগাছড়া আছে, তা-ই যদি হপ্তায় দুদিন খাই, তাহলে একদিকে ডালের খরচটাও যেমন কমে, তার সঙ্গে সঙ্গে, কি জানি, হয়তো বা, পেটের পুরনো ব্যাধিটারও বোধহয় অন্ত্যেষ্টি হয়!

কমলা : বুঝলুম। তার মানে, তোমার পেটের অসুখের জন্যে দায়ী হলুম আমি? বিয়ের আগে তোমার যে চেহারাটা ছিল, এখনও আমার চোখের সামনে তা ভাসছে। মেসে কী খেতে, খুব জানা আছে—ভাত-ডাল-ভাজা, ভাজা-ডাল-ভাত! এক থোকা লংকা দিয়ে রাঁধা লাল-লাল তরকারী খেয়ে অসুখটা নিজেই বাঁধালে, এখন দোষ পড়ল আমার ঘাড়ে।...ঠিক আছে, আজ থেকে আর রান্নাঘরে ঢুকছি না।

[কাঁদে]

ধীরেন : মাই গড! কাঁদছ কেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই, শোনো না। আমার কথা আমি উইথ্‌ড্র ক'রে নিচ্ছি। শোনো, পেটের অসুখ আমার মেসের অবদান। তোমার রান্না খেয়ে আমার কোন অসুখ হয়নি। এই, শুনছ? বিয়ের

আগে আমি ছিলুম লিক্‌লিকে রোগা। হ্যাঁ। বিয়ের পরে খুব পুরুষ্টু হয়ে গেলুম, আমার ওজন বাড়ল, এক মণ দশ সের হল। এই—

[চাতাল থেকে গণেশ ডাকে—]

গণেশ : বহুদিদি! আনাজওলা এসচে।

[আবার বাইরে চলে যায়]

ধীরেন : হ্যাঁগো, শুনছো—আনাজওলা এসেছে।

কমলা : তুমিও তো শুনেছো!

ধীরেন : আনাজ তো বরাবর তুমিই নাও!

কমলা : ও আজ পয়সা নিতে এসেছে।...আজ দোব, কাল দোব ব'লে ব'লে আজ সাতাশ তারিখ হয়ে গ্যালো। ওর কাছে আমি মুখ দ্যাখাতে পারব না। দুমাসের আশী টাকা হয়েছে; অন্তত, গোটা পনেরো টাকা তো দিতে হয়।

ধীরেন : দ্যাখো—ট্যাঁরাব্যাঁকা কথা বোলো না। দশ থেকে কুড়ি বিয়োগ যদিও বা করতে পারি, এ্যাতো মোটা ধার ঘাড়ে চাপিয়ে ঘুরতে আমি পারি না।...যাও, ওকে যা হোক এ্যাকটা বুঝিয়ে দিয়ে এসো তো!

কমলা : আমি পারব না। গণেশকে বলো—পারে যদি, গিয়ে ওকে বোঝাক।

ধীরেন : ঠিক আছে।...গণেশ!—

গণেশ : (বাইরে থেকে) বাবু—!

ধীরেন : এদিকে আয়।

[ধীরেন দরজার কাছে বেরিয়ে আসে। গণেশ এসে চাতালে দাঁড়ায়]

—হ্যাঁ, এ্যাকটা কথা বলছিলুম।...তোর কাছে কী আর লুকোব!—তুই তো আমাদের ঘরেরই এ্যাকজন।

গণেশ : হাঁ, বাবু!

ধীরেন : তাহলে—এই সংসারের জন্যে তোর বৌদিদি আর আমি যেভাবে চিন্তা করি, তোকেও কি সেইভাবে করতে হয় না?

গণেশ : কেনে হবেক নি বাবু? আমি তো সব্বদাই ভাবি—ক্যামনে আপনার আর ভাইটির জামা-কাপোড় কেচে ধবধবে শাদা করতে পারি? সেদিন, জানেন, আপনার গেঞ্জি ধুবার জন্যে আমি নিজের পইসায় সাবুন কিনে আনছি। আপনাদের না থাকা সময়ে কোনো অতিথি-সজ্জন আসলেও আমি খালি মুখে ফিরৎ পাঠাই না। নিজের ঘর বুলি না-ভাবা হলে আমি এ্যাতোসব করি নাকি? পিরতিবেশিরাই বলেন—আমি আপনাদের পর ভাবি কিনা!...এই আজই... পরভাতের কথাই ধরেন—চিনি নাই!...আমি কি আপনাদের কদাপি বিনা-চিনি চা খাওয়াইসি? বলেন—?

ধীরেন : না, খাওয়াস নি।

গণেশ : কতো কারসাজি ক'রে চিনি জুটাইছি, আপনারা কী বো'ঝচেন ? তবে, আমি যাকে-তাকে এইসব জিনিস চাইস্‌না। আসল ঠাঁইতেই যেছি।

ধীরেন : কোথায় ?

গণেশ : সেই উঁয়াদের ঘরে।

কমলা : কী ব'লে চাইলি ?

গণেশ : মোব চাই বুলি কৈলম।...বললম—আমাদের কার্ডের চিনি গতকাল সাঁঝ্‌ব্যালায় মোর আনার কথা ; কিন্তু ভুলি গলম। এ্যাহনই বাবু উইঠবেন ; আমি ক্যাম্‌নে চা দি ? দেহি, দে তো চিনি এ্যাক কাপ...সন্‌ঝে্‌ব্যালায় শোধ দুব।

ধীরেন : এই কথা বলতেই দিয়ে দিলে ?

গণেশ : না দি' পারে নাকি ? সেও কি মোর থিক্যা চা'ল তিন কৌটা লয় নাই ? স্টোভ জ্বালাবার জন্যি দিয়াসালাই নি' সে সব্বদাই আধা-কাঠি রেখে দেয়।

ধীরেন : বুঝেছি। তুই যখন, আমাদের অনুপস্থিতিতে, ঘরের ছেলের মতো অতিথি-সৎকার করিস্‌, আমাদের কাপড় কাচার জন্যে সাবান কিনিস, পরের চিনি দিয়ে আমাদের চা খাওয়াস, র‍্যাশনের চাল দিয়ে কুটুম্বিতে করিস— তখন তুই এ-কাজটাও পারবি।

গণেশ : ক'ন বাবু,...পারব।

ধীরেন : এই আনাজওলাটাকে পয়সা দিতে হবে। আমার হাতে এ্যাখন পয়সা আছে কি নেই, তুই তো জানিসই।

গণেশ : পইসা থাকলে, আমি দুইমাস বিনা-বেতনে থাকতম নাকি ?

ধীরেন : এ্যাখন তোকে ..ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে। পারবি না ?

[নেপথ্য থেকে আনাজওলা হাঁক পাড়ে]

আনাজওলা : (নেপথ্যে) মাইজী !

গণেশ : এইটাই খুব মুশকিল হ'ল বাবু। সে তো আমাকে কেয়ারই করে না। বাছি-বাছি ভালো আলুগুলা নেওয়াতে সেদিন তো মোর হাতটা থাবা মারি ধরেছিল।...নতুবা, অন্যদিনে য্যামোন ক'য়ে থাকি, সেইভাবে ক'য়ে দিতম— গিন্নীমার শরীরটা ভালো নয়, তোরে পরে আসতে কয়েছেন।

ধীরেন : নাঃ—তোর দ্বারা হবে না। আমিই দেখছি—

[গণেশকে সরিয়ে দিয়ে ধীরেন বাইরে পা বাড়ায়। তখন কমলা বলে]

কমলা : দরজার সামনে, সব্বাইকে শুনিয়ে, ওকে কিছু বলতে যেও না যেন। ওকে এখানে ডাকো।

ধীরেন : গণেশ ! যা, ওকে ডেকে আন।

[গণেশ বাইরে যায় এবং একটু পরেই আনাজওলাকে চাতালে ডেকে নিয়ে আসে। কমলা ঘরে ঢুকে যায়। গণেশ যায় রান্নাঘরের বারান্দায়]

ধীরেন : আরে আনাজওলা ! দেশ থেকে ফেরার পর তোর সঙ্গে আমার আর দ্যাখাই হয় নি !

আনাজওলা : হাঃ বাবু ।

ধীরেন : তারপর খবর কীরকম ?...এবার তো তোদের ওখানে অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হয়েছে । ফসল-টসলের হাল কেমন ?

আনাজওলা : বহুৎ জ্যাদা দাম বাবু ।

ধীরেন : কোথাইবা দাম কম, অ্যাঁ ? আমি তো কোনদিক থেকেই কোন উপায় দেখছি না । মাইজী তো তোর সামনে আসতে লজ্জা পাচ্ছে ! আমি বলি, লজ্জাটা কিসের ? ধারে কি একা আমরাই খাচ্ছি নাকি ? দুনিয়াশুদ্ধ লোক ধারে খায় । নাকি ?

আনাজওলা : ইস্‌মে ক্যা হ্যায় বাবুজী !

ধীরেন : দেখি, খাতাটা দে তো । (খাতা নিয়ে)—এই দ্যাখ দিকি, তোর এই খাতায় পিওন থেকে হাকিম পর্যন্ত ধারে খাওয়া মানুষের নাম নেই ?

আনাজওলা : হা বাবু, কিতনা বাবুকা নাম হ্যায় ।

ধীরেন : তুইতো আর যাকে-তাকে ধরে দিস না । যাকে বিশ্বাস করতে পারিস, তাকেই দিস । এই ধর, আমি তোকে দু'মাস পয়সা দিতে পারি নি ; সেই ব'লে তো তুই আর লোকেদের কাছে বলতে যাচ্ছিস না আমি তোকে ঠকিয়েছি বলে ?

আনাজওলা : বাবুজী, আপ ক্যা বোলতে হ্যায় ?

ধীরেন : বুঝতেই পারছিস—আসলে, টাকা ক'টা তোকে দিতে পারছি না ব'লে আমার খুবই খারাপ লাগছে । (হঠাৎ)—তাই বলছি...হ্যাঁ...পরে আরেকদিন আসিস ।

আনাজওলা : ঠিক হ্যায় বাবু !

[আস্তে-ব্যস্তে আনাজওলা চলে যায়]

গণেশ : (বারান্দা থেকে) বাবু কিন্তুক ঠিক আছেন...একদম বুঝিয়ে দিলেন ।

ধীরেন : চোপ্‌ ! ঘরের ছেলে বললাম ব'লে একেবারে মাথায় উঠেছিস !

[গণেশ রান্নাঘরে চলে যায়, এবং রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে । ধীরেন ঘরে ঢোকে]

ধীরেন : শোন, এইভাবে বিহারের খরা-আবহাওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে আমার অবস্থার বিবরণ পর্যন্ত দিয়ে সবজিওলা-দুধওলাকে বোঝানোর ধৈর্য আমার নেই । আমি আর পারব না ।

কমলা : আমাকে কী করতে হবে ?

ধীরেন : তুমি একটা ফ্যামিলী-বাজেট করো । লক্ষ্য রেখো—সেই বাজেটে সিনেমা, রিক্‌শা চড়ে নদীর তীরে হাওয়া খেতে যাওয়া, অতিথিদির জন্যে চা, ফেরিওলার কাপড়, উঠ্‌নো সবজী, উঠ্‌নো দুধ, উঠ্‌নো খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন—এসব যেন না থাকে ।

কমলা : সে বাজেটটা তুমিই কোরো ; আমাকে বলছ ক্যানো ? এতোদিন ধ'রে অফিসে বসে বসেই সংসার চালানোর বিষয়ে অনেক কিছু চিন্তা করেছ। অতএব, বাজেটটা করতে তোমারই সুবিধে হবে।

ধীরেন : গণেশ !

গণেশ : (রান্নাঘরের বারান্দা থেকে) বাবু !

ধীরেন : ভাত হয়ে গেছে ?

গণেশ : তরকারীর ঝোল হয়েছে। ভাতের জল গরম হয়েছে, চাল কয়টা ফেলি দিলেই হয়।

ধীরেন : আমার জন্যে ভাত রাঁধিস নি। বিয়ের নেমন্তন্ন আছে।

গণেশ : সেথা কি ভাত খাই আইসবেন ?

ধীরেন : ভাত খাই, জল খাই, তোর কী ?

[গণেশ ভেতরে চলে যায়। দর্শক তাকে রান্নাঘরে কাজ করতে দেখে। ধীরেন জুতো পরতে ভেতরে এসে আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। যাবার সময়ে কমলাকে বলে যায় না।
কমলার হঠাৎ কী-একটা মনে পড়ে, এবং 'গণেশ' ব'লে চেঁচিয়ে ডেকে দরজার কাছে আসে]

কমলা : গণেশ ! ..সকালে চাল পেয়েছিস না পাস নি ?

গণেশ : ভাগের চাল কুথা যাবে ? লিয়ে আনছি ডের কিলো।

কমলা : আটা ?

গণেশ : তিন কিলো।

কমলা : ভালো কথা।...আদ্দেক রুটি, আদ্দেক চাল।

গণেশ : দুদিনেই শেষ হবে যে !

কমলা : তখন সবটাই রুটি। আনাজের ঝুড়িটা নিয়ে আয়।

[গণেশ আনাজের ঝুড়ি আনে]

—এই চারটে আলু কাল সকালের, এই চারটে কাল রাত্তিরের, এই চারটে পরশু সকালের জন্যে।

গণেশ : কম হবে নি ?

কমলা : চুপ !...কপিটা সমান চারভাগ ক'রে চার বেলা। বুঝলি ?

গণেশ : বুঝলম।

কমলা : পেঁয়াজ দিনে একটা। এই হিসেবের যদি কোনরকম এধার-ওধার হয়, তাহলে জেনে রাখবি—তোর চাকরি শেষ, আর বাকী মাইনেও বাজেয়াপ্ত।

গণেশ : তাই হবেন। বহুদিদি, ভাতে তরকারীর ঝোল তো হয়েছেই, দাল এটটু বসাবার দরকার আছেন কি ?

কমলা : সেটাও আমাকে বলে দিতে হবে ?

গণেশ : না ; কী দাল বসাব ?

কমলা : নিজের মুড়োটা দিয়ে একটা কিছু করতে পার না ? খালি খেতে পার। প্রত্যেক মুহূর্তে ওঁকে বলে দিতে হবে— অমুক ডাল নিবি, জিরে বেটে দিবি ডালে, গরম তেল জ্বলে না ওঠে দেখবি, ভাতের হাতাটা ভাজায় লাগাবি না, শান্তি নেই !...আমার মাথাটাই রাঁধ !

গণেশ : মানে, এইযে—আপনি ভালবাসেন রহড় দাল, বাবু ভালবাসেন মশুর দাল, এ্যাকজনে খায়েন ঝাল, আনজনে খায়েন টক। এ্যাহন আমি করিটা কী ?

কমলা : বক্‌বক্ করিস নি। এ্যাক চড়ে চোখ গেলে দোব। ওই কাপ-প্লেটগুলো কার ধোয়ার জন্যে রেখেছিস ? আমার না বাবুর জন্যে ?

গণেশ : আমিই ধুব।

কমলা : কবে ধুবি ?

[রান্নাঘরের বারান্দায় থাকা কাপ-প্লেটগুলো ধোবার জন্যে গণেশ উঠিয়ে নেয়]

—ওগুলো আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ ?

গণেশ : ধুই গিয়ে।

কমলা : ধুই গিয়ে ! কোন্ কাজটা আগে করতে হবে, আজও শিখলি না ! কটা বেজেছে এ্যাখন ?

গণেশ : দাল ?

কমলা : বলতে পারব না, যা।

[কমলা ঘরে চলে আসে। দর্শক ওকে দেখতে পায় না। গণেশ সব্‌জির ডালাটা রান্নাঘরে নিয়ে যায়, এবং সেখান থেকেই বক্‌বক্ করতে থাকে। মাঝে-মাঝে কয়েকটা টিনে হাত ঢোকায় ; এদিককার জিনিস ওদিকে রাখে ; কাপ-প্লেট গুছিয়ে তোলে ইত্যাদি]

গণেশ : এ্যাখ্‌খন রাঁধো কী রাঁইধবে। কোন্ দাল রাঁধতি হবে, কেউই কয় না ! খুশি মতো বসাই দি এ্যাটটা, লাগবে খাবার সময়ে ধুন্‌ধুমার !...এ্যাকজনে কবেন, 'এঃ, নুন বেশি হয়েছে !' আন্‌জনে কবেন, 'আমার পক্ষে ঠিকই হয়েছে !' বহুদিদি বাবুকে কবেন, 'তুমি তো রাঁধুনীর রান্না সবসময়েই পছন্দ করো, আমি রাঁধলেই খেতে পার না !'—এ্যাখ্‌খন রাঁধো কী রাঁইধবে ! ভালো রাঁইধলেও যা, খারাপ রাঁইধলেও তাই ; রহড় বসালেও যা, মশুর বসালেও তা !...বাপেকে, মশুরই চড়ায়ে দি'। লেবু এটটু চেপি দিলে আর কারও ভালো লাগুক বা নাই লাগুক, মোর তো ভালো লাগবে !...কতো আর বাক্যির টক খাবে, বাপা, আজ দা'লের টক খাও—ক্যামোন ?

[হঠাৎ ডালের ডিব্বায় হাত দিয়ে দেখে—ডাল একটাও নেই]

—মরেছে ! কী করা যায় এ্যাখ্‌খন ?

[তাড়াতাড়ি জামা প'রে বাইরে পা বাড়ায়। এমন সময়ে ভেতর থেকে কমলা এসে পড়ে]

কমলা : জামা প'রে আবার চললে কোথায় ? বিঁড়ি খেতে ? মুখে কথা নেই ক্যানো ? যাচ্ছিস্ কোথায় ?...আরে, এটার হল কী ? এ্যাকেবারে বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস।—ডাল চড়িয়েছিস ?

গণেশ : বসাই নাই।

কমলা : এতোক্ষণ তবে কী করছিলি ?

গণেশ : দাল নাই!

কমলা : নেই ? তা, আনবার জন্যে দোকানে ছুটছিলি বুঝি ? পয়সা কই ?

গণেশ : মোর হাতে আছে।

কমলা : তোর হাতে আবার পয়সা কোত্থেকে এল ?

গণেশ : বিহু পরবের সময়ে দেশে গেছলম—

কমলা : আর বাপের কাছ থেকে চেয়ে আনলম!

গণেশ : না—তার থিক্যা আঠানা পইসা মোর হাতে ছিল।

কমলা : দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা!...বেরো! এখনই বেরো তুই। তোর পেছনে আমি দিনরাত টিক্‌টিক্ ক'রে লেগে থাকতে পারব না। নিজে রাঁধব, নিজে খাব। আড়াই টাকা কিলোর ডাল, তার দুদিনে শেষ! কাঁচাই চিবিয়ে খাস্ নাকি ? বেরো বলছি...বেরো...বেরো—

[কমলা ওকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই বার করে দিতে থাকে। এমন সময়ে, বাইরে থেকে, ধীরেন প্রবেশ করে। ধীরেন ও গণেশ, দুজনের গায়ে-গায়ে সংঘাত হয়]

ধীরেন : উঃ। মানুষজনকে মেরে ফেলবি নাকি ?...হল কি এটার ?

কমলা : থাকুক ও বাইরে। শেষ মুহূর্তে বলবে—ডাল নেই, তেল নেই, নুন নেই। কোনো জিনিস ঠিক সময়ে আনতে হবে, কখনও যদি বলতে পারে।

গণেশ : কাল সাঁঝব্যালায় দাল বা'র করে দিছেন আপনি। আজ সকালে মেপে দিছেন আপনি। মুই ক্যাম্‌নে জানি দাল নেই ?

কমলা : শোনো কথা! এ্যাখন আমিই হলুম দায়ী।

ধীরেন : কাঠির মতো ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস ক্যান ?...ভেতরে যা!

[গণেশ রান্নাঘরে ঢুকে যায়]

—কমলা, ভেতরে এসো।

[দুজনে ভেতরে যায়]

—এইজন্যেই তোমাকে বলি—রান্নাঘরটা হয় ওকে ছেড়ে দাও, আর না হয় তুমি নাও। একটা গুহায় দুটো বাঘ থাকতে পারে না।

কমলা : আমি রান্নাঘরে গেলে কী হয় ?

ধীরেন : কিচ্ছু হয় না। ও ঘরে সবাই ঢোকে।

কমলা : খুব হয়েছে। এইভাবে লাই দিয়ে চাকরকে মাথার ওপর তুলেছো। কথায়-কথায় চোপা করতে শিখেছে। আমি কি বাড়ির কর্ত্রী নই ?

ধীরেন : আহা, কথাগুলো তুমি বড্ড ছড়িয়ে ফেলছ। আসল সমস্যাটায় এসো দিকি। ঘরে আমি কতোক্ষণ থাকি? বাড়ির সব কাজ তুমিই তো দ্যাখো। সেক্ষেত্রে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।

কমলা : তা—ভুলটা আমি কী করলুম?

ধীরেন : এই যে আজ ঠিক চড়াবার সময় দ্যাখা গেল, ডাল নেই। ধরো, এই পরিস্থিতিটা যদি তোমার-আমার মধ্যে হত, তা'লে কে কাকে বার করে দিত— বলো তো!

কমলা : তার মানে, তুমি বলতে চাইছ—ওর কোন দোষ নেই?

ধীরেন : না। আমি বলতে চাইছি—ও যদি কাল রাত্তিরে, আজ সকালে ডালের টিনে হাত দিতে পারত, তা'লে আজ রাতের জন্যে ডাল আছে কি নেই, জানতে পারত। কিন্তু ওকে সেই সুযোগটা দিলে কোথায়? অন্যদিকে, তুমি নিজেও কিছু বললে না। ফলে এই গণ্ডগোল!

কমলা : বেশ, বেশ, আরও মাথায় তোলো ওকে। আমার ওকে একটা কথাও বলা চলবে না।...তার চেয়ে, ওকে বলো না কেন—আমায় দুটো চড় মারুক... আমার ঘাট হয়েছে।

ধীরেন : তোমার হয়েছেটা কী বলো তো?

কমলা : খুব হয়েছে।...হয় ও থাকুক এই বাড়িতে, নয় আমি থাকি।

ধীরেন : শোনো কমলা! চাকরের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্যে স্বামী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বা'র ক'রে দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। এমন কি, গল্প-উপন্যাসেও এমন ঘটনা বোধহয় তুমি পাওনি। কাজেই, ওসব কথা ছেড়ে দাও।...আর, অন্যটা হল—গণেশকে তাড়িয়ে দেওয়া। এখনই কয়েকটা থাপ্পড় মেরে ওকে বার করে দিতে পারি না? কিন্তু ও চলে যাওয়ার পরে, অফিস থেকে এসে দেখব— তোমার মুখখানা ফুলে এ্যাত্তোবড়ো একটা চুবড়ি হয়ে আছে। রাগের চোটে কাঁড়ি-কাঁড়ি থালাবাসন ধুচ্ছ, বেলা দুটোয় ঘর মুচ্ছ, খরচ কমাবার নামে, একদিনেই লেপের কভার থেকে আরম্ভ ক'রে মশারী, বিছানার চাদর, সব সেদ্ধ ক'রে কাচতে বসেছ—

[কমলা সশব্দে কাঁদতে থাকে]

—এইতো, দৈনন্দিন রুটিন আরম্ভ হয়ে গেল!...দ্যাখো, চাকর হলেও, একটু-আধটু স্বাধীনতা দিতে হয়, বুয়েচ? দিনরাত ওর পেছনে টিকটিক্ ক'রে ওর ইনিসিয়েটিভ তুমি নষ্ট করে দিচ্ছ।

কমলা : আজ থেকে আমি মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করব না। যদি করি, আমার নামে কুকুর-পুষো।

[কমলা গিয়ে বিছানায় শয্যা নেয়। ধীরেন কাপড় বদলে, ঘরের ভেতরে, এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ করে। ঘর থেকে বেরিয়ে চাতালে আসে। সেখানে কিছুক্ষণ কী ভাবে। তারপর চলে যায় রান্নাঘরের কাছে। গণেশকে ডাকে—]

ধীরেন : গণেশ !

[গণেশ বেরিয়ে আসে]

গণেশ : বলুন বাবু !

ধীরেন : তারপর—কী রেঁধেছিস ?

গণেশ : দোকানে তো যাওয়া হল নি। দাল রাঁধি নাই।

ধীরেন : ঝোলটোল কিছু রেঁধেছিস্ ? কিসের ?

গণেশ : ঝিঙে-ধুঁদুলের ঝোল।

ধীরেন : আমার জন্যে রাঁধিস নি তো ?

গণেশ : রাঁধি নাই। আপনি কই গেলেন না—'ভাত খাব না, বিয়ার নেমোন্-তন্নোয় খাব' ?

ধীরেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস।...হ্যাঁরে, তোর বৌদি খেয়েছে ?

গণেশ : খান নাই।

ধীরেন : দিস নি ক্যান ? যা, টেবিলে দিয়ে আয়।

গণেশ : রাগ করেন যদি ?

ধীরেন : যা, যা। চিড়িয়াখানার বাঘ-সিঙ্গিদের কেউ আর খাবার দিতে যায় না ! ভয় পাবার কী আছে ?

[গণেশ রান্নাঘরে যায়। এবং একটু পরে কমলার ঘরের টেবিলে ভাত রেখে যায়। অস্ফুট স্বরে বলে যায়—]

গণেশ : বহুদিদি, ভাত দি'ছি !

ধীরেন : (ঘরের বাইরে থেকে) হ্যাঁগো, ভাত দিয়েছে, খেয়ে নাও। রাগ করে থাকলে হবেটা কী ?

কমলা : আমি ভাত খাব না। তোমাকে কে বলতে বলেছে ?

ধীরেন : আমাকে আবার কে বলতে বলবে ? অন্যদিন 'খাব না' বলেও পরে খেয়েছো ; সেইজন্যেই অনুরোধ করছি। ভাতগুলো কী দোষ করলে ? খাও।

[ক্ষণকাল সব নিস্তব্ধ। রান্নাঘরের বারান্দায় গণেশ। শয়নঘরের দরজার কাছে ধীরেন। ধীরেন ভেতরে চেয়ে দ্যাখে—স্ত্রী বিছানার ওপর নড়ছে-চড়ছে না। আস্তে সরে এসে আবার আগের জায়গায় স্থিত হয়]

ধীরেন : গণেশ, আজকাল আমাদের কতোটা চাল লাগে রে একবেলায় ?

গণেশ : আড়াই ডিবেতেই হৈ যায়।

ধীরেন : আচ্ছা, দুপুরের ভাত থেকে কিছু কি রাত্তিরের জন্যে থাকে ?

গণেশ : থাকে না।

ধীরেন : থাকবে কোত্থেকে ? চালের দাম এ্যাতো বেড়েছে, একটু টেনে-টুনে চালাতে হবে তো ! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। ছুয়েচিস্ ? আজ এইতো

বিয়ে বাড়িতে দেখলুম—একটা সিঙাড়া, আর গোটাকতক বোঁদে। উপায় নেই রে, মানুষ করবে কী ?

গণেশ : আমি আবার ভাবল'ম—বাবু য্যাখ্‌খন আজ ভাত খাব নি বলছেন, বিয়াবাড়িতে ভালো করি জলখাবারটা খাই আসবেন।...দুটা ভাত নহলে রাঁধি দি' বাবু ?

[বিছানায় শুয়ে-শুয়েই কমলা উৎকর্ণ]

ধীরেন : এই রাত্তিরে আর ভাত রাঁধতে হবে না।

গণেশ : তাহলে মোরটাই খান।

ধীরেন : তুই ?

গণেশ : মুই চিড়া-টিডা যাহক চিবাব।

ধীরেন : রাখ্ রাখ্। আমার অতো ক্ষিদে নেই।...তার চেয়ে...একটা কাজ কর্—ও থেকে কিছু তুই খা, কিছু আমি খাই। একটা রাত তো।

গণেশ : তাই হবেন।

[গণেশ ভাত এনে বারান্দার টেবিলে রাখে। ধীরেন অল্প ভাত নেয়]

—আর এট্টু নিন বাবু।

ধীরেন : এই, এ্যাতো চ্যাঁচাচ্ছিস্ ক্যানো ? ওতেই হবে, আর দিস্ নি।

[একটা শব্দ হয়]

—তোর বৌদি উঠেছে নাকি, দ্যাখ্ তো ?

[গণেশ দেখে]

গণেশ : উঠেন নাই। তরকারী নেন না।

[গণেশ তরকারী দেয়]

ধীরেন : আরে, এ্যাতো দিলি ক্যানো ?

[এইবার মুখে ভাত তুলতেই কমলা উঠে আসে ধীরেনের কাছে। ধীরেন অপ্রস্তুত হয়। গণেশ ভেতরে সরে যায়]

কমলা : ওর ভাগের ভাত ক'টা খেতে পারো, আর আমার থালার ভাত কী দোষ করলে ? আমার ভাগের ভাতগুলো ভাগাভাগি ক'রে খাওয়া যায় না ?

ধীরেন : যায় তো। ক্যানো যাবে না ? সাহস থাকলেই হয়।

কমলা : কিসের সাহস ?

ধীরেন : এই যেমন—আমার তোমাকে বলতে পারা চাই যে বিয়েবাড়িতে আমার বিশেষ-কিছু খাওয়া হয় নি। আগে যদিও আমি ভাত রাঁধতে বারণ করেছিলুম। এখন আমার ক্ষিধে পেয়েছে। তাই বলে এ্যাতো রাতে ভাত রাঁধতে হবে না। এই, ইয়ে, তোমার ভাগ থেকে ভাগাভাগি ক'রে খাওয়া যায় না ?

কমলা : তা' এ্যাখন সেই সাহস হয়েছে না হয় নি ?

ধীরেন : হয়েছে।

কমলা : তাহলে ঘরে এসো।

[আগে-আগে কমলা, তার পেছনে ধীরেন। দুজনে ঘরে এসে টেবিলের ভাত ভাগাভাগি ক'রে খেতে থাকে। ওদিকে গণেশ ছট্‌ফট্ করতে থাকে। বাবুকে দেওয়া ভাতগুলো আবার নিজের থালায় তুলে নেয়। এবং মাঝখানে, ধীরেন আর কমলাকে, বারান্দা'র ফাঁক দিয়ে দেখে যায়।...শেষে বলে—]

গণেশ : বাবু!...এই ভাত কয়টা তা'লে আমি খাই?

[ধীরেন ও কমলা, দুজনে হেসে ওঠে]

ধীরেন : খা!

[ধীরেনের মুখ ফস্‌কে কয়েকটা ভাত কমলার গায়ে পড়ে]

কমলা : ধ্যেৎ!

[পর্দা নামে]

পিয়লি ফুকন

নগাওঁ নাট্য সমাজ*

* নাট্যকারের নামেব উল্লেখ না থাকলেও এই সুবিখ্যাত এবং দেশপ্রীতিতে স্পন্দিত নাটকটিব সঙ্গে ৺চন্দ্রকান্ত ফুকন এবং শ্রীসারদাকান্ত বরদলৈব নাম জড়িত। ফুকন ও ববদলৈ দুজনেই সু-অভিনেতা বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

চরিত্রাবলী ঃ

জন্মি ফুকন পিয়লি ফুকন	বদন ফুকনের পুত্রদ্বয়
নারায়ণ	পিয়লির ভৃত্য
মনিরাম	তহশীলদার
হরনাথ বরুয়া	ইংরেজের অসমীয়া দারোগা
দুতিরাম	" " কর্মচারী
ধনঞ্জয় ধনুধর পিয়লি বরুয়া উদয় সিং	পিয়লি ফুকনের সহকর্মী
কর্ণেল কুপার	ইংরেজ পক্ষের অধিনেতা ; শিবসাগরের জুনিয়র কমিশনার
নিউভীল মেঘী	সহকারী ইংরেজ কর্মচারী
পাদ্রী	ইংরেজ ধর্মযাজক
টম	কাফ্রী ভৃত্য

খাসিয়াসিয়াম, গারোগাম, মিরিগাম, চিংফৌগাম[1], নাগাযুবক, ভক্ত, পূজারী, বাঙালী পেশকার, সিপাই, ভাঁড়, ঢুলী-খুলী ওজা-পালী,[2] তীরন্দাজ, বন্দুকধারী, প্রজাগণ, প্রভৃতি।

সুচিতা	পিয়লি ফুকনের স্ত্রী
লবণী	পিয়লি ফুকনের কন্যা

পিয়লি ফুকনের মা, গড়গাঁওয়ের নর্তকী, প্রভৃতি।

প্রাসঙ্গিক ঃ

1948। মূলস্বত্ব—নগাওঁ নাট্য সমাজ, নগাওঁ, আসাম।

---

1. 'সিয়াম, গাম'—গোষ্ঠীর প্রধান, রাজার তুল্য ক্ষমতা ও মর্যাদা।
2. পুরাণ-গায়ক। একজন মূল গায়েন, সঙ্গে কোরাস।

রাজ-সমাধি

[কৃষ্ণা একাদশী। সময়—শেষ রাত্রি। রাজ-সমাধি। পেছনে, দূরে, দিখৌ নদী। সমাধি-সংলগ্ন একটা বকুল গাছ। সমাধির ওপর কয়েকটা বকুল ফুল পড়ে আছে। সমাধির একদিক ভাঙা। কবর খুঁড়ে জিনিসপত্র চুরি করার চিহ্ন রয়েছে।

যবনিকা ওঠার আগে থেকেই শোনা যায়—সমাধিস্থলে কে-যেন কাঁদছে। যবনিকা ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ওই কান্না ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়।

নারায়ণ ও পিয়লি ফুকনের প্রবেশ। নারায়ণের হাতে একটা টর্চ—মুখে ভয়ের ভাব। নারায়ণের পেছনে উদ্বিগ্নচিত্ত পিয়লি ফুকন। দুজনে প্রায় একই সঙ্গে প্রবেশ করে—নারায়ণ সামান্য আগে। পিয়লি ফুকন খঞ্জ। একজোড়া ক্রাচের সাহায্যে চলাফেরা করে।

মঞ্চে প্রবেশ ক'রেই নারায়ণ পিয়লির পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, এবং গলা উঁচু ক'রে সমাধির দিকে কী-যেন দেখার চেষ্টা করে]

পিয়লি : কই নারায়ণ? সমাধিতে তো কেউই নেই! অথচ, আমি নিজে কানে শুনেছি—কে-যেন এখানে কাঁদছে। তুই শুনিসনি, নারায়ণ?

নারায়ণ : কেনে শুনি নাই মেজকত্তা! গাঁয়ের সক্কলে জানে—আইজ কেইদিন থিক্যা রাজার সমাধিতে কেইবা দুপুর-নিশা কান্দে.

পিয়লি : আমি নিজে স্পষ্ট শুনেছি—যেন কোন রমণীর কান্না। নারায়ণ, ভালো ক'রে দ্যাখ—

[দুজনে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে দেখে]

—ওটা, ওটা কী?

[দুজনে একটু এগিয়ে যায়]

—গাছের তলায়—ছায়ার মতো!—ভালো ক'রে দ্যাখ্‌তো, নারায়ণ...নিশ্চয়ই আমার ভুল হয় নি।

[দুজনে একাগ্রচিত্তে সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। অতঃপর নারায়ণ এগিয়ে যায়]

নারায়ণ : ক্ষেতি তো করবেক নি মেজকত্তা?

[নারায়ণ আরও দু-পা এগিয়ে যায়। পিয়লি যেখানে দাঁড়িয়ে, সেইখান থেকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে। কিছু একটা দেখে নারায়ণ মুহূর্তে পিয়লির কাছ ঘেঁষে আসে]

—মেজকত্তা—সেইটা...সেইটাই তো। লড়্‌চড়্‌ করে য্যান্‌ দেহি।...সেই... হুই যে।—দূরে চলি যেছে—দ্যাহেন, দ্যাহেন মেজকত্তা।

পিয়লি : সত্যি নারায়ণ। ছায়া নয়—মানুষ।

[নারায়ণ সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পেছনে তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে যায়]

—নারায়ণ, নারায়ণ! টর্চটা নিয়ে তুই পেছন-পেছন যা, পা চালিয়ে। ওই যে—আমাদের দেখে পালাচ্ছে।

নারায়ণ : মানুষ—না মেজকত্তা ?

পিয়লি : হ্যাঁ—মানুষ, মানুষ। তাড়াতাড়ি যা—।

[বেগে নারায়ণের প্রস্থান। নারায়ণের যাওয়ার দিকে পিয়লি কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপরেই যেন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে]

—শেষ রাত্রি...রাজ-সমাধিতে ক্রন্দনের রোল!

[দুপা এগিয়ে যেতেই একটা-কিসে হোঁচট যায়। ক্রাচ দিয়ে বেশ ক'রে খোঁচা মেরে দেখে]

—রাজসমাধির দেহে খনন-চিহ্ন ?...বুঝেছি! নারায়ণের কথাই সত্যি।...নারায়ণ ধরতে পারবে না। তার সাধ্য নেই। সমাধিতে সিঁধকাঠি—সমাধিতে ব্যভিচার। সমাধিক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গির পায়ের ছাপ! দীর্ঘ ছ'শো বছর ধ'রে শায়িত ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবগণের[1] আত্মার চিরন্তনী স্থাপনা সমাধি আজ অপবিত্র ক'রে শ্বেত বিদেশী ব্যভিচার ঘটালে!...জনগণ একবারের জন্যেও প্রতিবাদ করল না—একটা আঙ্গুল তুলল না!...তাই আজ দেবী অসন্তুষ্ট...এ দেবীর কান্না—

[বেগে নারায়ণের প্রবেশ]

নারায়ণ : ধরৃতি পারলাম না মেজকত্তা!

পিয়লি : ধরতে পারবি না নারায়ণ।

নারায়ণ : মই কাছ চাপি য্যাতোই বেগাই যাই, ছায়াটা ত্যাতোই গোপন হয়। টর্চের চক্‌মকি আলোকে দেখলাম—কাল' কাপোড় পরা এজনা স্ত্রীলোক—চুল আউলী-বাউলী! মুই ধইরব বুলি যেই দৌড় দিলম, পেরায় ধরি ধরি, সি দিখৌ নদীতে ঝাঁপ দি পড়ি তৎস্থানেই অদৃশ্য হয়েল। মেজকত্তা, মোর ত' নরমনিস বুলি মনে ধরে না।

পিয়লি : মানুষ নয় নারায়ণ—দেবী।

নারায়ণ : (ভয়ে চম্‌কে ওঠে) গোসানী ? অশরীরী ? হরি হরি—।

পিয়লি : হ্যাঁ, গোসানী। দেশে মারী-মড়ক লাগলে আকাশে যদি ধূমকেতু খসে, তাহলে শ্বেত বিদেশী ইন্দ্রবংশী রাজন্যদের সমাধি অপবিত্র করলে দেবী কাঁদবেন না কেন ? দেশে অমঙ্গল দ্যাখা দিয়েছে নারায়ণ! আরও হবে—এই অমঙ্গল। (কিছুক্ষণ ভেবে)—শোন্ নারায়ণ—তুই এ্যাখনই বাড়ি ফিরে যা।—

নারায়ণ : আর আপোনি, মেজকত্তা ?

---

1. রাজাদের

পিয়লি : হ্যাঁ, আমি কিছুক্ষণ একলাই থাকতে চাই। তুই যা। যা বললুম, কর্ গিয়ে।

নারায়ণ : না, মানে—দশ্‌দেব্‌তার রাইজ্য—সেই কারণেই কৈছি।

[নারায়ণের প্রস্থান। পিয়লি ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক করে ; হঠাৎ সমাধির সামনে করজোড়ে স্থিত হয়ে বলে—]

পিয়লি : হে ইন্দ্রবংশীয় আহোমের বংশধর, সোনার আসামের শেষ স্বাধীন স্বর্গদেব। পিতা বদন তোমার রাজ্যে ডেকে নিয়ে এল বর্মীদের[1]। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত পর্যন্ত অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ঘরে-ঘরে তুললে ক্রন্দনের রোল। তুমি জীবিত অবস্থায় সেই দেশদ্রোহী পাতকীর বিচার করার সুযোগ পাওনি ব'লে তোমার অতৃপ্ত আত্মা সেই বদনের সন্তানদের আজও খুঁজে ফিরছে শাস্তি দেবার জন্যে। আমি এসেছি স্বর্গদেব! পিতা বদন যদি শাস্তির যোগ্য হয়—সেই শাস্তি আমাকে বিধান করো। গড়গাঁওয়ের[2] আম-দরবারে ব'সে, দেশাধিনায়ক হে স্বর্গদেব, তোমার সেই বিদ্রোহী প্রজার বিচার করো, আমাকে উদ্ধার করো!

[দূর থেকে গান গাইতে-গাইতে ভক্তের প্রবেশ]

ভক্ত : (গান) সোনার আসামে বর্মী ডাকি আনিলি
নন্দনে ছাড়িলি হাতী—
রাজার প্রাসাদে বিষ-সাপ ছাড়িলি
বেড়ে মাঝে নিশা রাতি।
—ও বদন, তুই করিলি কী!

পিয়লি : কে তুমি? এই রাতভোরে সমাধিক্ষেত্রে এসে বদনের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছ?

ভক্ত : বদনের কুৎসা গাতি আসি নাই বাবা। সমাধিস্থলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তিছি। (পিয়লির কাছে গিয়ে)—তুমিও যে কান্দিতেছ, বাবা? কান্দো —যতো পারো, কান্দো। কিন্তু একাকী একজনে কান্দিলে হবে নে—দুইজনে কান্দিলে হবে নে—গুটা দেশের শত শত প্রজাকে বহু যুগ ধরি কান্দতে হবে। এ্যাকজনের এ্যাকফোঁটা অশ্রুজলে স্বর্গদেবের আত্মা শান্তি পাবে নে—আমার দুখিনী মা'র দুখ ঘুচবে নে।

পিয়লি : ভক্ত! (কাছাকাছি এসে)—এই সমাধিস্থলে কারও ক্রন্দন তুমি কখনও শুনেছ? কে কাঁদে?

1. পিয়লির পিতা বদন ফুকনের আমন্ত্রণে বর্মীরা আসাম আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করে 1816-19 এবং 1824 খ্রীষ্টাব্দে।

1. আসামের প্রাচীন রাজধানী।

ভক্ত : শুনিছি—কিন্তু, কে কান্দে, ক্যান্ কান্দে—কি ক'রি কইব বাবা ?

পিয়লি : (একটু ভেবে) আচ্ছা, বর্মীদের ডেকে আনার জন্যে একা বদনই কি দোষী ?

ভক্ত : তা ক্যান্ হবে, বাবা ? এ্যাকলা-এ্যাকজনের কারণে এ্যাকোটা দেশ শেষ হয়্যা যায় নে। দেশের বড়-বড় খুঁটাগুলাই যদি চঞ্চল হয়্যা থাকে, সেইস্থলে এ্যাকজন বদনের এ্যাকোটা কুঠার-আঘাতেই সেই অট্টালিকা হেলি পড়তি পারে নে ? কিন্তু, কী করবা—এই দুর্দৈবের কারণে সকলে বদনকেই দোষারোপ করে !

পিয়লি : ভক্ত ! বন্যার জলস্রোতের মতো বর্মীরা এসেছিল, আবার চলেও গ্যালো। কিন্তু সদ্য-আগত এই শ্বেত বিদেশীরা খুঁটির গজাল হয়ে থেকে যাবে মনে হচ্ছে।

ভক্ত : বলতেছেন ?...এই বিষয়ে সন্দিহান হবার কোন কারণ নাই।...পূর্বকালে, অসমের যুবকগণ বুকের রক্ত দি' ব্রহ্মপুত্রকে রাঙা করি পশ্চিম দুয়ারে বিদেশীকে বাধা দিছিল ; আর আইজ—আইজের অসমীয়া বড ছাতাটি ধরি ফিরিঙ্গিকে আগবড়াই আনি বসতবাটিতে বসাতেছে।

পিয়লি : ভক্ত ! সমাধিতে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনে এসে কী দেখলাম, বলতে পারো ? ...দেখলাম—রাজ-সমাধি ভাঙ্গা !

ভক্ত : সমাধিস্থল বহু পূর্ব থিকাই বিনষ্ট, বাবা ! তুমি কি আইজই মাত্র খবর পা'লে ? বাবা—

[গান গায়]

শ্বেত সদাগর আসিয়া জুটিল,
শ্বেত লুইতের[1] বালি,
(তুই) সুদও হারাইলি মূলও হারাইলি
কী হবে ছিঁড়িলে চুলি ॥

[ভক্তর প্রস্থান]

পিয়লি : শুনলে স্বর্গদেব ! দুর্বৃত্ত বণিকের দল সিঁদ কেটে তোমার রাজ্যের যতো সোনা-রূপো-জিনিসপত্র পরপারে নিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত হয় নি ; তারা আজ তোমার দেশে চিরস্থায়ী শাসন কায়েম ক'রে, আবহমানকালের জন্যে থাকতে চাইছে। স্বর্গদেব ! এই দুর্যোগ থেকে দেশকে তুমি রক্ষা করো। তোমার দেহরক্ষী সেনা দিয়ে বিদেশীদের বিতাড়িত ক'রে রেখে এসো করতোয়ার ওপারে।

[ঊর্ধ্বশ্বাসে নারায়ণ ছুটে আসে]

নারায়ণ : মেজকত্তা ! মেজকত্তা !

পিয়লি : কী হয়েছে নারায়ণ ?

---

1. ব্রহ্মপুত্র নদী।

নারায়ণ : কথা গভীর মেজকত্তা! ধনঞ্জয়রা ভীমরুলর বাসায় হাত দিছে।

পিয়লি : পরিষ্কার করে বলছিস্ না কেন?

নারায়ণ : তেনারাই ক'বে মেজকত্তা। ওই আহিছে। মুই যাই। মন্দিরে সেই শরাইখান দিতি হবে নে!

[নারায়ণের প্রস্থান। ধনঞ্জয়, ধনুধর, উদয়সিংহ, পিয়লি বরুয়া এবং জন্মির প্রবেশ। জন্মি ছাড়া বাকি সকলের আঁটসাঁট সাজ-পোষাক। পিয়লি ফুকন এগিয়ে গিয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করে—]

পিয়লি : ধনঞ্জয়! কী হল? তারাতলী[1] ছেড়ে এলে ক্যানো?

ধনঞ্জয় : তারাতলী থেকে আসছি না ফুকন। গুপ্তচরের মুখে গৌহাটির খবর পেলুম—ইংরেজের বাবুদের নৌকো আজ দিখৌ-এর মুখে এসে পৌঁছবে। তখুনি আমি তারাতলী থেকে জনা পঁচিশেককে সঙ্গে নিয়ে লুইতে চলে এলুম। সেখানে দেখা পেলুম ইংরেজের নিশান-ওড়ানো নৌকোর।

উদয় সিং : সেই নাও কা বারুদ হামিলোগে আন্ধার রাতি লুট ক'রলম।

পিয়লি : বারুদ! বারুদ!!—তারপরে?

পি. বরুয়া : বারুদ—ফুকন, বারুদ! তারপরে—এক অদ্ভুত ঘটনা! আমরা বারুদ নিয়ে দিখৌ দিয়ে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বিদ্যুৎ বেগে একটা পাঞ্চৈ[2] নৌকো এসে ইংরেজের খালি নৌকোটাকে, নাবিক শুদ্ধ, অদ্ভুত কৌশলে মাঝ-নদীতে ডুবিয়ে দিলে। অধিনায়িকা এক রমণী নৌকো থেকে চেঁচিয়ে আমাদের বললে—

'কাজ করলে জড় মেরে করবে—
সাপ মেরে লেজে বিষ না রাখবে।'

পিয়লি : রমণী! আশ্চর্য! কার পাঞ্চৈ নৌকো?

উদয় সিং : কিন্তু ফুকনজী! বারুদ রখনেকা ব্যবস্থা রাতির ভিতরেই করতি হোবে।

পিয়লি : এখন কোথায় আছে?

ধনঞ্জয় : নৌকোয়।

পিয়লি : নৌকোয় কাকে রেখে এসেছো?

পি. বরুয়া : গম্ভীর গোলন্দাজ, তার সঙ্গে বারোজন বন্দুকধারী আছে।

উদয় সিং : ফুকনজী! এক নাও বারুদ মজুদ রাখি যদি দুষমন হঠাতে না পারে, তবে তারাতলী মে হম কী শিখিলে! কোম্পানীকে সাথ কিরকম লড়িবে!

জন্মি : পিয়লি! শোন্। কাল সকাল থেকে এখানে অনেক মানুষজনের সমাগম হবে। রাত্রের ভেতরেই বারুদের নৌকো লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

1. স্থানের নাম।

2. ছুটো মুখই সরু হয়ে ওপরে-ওঠা এক ধরণের নৌকো

পিয়লি : হ্যাঁ দাদা, লুকিয়ে ফেলতে হবে। শোন—তারাতলীতে উদয় সিং-র শিবিরের উত্তরদিকে যে অশথ গাছ আছে, তার গুঁড়িতে গভীর গর্ত খুঁড়ে, রাত্রের ভেতরেই, পুঁতে রেখে এসো।...উদয়সিংহ! তোমার ওপরেই এই ভার দিলাম। তুমি যাও। বারুদ যখন হাতের মুঠিতে, নতুন উৎসাহ নিয়ে তুমি আমাদের বন্দুক-বাহিনী গ'ড়ে তোলো।

উদয় সিং : আসলী চীজ যব হাতের মুঠি মে—উদয়সিংহের বুক তবে পত্থর। এই কাম কা পুরা ভার লইলম। ফুকনজি! হুলসে হী হুল উঠাইতে হোবে।

[উদয় সিং-র প্রস্থান]

পিয়লি : হুল দিয়েই হুল তুলতে হবে। ঠিক বলেছো। ধনঞ্জয়, ধনুধর! যে বারুদের অভাবে আমরা এতোদিন কাজে এগোতে পারিনি, দেবীর কৃপায়, সেই বারুদ যখন আমাদের হাতের মুঠোয়, আর চিন্তা নেই। এইবার কোমর বেঁধে তৈরি হও। ইংরেজের বারুদ ঘর উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর, লড়াই ক'রে আমাদের দেশের চার সীমার বাইরে তাদের বার ক'রে দিতে সময় লাগবে না।

ধনঞ্জয় : কিন্তু আশ্চর্যের কথা ফুকন যে, আমাদের দেশেরই হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা খ্যাতি-লোভী কিছু লোক উদারতা দেখাতে অর্জুনসুঁড়িতে একটা সভা ডেকেছে। আপনি কি—

[ধনঞ্জয়ের মুখের কথা শেষ না হতেই—]

পিয়লি : অ্যাঁ—অর্জুনসুঁড়িতে সভা? উদ্দেশ্য কী—জানো কিছু?

ধনঞ্জয় : কেন, শোনেন নি? মনিরাম কাকতী বরুয়া অর্জুনসুঁড়িতে একটা সভার আয়োজন করেছে। মেলার উদ্দেশ্য—প্রজাদের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন সাহেবকে সম্মান জানানো।

পিয়লি : অর্জুনসুঁড়িতে সভা? হুঁ।—মনিরাম জাল পাতছে। সুন্দর পরিকল্পনা।

ধনঞ্জয় : কিন্তু ফুকন! সেই সভায় আপনাকে নিমন্ত্রণ করেনি।

পিয়লি : হয়তো আমার মতো অকর্মণ্যের সেখানে কোন প্রয়োজন নেই।

ধনঞ্জয় : অকর্মন্য! আপনি হলেন অকর্মন্য? আর যতো হঠাৎ গজার দল হল কাজের লোক!...ফুকন—আর একটা বিশেষ খবর আছে।

পিয়লি : আবার কি খবর?

ধনঞ্জয় : আমার সন্দেহ হচ্ছে—মনিরাম আমাদের তারাতলীর সংবাদ জানে।

পিয়লি : জানে! মনিরামকে তারাতলীর সংবাদ কে দিলে?

ধনুধর : আমার অনুমান—হরনাথ দারোগাই সংবাদদাতা।

পিয়লি : হরনাথ দারোগা! তাহলে, ও-ই ফিরিঙ্গিদের গুপ্তচর?

পি. বরুয়া : আমার ধারণা—হরনাথ বরুয়া গোপনে সব লক্ষ্য করছে। আমরা যে আপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছি, এ খবর ফিরিঙ্গির কানে পৌঁছনো অসম্ভব নয়।

পিয়লি : ধনঞ্জয়, ধনুধর, বরুয়া! আমাদের পক্ষে এ্যাখন গুরুতর মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ে, গা বাঁচিয়ে না চললে, সমস্ত শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। আমাদের

পূব ও পশ্চিম সীমার কাজ খুব শীঘ্রি শেষ ক'রে তারাতলীর ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলতে হবে। এ্যাখনই তোমরা চলে যাও...তার ব্যবস্থা করো গিয়ে।

জন্মি : আর তুই, পিয়লি—?

পিয়লি : আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

জন্মি : এই সমাধিতে একলা! তোর কী হয়েছে পিয়লি?

পিয়লি : ভয় পেও না, দাদা! সমাধিস্থলের ভূত-পেত্নীরা এই খোঁড়ার ঘাড় মুচড়ে মারতে পারবে না।

জন্মি : তুই বুঝছিস না পিয়লি—

পিয়লি : বুঝি দাদা, খুব বুঝি। তোমার ভালবাসা, বৌদির আদর, মার স্নেহ—সবই বুঝি। আর, এও বুঝি যে, আমি বাড়ির সকলের অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছি।...কিন্তু রাত্রে যদি আমার ঘুম না আসে, বিছানায় শুয়ে যদি শান্তি না পাই, ঘরের লোক তো বোঝে না—আমি কী করতে পারি দাদা!

পি. বরুয়া : ফুকন! কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি—আপনি মানুষটা বদলে যাচ্ছেন। রাত্রে আপনার ঘুম আসে না।...কিন্তু—নেয়েই যদি অস্থির হয়ে ওঠে, নৌকো স্থির হয়ে চলে কি ক'রে?

পিয়লি : ভয় নেই বরুয়া! ভাঁটার টানে বেসামাল হ'য়ে ঘাটে নৌকো ভেড়াতে না পারলেও নেয়ে নৌকোকে ডুবতে দেবে না। হয়তো নেয়ে মারা পড়বে—কিন্তু নৌকো ডুববে না।

ধনুধর : ফুকন! মরণের ভয় আমরা করি না। মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখেছি বহুবার—

[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে]

ধনঞ্জয় : সত্যি কথা। প্রাণের ভয় থাকলে এ কাজে এগিয়ে আসতুম না।

পিয়লি : আমি সব জানি ধনঞ্জয়! কিন্তু সারা আসামের মানুষ যাকে আজ 'গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা' ব'লে ডাকে, সেই সাপের বাচ্চাকে হাতের মধ্যে পেয়েও ক্যানো তোমরা গেরিলার দল সেইদিন রাত্রেই আমাকে মেরে ফেললে না?

পি. বরুয়া : ফুকন। আসামের বনে-জঙ্গলে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপের বাচ্চা এ্যাতো বেড়ে গেছে, অন্তত দু-একটা গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা থাকলে বাইরের মানুষ সেই বনে ঢুকতে ভয় পাবে।

জন্মি : এসব কথা ছেড়ে দিয়ে এ্যাখন সবাই ঘরে যাওয়া যাক। চলো।

ধনঞ্জয় : হ্যাঁ ফুকন। এর পরে এখানে থাকা উচিত নয়। আপনিও আসুন।

পিয়লি : চলো তাহলে।—হ্যাঁ, যাবার আগে তোমাদের একটা জিনিস দ্যাখাই।...সমাধির এই দিকটা দেখেছো?

[সকলে সমাধির কাছে গিয়ে দেখে]

জন্মি : সমাধি যে ভাঙ্গা! কে ভাঙ্গলে?

পিয়লি : শয়তান ফিরিঙ্গির কাজ, দাদা। শুধু ভাঙ্গাই না, সমাধির মধ্যেকার সমস্ত

সম্পদ লুটে নিয়েছে। পবিত্র সমাধি অপবিত্র করেছে, উচ্ছিষ্ট করেছে ম্লেচ্ছের দল। আমাদের রাজন্যবর্গের বিশ্রামরত আত্মার চিরশান্তি নষ্ট ক'রে দিয়ে দেশ জুড়ে শুরু করে দিয়েছে প্রেতের নৃত্য।

ধনুর্ধর : আসামের কী দুর্দিন!

পিয়লি : তার ওপর, আমি আজ কী দেখেছি, জানো? এসে দেখলাম—দূরে, গাছের তলায়, আলুলায়িত কুন্তলা কৃষ্ণবসনা এক রমণী।

ধনঞ্জয় :
ধনুর্ধর : } (একসঙ্গে)—রমণী!
পি. বরুয়া :

[পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়]

পিয়লি : হ্যাঁ—রমণী, পরিধানে কৃষ্ণবস্ত্র!

ধনঞ্জয় : কালো কাপড় পরা? এখন মনে পড়ছে—ব্রহ্মপুত্রের বুকে দু'খানা প্রমোদ-তরনী নিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিল যে রমণী, তারও পরিধানে যেন ছিল কৃষ্ণবসন!

জন্মি : বড় আশ্চর্য লাগছে! কে এই অজ্ঞাত শুভাকাংক্ষিনী?

পিয়লি : কে তা দ্যাখবার জন্যে নারায়ণ ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু নারায়ণ ধরতে পারার আগেই সেই রমনী তীর থেকে দিখৌ-এর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল।...কী, ভাবছ-ধনুধর? তোমাদের কী মনে হয়?—ভূত-প্রেতের স্থান বলে যে সমাধিস্থলে, রাত্রি তো দূরের কথা, দিনের বেলায়ও কোন রাখাল পর্যন্ত আসে না—সেইখানে গভীর নিশীথে, একজন স্ত্রীলোক একা একা কেমন ক'রে আসে? যদি সত্যি সত্যিই কোন মানবী হয়, তবে সেই রমণী অসামান্যা। আর—যদি দেবী হন, তবে সেই দেবী অসন্তুষ্টা।

ধনঞ্জয় : দেব-দেবালয়ে পূজোর পাট উঠে গেছে ফুকন! স্বাধীন স্বর্গদেবদের আমলে যে মন্দিরের ধূপ-ধুনোর গন্ধ বাতাসকে সুরভিত ক'রে রাখত, আজ সেই মন্দিরে একপাটি ফুলও আর দেবী পান না; তাঁর সামনে একটা প্রদীপও জ্বলে না। দেবী অসন্তুষ্টা হবেন নাই-বা কেন?

পি. বরুয়া : ছ'শো বছর ধ'রে রাজপাটের পর স্বর্গদেবদের দিন যদি আজ সত্যিই শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, যদি সেই সোনার সিংহাসনে সত্যি সত্যি ম্লেচ্ছ-ফিরিঙ্গি বসতে পারে, তাহলে দেখে নিও, দেশে মারী-মড়ক-দুর্ভিক্ষের উজান বইতে থাকবে।

ধনুর্ধর : বরুয়া ভাই! প্রজা লোপ পায়। পাক। দেব-দেবালয়ে ধুলো-ঝুল জমে, জমুক। কেচাইখাতী[1] যদি অহোম রাজবংশ ধ্বংস ক'রে তাঁদের সাতনরী

1. নরবলি-প্রিয়া দেবী। উত্তর আসামে ইনি 'দুর্গা'।

সিংহাসনে ম্লেচ্ছদের বসান, তাহলে তা-ই হোক—গোসানী[1] কেঁদে কেঁদে ফিরুন।

পিয়লি : ও কথা বোলো না ধনুধর! আরতির মঙ্গলবাদ্যে দেবালয় মুখরিত হোক—আসামের ধানক্ষেত ফসলে ভ'রে উঠুক—গড়গাঁও নগর[2] আবার প্রজা-সমৃদ্ধ হয়ে দোলায়িত-আন্দোলিত হোক।—আসাম, সোনার আসাম! প্রকৃতির লীলাভূমি, দেবেরও দুর্গম। স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি এই আসাম! যার জন্যে ধর্ম ছাড়লাম, ভাষা ছাড়লাম—স্বজাতি-স্বজনকে পেছনে ফেলে রেখে নদী-বন-পাহাড় পেরিয়ে এলাম, বুকের রক্ত দিয়ে স্নেহের জন্মভূমিকে উর্বরা করে তুলে শস্যক্ষেত্র করলাম, পাথর ভেঙ্গে দেবালয় গড়লাম—সেই আসামকে ম্লেচ্ছ-ফিরিঙ্গির হাতে তুলে দিয়ে, তাদের সেবা ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরাও শতগুণে বাঞ্ছনীয়।...শোনো তোমরা সবাই। দেশ উদ্ধারের জন্যে শুধু সোনালী পরিকল্পনা করলেই হবে না। এই সমাধিক্ষেত্রে, আমাদের পূর্বপুরুষদের নামে শপথ গ্রহণ করতে হবে। এসো, ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবগণের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে—কেচাইখাতী গোসানীর নামে প্রতিজ্ঞা করি—

[সকলে নতজানু হয়]

পিয়লি : আমরা দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করব—

সকলে : আমরা দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করব—

পিয়লি : আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না—

সকলে : আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না—

পিয়লি : আমরা ফিরিঙ্গিকে মেরে তাড়াব—

সকলে : মেরে তাড়াব।

পিয়লি : স্বর্গদেব! অতিশয় অভাজন তোমার এই কতিপয় প্রজাকে স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, যেন এই উৎসর্গ বিফলে না যায়। আমাদের জীবন গ্রহণ করো—কিন্তু সেই জীবনের বদলে তোমাদের আসামের জন্যে ফিরিয়ে আনো স্বাধীনতার উজ্জ্বল গৌরব।

[সকলে সমাধিতে প্রণাম নিবেদন করে। দূর থেকে গান-বাজনার শব্দ শোনা যায়। শব্দ ক্রমশ কাছে আসতে থাকে। সকলে তাকায় সেই দিকে। নারায়ণ প্রবেশ করে]

নারায়ণ : মেজকত্তা! মেজকত্তা! এ্যাক ঝাঁক মানুস ঈদিকপানেই আইসছে। আমাদিগের গোপন হওয়াইটাই ভাল।

[নারায়ণ প্রদর্শিত দিকে সকলে চায়]

পি. বরুয়া : ওই ঝোপটার আড়ালে গা ঢেকে এদের গতিবিধি দেখি, চলুন।

1. দেবী, রাজলক্ষ্মীও।

2. আসামের প্রাচীন রাজধানী।

পিয়লি : চলো।

[নারায়ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান। সমাধির কাছে একটা গাছের তলায় মুখ বার ক'রে নারায়ণ বসে এবং নাম-কীর্তন শুরু করে। মাঝে-মধ্যে প্যাঁচা, বাদুড় ইত্যাদির ডাকে চমকে চমকে ওঠে]

নারায়ণ : কৃষ্ণ একদেব ভয়হারী
কালমায়া রূপে অধিকারী।

[প্রাচীন অসমীয়া রীতিতে পাগড়ি বেঁধে, চোগা-চাপকান প'রে, লাইন বেঁধে, একদল প্রজার প্রবেশ ও প্রস্থান। পালকিবাহকদের কাঁধে একটা পাল্কি—আরোহী মনিরাম সমাধির প্রতি সম্মানবশত পদব্রজে পথটুকু অতিক্রম করতে থাকে। সঙ্গে, দুতিরাম]

দুতিরাম : তহশীলদার, সমাধিস্থলটা বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা নাগছে, তাই লয় ?

মনিরাম : সমাধিস্থান সর্বদাই নির্জন। শাস্ত্রে বলে—'শ্মশানমেব রৌদ্রম্'।

দুতিরাম : তবু এ্যাট্‌টা কথা। আগের সমাধিগুনা য্যাখন ছিল, য্যানো একটা রজোগুণের প্রভাব বিস্তার করত। আজকের সমাধি দেখলে মনে লয়—য্যান কান্দতেছে।

মনিরাম : ক্যান কাঁদবে না দুতিরাম ? সমাধিস্থানে মৃত রাজাদের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। বেঁচে থাকতে আত্মার যে প্রভাব—মরণের পরে সমাধিস্থ আত্মারও তেমনি প্রভাবের ছায়া থেকে যায়।

[মণিরামের কথা শুনে নারায়ণ ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে দাঁড়িয়ে পড়ে]

—আগেকার রাজারা ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, প্রজাবৎসল, আর এ্যাখনকার রাজারা সব অক্ষম, অকর্মণ্য, স্বার্থপর। নইলে কি আহোম রাজত্বের এই পরিণাম হয় ? প্রেতাত্মারা আজ না কেঁদে থাকে ক্যামন ক'রে ?...আহোম রাজত্বের এখন অস্তাচল—আহোমদের আর রাজপাট ভোগ করতে হবে না।

দুতিরাম : ঠিক বলেছেন—সে রামও লেই, সে অযোধ্যাও লেই।

মনিরাম : চলো, বেলা ক'রে লাভ নেই, অনেকটা পথ যেতে হবে।

[নারায়ণ কাশে, তাই শুনে—]

—আরে, এটা কে ?

নারায়ণ : মুই হে।

দুতিরাম : আরে, কোন্ মুই ?

নারায়ণ : এঃ, কোন্ মুই, এ্যাহন ক্যাম্‌নে বুঝাই ! নিকট-গ্রামের মানুষ হে !

মনিরাম : তা, এখানে তুই কী করছিস ? কেউ যদি তোকে এ সময়ে দ্যাখে, ভূত-প্রেত মনে ক'রে ভয় পাবে যে !

নারায়ণ : আপোনি ভয় পাইলেন নাকি, আইজ্ঞা? ভয় পাবার কি কথা? আপোনারা বড়মানুষ, সাহসের অভাবটা কী?

হুতিরাম : তুই কয়েরছিস্‌টা কী?

নারায়ণ : আইজ্ঞা—মোর কালো কিশোরী গরুটি হারাইছে। তারে খুঁজি ফিরি হেথাকে পঁহুলম। কিনতুক কুথা!...ভূতপেরেতের ঠাঁই, গরুটিকে দানোয় মাইরল নাকি?

মনিরাম : গরু মারলে তো ভালোই; তোকেও কোথাও-না মেরে রাখে।

নারায়ণ : হাঃ! সেই ভয় এই শর্মাটি করে না। ঈশ্বরের কিরপাত সকলি এই ধুতির খুঁটেতে আছে। নিকটেই বসতি। নতুবা, এই সময়ে এইভাবে অকলে এই ভয়ঙ্কর ঠাঁইতে ঘুরি-ফিরা-করা মানুস কয়জন হে?...তা'পর, মহাশয়গণ! যাইবেন কুথা? বড় মানুসের সমাগম দেহি যে!

হুতিরাম : অ'—খবর পাস নাই বুঝি? আজ অর্জুনাগুঁড়িতে সভা বইসবে।

নারায়ণ : মেলা? কিসের মেলা?

[মনিরাম ও হুতিরামের সংলাপের মাঝে-মাঝে নারায়ণ 'হাঁ', 'আচ্ছা', 'ঠিক', 'বেশ', ইত্যাদি শব্দ দিয়ে অনর্গল সম্মতি জানাতে থাকবে। উদ্দেশ্য—ভেতরের খবর বা'র ক'রে নেওয়া]

হুতিরাম : দরবার রে, দরবার। সাহেব বাহাদুররা সব আইসবেন। সমাজপতিরাও যাইবেন। পার্বতীয়া রাজা-রাজড়ারাও আইসবেন। সাহেবদের খুশি করার জন্যি নাচনী...নাচ-গান...এসবেরও ব্যবস্থা করা হইলছে।

নারায়ণ : বটে! বেশ বেশ। অহমীয়া মাইয়া নাচণ্‌ন করি সাহাবদিগকে ভাল লাগাইতে পারে ত' ও মোদেরই ভাইগ্‌গ। তেনাদিগেরও সাহসিকতা বৃদ্ধি পাবে। তা, কই কি—কোন্ উদ্দেশ্যে দরবার?

হুতিরাম : সাহেব সরকারকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যি। এই সাহেবরাই তো বদমাশ বর্মীদের হাত থিকে আমাদের বাঁচয়েছে রে।

নারায়ণ : ঠিক।

মনিরাম : এরা না থাকলে আসাম ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত।

নারায়ণ : হয়ত' খণ্ড-বিখণ্ড হৈ যিত। সইত্য। কিনতুক, সকলে ঐক্য হ'লি আমাদিগের ভিতরেতেই বর্মী-খেদা মানুসের—কিবা বলে না—অভাবটি হয়ত' নাও হইত'। আইজও দ্যাহেন, এ্যাকখান দা লৈ শ্মশানে-মশানে অকলে ঘুরি-ফিরা-করা মানুস আছে—হেহ্‌, নরমনিস বর্মীদিগের কথা কি—অশরীরী ভূতপেরেতই যে পথ ছাড়ি দেয় ঈশ্বরেরকিরপাত।

হুতিরাম : তুই যা বুললি, কথাটা ঠিকেই। কিনতুক আমাদের ভিতরেই যে কোন শৃংখলা নাই—দেখতি পাচ্ছিস না? আমাদের মধ্যি যদিচ মানুষ আছে। তবু সাহেবরা যাামোন গোরা, লম্বা আর হৃষ্টপুষ্ট—হ্যাঁ? দেখলেই সেলাম করতি ইচ্ছেটা যায় বটে।

নারায়ণ ঃ হ্যা-হ্যা —নিশ্চয়—যাবেই তো বটেন। গোহালের গরু আর বরষার ঘাসে যে মিলনটা আছে! তদুপরি, এ্যাটট্টা কথা কি ভাবি দেহিছেন? সাহাবদিগের শ্বেত আচরণের ওপরে যে খুনী বিষফোঁড়ার বাসা, তেনাদের অলপ নিকটে গেলেই ধরতি পারবেন। এই খুনখারাপী ফোড়া বড় পাজী ব্যাধি হে! অবশ্যে—সাহাবে কয় বলে, খুন ফোড়ার চুলকানি উইঠলে আঁচড় দিয়াটা বড় সুস্বাদু লাগে! তাই ভয় হয়—এই আধা-শুকনা পিরিতির বিকিকিনি কয় দিবস থাকে!...হ্যা—বর্মী খে'দলে সত্য, কিনতুক—বালির কারণে শরকাঠি, সুগ্রীবের কারণেও সেই একই শরকাঠি বুলি মনে লয় যে!

মনিরাম ঃ কোথাকার লোক রে তুই? তোর কথাগুলোর মধ্যে যানো একটু খোঁচা মারার আভাস পাচ্ছি!

নারায়ণ ঃ যথার্থ! সংসারখান দেহি দেহি বুড়া হ'লম—দুটা-এ্যাটট্টা খোঁচা মারা জানব নি?

দুত্তিরাম ঃ এ্যাই—কথা কবার সময় এটটু ভাবিচিন্তি বুইল্বি ত! মানুষজন দেখি মুখ খুলবি। দেশেতে রাজা কেউ লাই বু'লি আমলাদের মান-মর্যাদাও কি একেবারে উধাও হৈ গেছে?

[নারায়ণ দুত্তিরামকে একটা দীর্ঘ প্রণাম জানায়]

নারায়ণ ঃ হরি হরি! দায়দোষ ধইরবেন না দেব্‌তা। কনা মানুস, অলপ খোঁচা মা'রলে তবেহে দিশা পাই। সাতপুরুষের—কিবা বলে না—হাঁটুর ছাল ছিঁড়ল বড়দিগের সেবা করিয়েই; আর এ্যাহন,—এটা আর মানি লব নে? আসলে, সঠিক করি চিন্‌তি পারি নাই। (মনিরামকে দেখিয়ে)—ইনি কে বটেন?

দুত্তিরাম ঃ ইনি আমাদের মনিরাম তহশীলদার—কলিতা[1] রাজা।

নারায়ণ ঃ হরি হরি! (প্রণাম করে)—দেব্‌তারও যাহন তত্রস্থলে আগমন, প্রজাগণও তথা বেশ গভীরই হবে, মনে লয়। মুইও ঘর থিক্যা আহি যৈছি তা'লে। মেলাখান বেশ মনোহারিনী হবে মনে লয়। ভাল্ দেব্‌তা, এ্যাহন তবে—

[দীর্ঘ প্রণাম জানায়]

মনিরাম ঃ বুঝতে পেরেছিস তাহলে? সাহেবদের সম্বন্ধে তুই যে কথার আভাষ দিলি, আমাদের মনেও সে সব কথা জেগেছে। কিন্তু সাহেবরা সত্যিই আমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। ওদের ধাক্কা দেওয়া খুব সহজ নয়—বুঝেছিস?

নারায়ণ ঃ হৈছে দেব্‌তা। আপোনাদিগের ন্যায়, অজ্ঞ-মানুস যাহন এতাদৃশ বিজ্ঞ বাইকৃক প্রহার করে, আমোরা ইতরজনের আর কী কথা!...অর্জুনসুঁড়ির মেলাতে নিশ্চয় করি যাওয়া হবে।

1. একটা গোষ্ঠীর নাম।

[নারায়ণ প্রণাম করে। মনিরাম ও দুতিরাম প্রস্থান করে। নারায়ণ কিছুক্ষণ ওদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকে]

নারায়ণ : সাহাবদিগকে খেদ়কা দিয়াটা কঠিন! এই স্থানে, আইজ, অসমের ডাঙর ব্যক্তিদিগের মুখ থিক্যা এই বাইক্ক বাইর হ'ল! যাদিগের চোখের ইঙ্গিতে শত্রুর মালাইচাকী, চোখের মনি উল্টি পড়িছিল, যাদিগকে দেহি বনের বাঘ পথ ছাড়ি দিছিল—যাদিগের চোখের ইঙ্গিতে বনের হাতি নতজানু হৈছিল—যাদিগের আঁখির ইশারায় পাঙ্খে নাও পক্ষী-স্বরূপ জলস্থলে উড়ি ফিরিছিল—তাঁদিগের মুখেতে এই কুকথা!...থুঃ থুঃ থুঃ!

[পিয়লি, ধনুধর, জন্মি, ধনঞ্জয় এবং পিয়লি বরুয়ার প্রবেশ]

পিয়লি : কী দেখলি নারায়ণ?

ধনঞ্জয় : শরীরী না অশরীরী?

নারায়ণ : জীবন্ত শরীরী! (পিয়লি ফুকনের প্রতি)—এই জাতের মানুসও থাকে, মানে, সকলো কথাই বিফলে যাবে য্যান মনে হয়। এই জাতের মানুস—যত্তো সব ভাগাড়ের জীব। এ্যামন উত্তেজনা জাগে—এ্যাট্টা চড়েতেই অমানুস কইর‍্যা ফেলি।

পিয়লি : তুই কার কথা বলছিস্ নারায়ণ? কী হয়েছে?

নারায়ণ : আর কার কথা কই মেজকর্তা—এই কলিতা না সলিতা রাজাটার কথাহে কৈছি।

পিয়লি : কে কলিতা-রাজা?

নারায়ণ : এইমাত্র মনিরাম ত'শীলদার পাইক পিয়াদাসহ, বড় পাগড়ি মারি—কিবা বলে না—অর্জুনগুড়ির মেলাতে যৈছে—সাহাবদিগকে সেলাম ঠুকিবে! তাঁহারা নাকি মহৎ, শ্রেষ্ঠ, শ্বেত—আমাদিগকে শাসন করিবার যোগ্য—তাঁহাদিগকে আঘাত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আবার কয় কি—আসামের নাকি এ্যাহণ অন্তকাল! কয় না—কালো কাল বিপরীত কাল, হরিণে চাটে বাঘের গাল! হ্যা, তাঁহারা কোন্ লংকা দ্বীপ থিক্যা আহিছেন? হুঁ, সাহাব কি এ্যাট্টা অশরীরী নাকি?

পিয়লি : সবই জানি নারায়ণ। কিন্তু কোন কিছুই আমাদের কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে পারবে না।

ধনুধর : আচ্ছা। মনিরাম যাচ্ছে তাহলে? আর কে কে যাবে?

নারায়ণ : পার্বতীয়া রাজা ও প্রধানগণ। আমাদের দেশের জ্যেষ্ঠগণ সকলেই। আবার কয় যে, বার' শ্রেণীর প্রজাসমূহকেও নাকি আমন্ত্রণ ক'রছে। মেলা বেশ ডাঙর হবে বুলি মনে লয়। এ্যাহন কে কি পালা অভিনয় করেন, সেইটা কইতি পারি না।

পি. বরুয়া : সমতলের ভেড়াদের তো কথাই নেই—এরা নাকি পাহাড়ের লড়াকু মোষদেরও নাক বিঁধিয়ে হাত করার চেষ্টায় আছে।

ধনঞ্জয় : জাল বেশ বড়ো করেই পেতেছে।

নারায়ণ : জাল ডাঙ্গর ত' বটেনই, এবং ঘনো। রাঘব-বোয়ালের ত' কথাই নাই, পুঁটি-খল্‌সেদিগেরও পলায়নের উপায় নাই।

পিয়লি : তথাপি চেষ্টার ত্রুটি করা হবে না। ধনঞ্জয়, ধনুধর! তোমরা সব প্রস্তুত হও। অর্জুনগুঁড়ির মেলাতেই যদি প্রয়োজন হয়, তবে বিদ্রোহ করতে পরাঙ্মুখ হব না। তোমরা নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত। মনিরাম তহশীলদারের মতো লোকও যখন শ্বেত বিদেশীর সামনে নতজানু হবার জন্যে দৌড়চ্ছে—তখন আর আসামের নিস্তার নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবু, প্রদীপ নিভে যাবার আগে দেশকে একবার এমন দাউদাউ ক'রে জ্বালিয়ে দেব যে আমার মতো একজন খঞ্জের জীবন শেষ হয়ে যায় যাবে, তোমরা থাকবে—তবু দেশকে খোঁড়া হয়ে যেতে কখনও দেব না!

[পর্দা নামে]

অর্জুনগুঁড়ির মেলা

[সময় অপরাহ্ন। প্রকাণ্ড এক অর্জুন গাছ। গাছের তলায় জনতা। তারা জায়গায়-জায়গায় ঝাঁক বেঁধে ব'সে গাঁঠি[1] থেকে সুপারি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে খাচ্ছে। গাছের তলায় একপাশে চন্দ্রাতপ টাঙানো। তার ছায়ায় উঁচু-উঁচু ঢিবির ওপর কয়েকটা 'তামূলী পীরা'[2] পাতা। পিঁড়ের ওপর কার্পেট বিছানো। পিঁড়ের সামনে একটা ক'রে পান-সুপুরির সরা। হরনাথ বরুয়া এবং দুতিরাম বরুয়া প্রজাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে, জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে। দলে দলে, ঝাঁক বেঁধে, মানুষ আসছে তো আসছেই। গায়ক-বাদক, বিহু-নর্তকী, গড়গাঁও-নাচনী। সুসজ্জিত ওজা-পালি—সবাই একদিকে বসে আছে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দুজন নাগা যুবক]

হরনাথ : বরুয়া! মিরিগাম তো এ্যাখনও আসি পৌঁছল নি!

দুতিরাম : তাইত'! সীমান্তরাজাদের মধ্যে আমাদের চিংফৌগামও অনুপস্থিত।

হরনাথ : তালে ?...আমাদের ভোগরাম গাঁওবুড়োকে[3] দিখৌ-এর ঘাটে আগিয়ে নিয়ে দেখতি বলেন ত'। সাহাবদের আসার আর বেশি দেরি নাই। তাঁদের

1. বটুয়া।
2. শ্রদ্ধেয়দের জন্যে বিশেষ আসন।
3. মোড়ল।

আগমনের পূর্বেই আমাদের সব প্রজা আসি যাতে ঠিক-ঠিক জায়গায় বসে, সিদিকে আপনি একটু চোখ রাখবেন, বরুয়া।

দুতিরাম : ঠিক আছে। এ্যাখনই দেখ্‌তেছি।

[দুতিরামের প্রস্থান। দূরে গায়ক-বাদকের খোল-বাঁশি-কাঁসির শব্দ শোনা যায়। মনিরাম প্রবেশ করে]

মনিরাম : দারোগা মশাই, রাজকর্মচারীরা সব এসে গেছেন। ওঁদের আলাদা জায়গায় বসার ব্যবস্থা ক'রে দিন।

[কয়েকজন রাজকর্মচারীর প্রবেশ। হরনাথ ও মনিরাম সশব্যস্তে তাঁদের অভ্যর্থনা করে। তাঁদের সঙ্গে আগত ভৃত্যরা বসার জন্যে কম্বল-চাদর ইত্যাদি পেতে দেয়। রাজকর্মচারীরা বসেন]

হরনাথ : ত'শীলদার! সাহাবদের আসার সময় হৈছে। আপনি একটু আগ বাড়িয়ে যাবেন নে কি?

মনিরাম : ঠিক—এগিয়ে গিয়ে দ্যাখাটাই উচিত হবে।

[দুজন ভৃত্যের সঙ্গে মনিরামের প্রস্থান। একটু পরে সাহেবের কাফ্রী ভৃত্য টমের প্রবেশ। কালো ট্রাউজার, কালো ওয়েস্‌ট্‌ কোট, শাদা ফুলশার্ট, গলায় কালো বো-টাই। পকেটের সঙ্গে চেন লাগানো পকেট-ঘড়ি। সভায়, নতুন নতুন ধরণের জিনিস, বিচিত্র সাজের মানুষ দেখে। সকৌতূহলে ঘুরে ঘুরে বাঁশের ছাতা, ঢোল ইত্যাদি হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখতে থাকে। অবশেষে, সাহেবদের জন্যে সাজিয়ে-রাখা চেয়ারগুলো নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে]

টম : Alright—

[পার্বত্য চিংফোগাম এবং মিরিগামের প্রবেশ। সঙ্গে দুতিরাম। টম তৎক্ষণাৎ চিংফোগামের কাছে যায়। হরনাথ মিরিগামকে অভ্যর্থনা জানায়]

হরনাথ : আসেন, আসেন, গাম—

[মিরিগাম তার জন্যে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসে]

টম : You are Red Indian? (গলার মালা টিপেটাপে দেখতে যায়)—What is this? Gold? Give me—

[মালা ধ'রে টানে। চিংফোগাম রেগে উঠে টমকে একেবারে থাবা মেরে ধরে]

চিং গাম : ধোৎ কালা বিল্লী। ঘাড় ধরি থাবা মারে কেনে? আমি চিংফোগাম আছে—রাজা আছে।

টম : No fear. (হাত বাড়িয়ে)—Give me, friend—

[ক্রুদ্ধ গাম বর্শা ওঠায়। ব্যাপার গুরুতর দেখে হরনাথ বরুয়া দুজনের মাঝখানে প'ড়ে বিবাদ মিটিয়ে দেয়]

হরনাথ : কি করেন, কি করেন, গাম ! এ রসিকতা করতিছে ! আপনার বস্তু নিবে নি । এই সকল বস্তু পূর্বে দ্যাখে নাই...নতুন দেখছে, তাই টিপে-টাপে দেখতিছে !—

[ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গাম চিক্‌চিক্ করে হাসে এবং টমের গলায় মনি-মালাটা পরিয়ে দেয় । টমও গামের হাত ধরে, হেসে হেসে, গামকে এগিয়ে দেয় । এই সময়ে বাঙ্গালী পেশকার প্রবেশ করে]

পেশকার : দেখুন, সাহেবেরা এলেন ব'লে । এদিকে সব ঠিক আছে তো ? এদের একটু সরে বসতে বলুন না । আঃ—তোমরা কি জংলী—রাস্তাটা ছেড়ে ব'স না । (হরনাথকে)—লাল কাপড়টা ঠিক আছে তো ? দিন না, এখনই ঠিক ক'রে পেতে দিচ্ছি ।

[ভৃত্যিরাম সাহেবদের আসার পথে লাল কাপড় পেতে দেয় ; পেশকার কাপড় পাততায় সাহায্য করে]

টম : (পেশকারকে) মিস্টার ! Lo ! সাব্ Coming.

[পেশকার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় । নেপথ্যে কাঁসি-খোল-ঢোল-ডগর-বাঁশি ইত্যাদির শব্দ । গায়ক-বাদকেরা খোল-কাঁসি বাজিয়ে সাহেবদের সসম্মানে নিয়ে আসে । গায়ক-বাদকেরা আগে প্রবেশ ক'রে সমে ঘা মারে । সঙ্গে-সঙ্গে চারজন সশস্ত্র গোরা সৈন্য মার্চ ক'রে এসে দু-পাশের নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্তুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে । অতঃপর মনিরামের সঙ্গে প্রবেশ করে কর্ণেল কুপার, নিউভিল, পাদ্রী এবং মেথী । সাহেবদের আগমন-মাত্রেই সভার সকলে দণ্ডায়মান হয় । সাহেবরা সকলকে নমস্কার জানিয়ে সুসজ্জিত সুরক্ষিত আসনে উপবেশন করে]

হরনাথ : (মনিরামকে) ভ'শীলদার ! সাহেবদের অনুমতি নিয়্যা আমাদের কাজ আরম্ভ করা ভাল ।

মনিরাম : হ্যাঁ, দারোগা মশাই । (আসন থেকে উঠে কুপারের প্রতি)—কর্ণেল সাহেবের অনুমতি হলে আমরা সভার কাজ আরম্ভ করতে পারি ।

কুপার : Yes, yes—by all means.

মনিরাম : (নির্দেশসূচকভাবে) দারোগা মশাই ।

হরনাথ : প্রথমে—বিহু নাচ । অহে ছোকরারা, আরম্ভ করো ।

[ঢোল, পেপা,[1] টকা[2] নিয়ে বিহু-নাচিয়ে যুবকরা উঠে আসে]

মনিরাম : কর্ণেল সাহেব ! এ হচ্ছে অসমীয়া জাতীয় উৎসব বিহুতে খুশি-আনন্দের নাচ-গান ।

1. বাঁশি ।
2. বাঁশের ক্ল্যাপার

[ঢোল-বাঁশি-খঞ্জনী-কাঁসি বাজিয়ে যুবকরা বিহু-গীত আরম্ভ করে ; ঢোলের তালে-তালে একজন বিহু-নৃত্য নাচতে থাকে।...

নাচ-গান শেষ হওয়ার পরে, কুপারের নির্দেশ মতো পেশকার বিহু-গাওয়া যুবদলটিকে টাকা দেয় পুরস্কার হিসেবে। সকলে নমস্কার জানিয়ে নিজ-নিজ স্থানে গিয়ে বসে]

মনিরাম : এর পর ?

হরনাথ : বহুয়া[1] গীত।...ও বহুয়া দাদা !

[মূকাভিনেতা মূকাভিনয় ক'রে দেখায়। শেষে, পুরস্কার গ্রহণ করে, নমস্কার জানিয়ে, স্ব-স্থানে গিয়ে বসে]

হরনাথ : এইবার ওজা-পালি। ওজা দাদা !

[ওজা-পালি উঠে এসে করজোড়ে প্রণামান্তে দাঁড়িয়ে থাকে]

মনিরাম : কর্ণেল সাহেব ! আমাদের দেশে এই ওজারাই গীত-অভিনয়ের সাহায্যে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করে।

[ওজা-পালি ওজা গান গায়। শেষে, পুরস্কার নিয়ে, নমস্কার জানিয়ে, আগের জায়গায় গিয়ে বসে]

হরনাথ : এ্যাখন সত্রীয়া[2] নাচ হবৈ।

[অসমীয়া নট মুখোশ প'রে অভিনয় করবে। রাবণ, বকাসুর, জাম্বুবান ইত্যাদি চরিত্র-কেন্দ্রিক যেকোন একটা বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে তার নৃত্য-পরিকল্পনা ক'রে দেখাবে। দরকার হলে, দ্বিতীয় একটি চরিত্রেরও অবতারণা করা যেতে পারে। দর্শকরা এগুলি উপভোগ তো করবেই, উপরন্তু লুপ্ত প্রায় মুখোশ-নৃত্যের (Mask-Dance) পুনঃপ্রচলনে রঙ্গমঞ্চ-সহায়ক হবে।

এই দৃশ্যে বিহু নাচ, বহুয়া-গীত, ওজা-পালি এবং সত্রীয়া নাচ আদি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, সে প্রসঙ্গে কোন বিস্তৃত নির্দেশ না দিয়ে স্থানীয় শিল্পীদের ওপরেই এই দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছে। তাঁরা স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী নাচ-গান-সুর ইত্যাদির পরিকল্পনা ক'রে দৃশ্যস্থলে সেগুলির প্রযোজনা করবেন।

সত্রীয়া নাচ শেষ হল। তারপর—]

হরনাথ : নাগা বালকগণ ! এইবার তোমরা আস।

[হাতে লাঠি নিয়ে নাগা বালকদ্বয়ের প্রবেশ]

1. ব্যঙ্গাত্মক মূকাভিনয়।
2. বৈষ্ণব আখড়ার নাচ।

মণিরাম : কর্ণেল সাহেব। এরা দুজন নাগা কিশোর—নাগা পাহাড় থেকে এসেছে। এরা নিজেদের অঞ্চলের এ্যাকটা জাতীয় নাচ দেখাবে।

কুপার : That's very nice. Let them begin.

[নাগা বালকরা নাচ আরম্ভ করে। সাহেবরা মাঝে মাঝে 'Nice, Bravo, Splendid' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে প্রশংসা করতে থাকে। নাচ শেষে নাগা নর্তকদের পুরস্কার দেওয়া হয়]

মনিরাম : এর পর ?

হরনাথ : এইবার গড়গঞ্জা-নাচনীর[1] গীত।

মনিরাম : এ হচ্ছে গড়গাঁওয়ের নর্তকী। অসমীয়া রাজাদের আমলে এরাই নৃত্য-গীতের সাহায্যে তাঁদের সন্তোষ বিধান করত।

[ঢুলী বসে থাকা অবস্থায়ই এক ঝটকা ঢোল বাজিয়ে দেয়। নর্তকী ধীরে ধীরে গান আরম্ভ করে এবং ভঙ্গিমা সহকারে নাচতে থাকে]

নর্তকী : (গান) ঢোলের তালেতে না উঠে নাচি ঐ
উলাসে না নাচে গা ;
কেতেকী-চড়াই[2] কাঁদনী না জোড়ে
না চলে মলয়া বা—
মোর বঁধুহে— না চলে মলয়া বা ॥
হরিণী কোথা যে কান্দে !
ঝর্না-তলাতে না আসে হরিণী
না পড়ে জলেতে ছা'—
মোর বঁধুহে— না পড়ে জলেতে ছা' ॥
নাচঘরের মেঝেতে নাচনীর না বাজে নূপুর
বাঁশিওলার বাঁশিতে ঐ না বাজে বিলাসের সুর ;
মন্দিরে থাপনায়[3] প্রদীপ না জ্বলে
নিরব নামের রা[4]'—
মোর বঁধু হে— নামের নিরব রা ॥

[নৃত্য গীত চলতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কুপার সাহেব, দাঁড়িয়ে উঠে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সভার বিভিন্ন স্থানে বসে থাকা মানুষজনকে দেখতে থাকে।...এই সময়ে দূরে একটা পালকি দেখে উৎসুকভাবে নিউভীলকে দূরবীনটি দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে শুধোয়—]

1. প্রাচীন অহোম রাজধানী গড়গাঁও-এর নর্তকী।
2. গ্রীষ্মকালের পাখি।
3. নাম-গান।
4. আসনে রাখা ধর্মগ্রন্থ।

কুপার : Who is coming on the palanquin ?

[কুপার ও নিউভীল উঠে গিয়ে ভালো ক'রে দেখে। সঙ্গে মনিরাম এবং হরনাথও যায়]

নিউভীল : Must be someone of high social position. Who is that coming, Tehshildar ?

মনিরাম : (ভালো ক'রে দেখে নিয়ে) বোধহয় পিয়লি ফুকন।

কুপার : পিয়লি ফুকন ?

মনিরাম : বর্মীদের ডেকে এনেছিল যে বদন, তারই ছেলে পিয়লি। ইনি খোঁড়া, lame, পাল্‌কি ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না।

কুপার : (নিউভীলকে) I see. We must keep an eye on this man.

[কুপার ও নিউভীল ফিরে গিয়ে বসে। মনিরাম হরনাথকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধোয়—]

মনিরাম : দারোগা মশাই ! পিয়লি ফুকনকে কি ডাকা হয়েছিল ?

হরনাথ : বলতি পারব নি। মোর ফর্দে তাঁর নাম নাই।

[ইতিমধ্যে নৃত্য-গীত উচ্চগ্রামে ওঠে, এবং সকলে কথাবার্তা বন্ধ ক'রে নাচ-গানে মন দেয়। পিয়লি ফুকন এসে জনতার মাঝখানে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যায়। দর্শক পিয়লিকে নাও দেখতে পারে। প্রজাদের মধ্যে ব'সে থাকা নারায়ণ উঠে পিয়লির দিকে একবার তাকিয়ে আবার ব'সে পড়ে]

হরনাথ : ত'শীলদার ! নাচ-গীতাদির আয়োজন অ•.পর সাঙ্গ হল। এ্যাখন আমাদিগের পর্বতীয়া রাজারা সাহাব সরকারকে দিবে বলি যে উপঢৌকণ আনছে, সেগুলা দিয়া হোক।

মনিরাম : ভালো কথা।...কর্ণেল সাহেব ! এঁরা সব আসামের সীমান্তবর্তী পার্বত্য রাজা। আসামের বিশাল বক্ষের সন্ততি। প্রত্যেকে উচ্চবংশজাত।

[কুপার উঠে গিয়ে পার্বত্য রাজাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে। মনিরাম এক-একজনকে পরিচয় করিয়ে দেয়। কুপারের সঙ্গে সঙ্গে নিউভীল এবং মেথীও যায়। অতঃপর সকলে স্ব স্ব আসনে বসে]

মনিরাম : সাহেব। এঁরা সব আপনাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, অনেক দূর থেকে এই সভায় এসেছেন। আপনাদের দেবার জন্যে নিজের নিজের দেশের কিছু বাছাই করা উপহারও এনেছেন। মান্যজনদের এভাবে মান্য দান করা আমাদের দেশের দস্তুর। আশা করি, কর্ণেল সাহেব উপঢৌকণ গ্রহণ ক'রে রাজাদের আনন্দ বৃদ্ধি করবেন।

কুপার : That's alright. Let them come...Tom !

[টম দ্রুতপদে এসে কুপারের সামনে দাঁড়ায়]

টম : Yes, sir—

কুপার : Haven't we brought the casket of cigarettes ?

টম : Yes sir—!

[টম সিগারেটের বাক্সটা এনে কুপারের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে]

মনিরাম : দারোগা মশাই ! খাসিয়া সিয়ামকে আসতে বলুন ।

[হরনাথ খাসিয়া সিয়ামকে কুপারের কাছে এগিয়ে দেয় । মনিরাম পরিচয় করিয়ে দেয়]

—ইনি খাসিয়া-রাজ—খাইরামের[1] সিয়াম ।

কুপার : How do you do ?

খা. সিয়াম : খুব্‌লাই[2] সরকার বাহাদুর ! আমি খাসিয়া সিয়াম আছে । আমি ব-হু-ত আজ্ঞিবাহ করিছিলে ; কিন্তু মান[3] আয়া আমাকে ব-হু-ত জুলুম করিলে । গোরা পল্টন নাই আয়িলে আমি সমূলে মরিতম । আমি সরকার বাহাদুরকে ব-হু-ত সেলাম দিছে । বহুত বহুত খুব্‌লাই ।

[একটা ফুলকাটা খাসিয়া কাপড়, কিছু ফলমূল, অল্প পরিমাণ মধু এবং একজোড়া তীর-ধনুক কুপারের দিকে এগিয়ে ধরে । কুপার গ্রহণ করে]

কুপার : Thank you very much...khasi chief ! We shall never forget your gratefulness. বহুত ধন্যবাদ । হামি টুমার উপর বহুত খুশি হৈছে ।... Tom !

[টম তৎক্ষণাৎ সিগারেটের বাক্সটা খুলে ধরে । কুপার তা থেকে কয়েকটা সিগারেট বা'র ক'রে খাসিয়া-রাজাকে দেয় । এদিকে, মেথী ও নিউভীল জিনিসগুলো ছুঁয়ে-টিপে দেখতে থাকে । মেথী ফুলকাটা কাপড়ের ভাঁজ খুলে নিয়ে বলে —]

মেথী : This is beautiful !...Hand-woven !

[মেথী কাপড়টা অন্য সাহেবদের দেখায় ! সবাই প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে 'Nice', 'Beautiful' এইসব বলে]

মনিরাম : এইবার আপনি আসুন—গারোগাম ।

[হরনাথ গারোগামকে এগিয়ে দেয় । কুপার গামের সঙ্গে করমর্দন করে । গারোগাম একটা বাঘের ছাল এবং বাঁশের তিনটে চোঙা কুপারকে দেয় । চোঙাগুলোয়, এক-একটাতে, কয়লা, লোহা, লাক্ষা ভরা । নিউভীল বাঘের ছালটা গায়ের ওপর জড়িয়ে নেয় । সবাই হেসে ওঠে]

1. স্থান । 2. ধন্যবাদ । 3. বর্মী ।

নিউভীল : I am a tiger—হামি রয়েল টাইগার আছে। হামি ভেড়া, গরু সব সাফ্ করিতে ফারে।

[ইতিমধ্যে মেথী একটা চোঙার মুখ খুলে নীচু হয়ে দেখে এবং উৎফুল্ল হয়ে বলে—]

মেথী : Look here, Captain ! What are these ? Look, this is coal !

[কুপার চোঙাটা নিয়ে কয়লা বার ক'রে দেখে]

কুপার : A land of minerals ! We have discovered an asset to the Company !

গারোগাম : এইটা 'নাগমাটি' আছে সাহেব। আমাদের পর্বতের নাগমাটি।

মেথী : টুমি পর্বতমে নাগমাটি ফাও ?

মনিরাম : হঁ্যা, ক্যাপটেন সাহেব! গারোপাহাড়ে নাগমাটির আকর আছে।

মেথী : হামাকে রাস্তা বাত্লাতে ফারিবে ?

মনিরাম : হঁ্যা—পারব।

[অন্য দুটো চোঙা থেকে মেথী একটু ক'রে লোহা এবং লাক্ষা বার করে]

মেথী : And lo ! This is iron and this ie lac ! টুমাদের পর্বতমে আছে ? এই চীজ্ টুমাদের পর্বতমে ফাও ?

গারোগাম : পাই সরকার।

মেথী : By jove ! What a resourceful country ! বহুত সমৃদ্ধিশালী দেশ আছে ! Colonel ! Do whatever you like with your military operation. But, please, give me a chance to unearth the hidden treasures.

নিউভীল : Don't you be impatient, Lt. Mathe. (চিংফোগামকে)— আপনি কী আনছেন রাজা বাহাদুর ?

মনিরাম : আসুন চিংফোগাম !

[চিংফোগাম চা-গাছের একটা চারা এনে কুপারের সামনে তুলে ধরে। সাহেবরা চারাটাকে চিনতে না পেরে, ঠাট্টার সুরে,—'whats that !' 'whats that !' বলে হাসে]

চিংফোগাম : এইটা 'ফিনাপ' আছে। আমি শুনিছে, তুমিলোকে 'ফিনাপ' বড় ভালবাসে। সেই দেখি আমি তুমালোকের কারণে ফিনাপ আনিছে।

কুপার : (মনিরামকে) 'ফিনাপ' কী আছে ?

মনিরাম : কর্নেল সাহেব ! এটা হচ্ছে চা-গাছের চারা। Tea-Tea !

[সাহেবরা 'Tea' বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে]

মেধী : Good God ! Tea ! তুমালোগ পর্বতমে Tea কি ফাও ? কোথা ফাও ? কোন্ পর্বতমে ফাও ?

মনিরাম : আমি কিছুদিন আগে চিংফৌ এবং চাপলিকা পাহাড়ের ওপরে বুনো চা-গাছ পেয়েছিলুম।...তাছাড়া—চেলেম্ এবং চিনীমরায় দুটো ছোটখাট চা-বাগান খোলার চেষ্টাও আমি করছি।

নিউভীল : Then you are the discoverer of tea ?

মেধী : হামাকে টুমার Tea-garden দেখাতে ফারে ?

মনিরাম : আচ্ছা সাহেব—সুবিধে মতো দেখিয়ে দোব।

মেধী : Thank you, thank you very much, Look here, gentlemen ! If we can somehow start some tea-gardens here—By jove ! What an enterprise !

কুপার : But let us finish the business first...ত'শীলদার। আমি হামার সভা ভঙ্গ করিতে ফারে ?

[ইতিমধ্যে টম উপহার দ্রব্যগুলি গুছিয়ে নেয়]

হরনাথ : ত'শীলদার মশাই, প্রজাদিগের পক্ষ থেকে আপনি দুইচারি কথা বলেন।

[মনিরাম প্রস্তুত হ'য়ে সসম্ভ্রমে সাহেবদের উদ্দেশ্য ক'রে, সবাইকে শুনিয়ে বলে—]

মনিরাম : স্বাগত ইংরাজ অফিসারবৃন্দ। অসমীয়া প্রজাদের পক্ষ থেকে আজ আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ছ'শো বছর শান্তিতে বাস করার পরে, শান্তিপ্রিয় অসমীয়া প্রজাদের ওপরে কাঁচা-মাংস-খেকো বর্মীরা অত্যাচারের যে তাণ্ডব লীলা বইয়ে দিয়েছিল, তা বর্ণনারও অতীত। দেশ এখনও অস্থির, প্রজারা এখনও অশক্ত। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে—বর্মীদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে গোয়ালপাড়া থেকে ব্রিটিশরা যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল, সেই ঘোষণা অনুসারে, আসামে শান্তি স্থাপন এবং ঐতিহ্য-সম্মত শাসনের ব্যবস্থা ক'রে আপনারা য্যানো প্রজাদের প্রীতিভাজন হন।

কুপার : Long live Britannia !

[এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে কুপার মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে। অন্যান্য সাহেবরাও টুপি খুলে, দাঁড়িয়ে, সম্মান প্রদর্শন ক'রে আবার বসে]

—Though victors, we know how to treat the vanquished. হামি টুমালোগের খাতির দেখি বহুত খুশি ফাইছে। টুমালোগের সব বাট্ হামি কোম্পানী আউর গভর্ণর জেনারেলকো পাস পেশ করিব, বিলকুল জানাব। You know the British policy stated on the proclamation issued from Goalpara and we have only discharged our lawful duties. হামিলোগ হামার কাম করিছে। হামার Governor General—বড়লাট

বাহাদুর জব্ শুনিলে—নির্দোষী অসমীয়া আদমীকা উপর বার্মীজ লোগ অত্যাচার করিছে, জুলুম করিছে, তব্ হামার গোরা ফৌজ ভেজি দিলে। কোম্পানীর গোরা ফৌজ সারা হিন্দুস্থানকো ঠাণ্ডা বনাই দিলে। বার্মীজরা বহুত চোট্টা আছে। হামার গোরা পল্টনকা সাথ পঞ্জাব লড়াই করিলে, মারাঠা লড়াই করিলে, নিজামশাহী ফৌজ লড়াই করিলে। হাঁ—বঙ্গালীভী লড়াই করিলে ; এক এক বারে সারা হিন্দুস্থান লড়াই করিলে—লেকিন হামার গোরা পল্টন সব্লোগকো হঠাই দিলে। হামাদের এক-এক কামান ডাগিলে দুষমনলোগ দশ-দশ মাইল হুটি যাবে।

But, gentlemen ! আভি এই দেশমে হামিলোগ দুষমনলোগকো নিকাল দিছে। দেশমে শান্তি আনি দিছে। পর্জাকো কোঈ দুখ নাই আছে। আভি টুমলোগ সব্ হামিলোগকা সাথ্ নিরাপদ আউর শান্তি কো ওয়াস্তে দোস্ত হোকে সহায়তা করিতে হইবে।

হরনাথ : সত্য, সত্য, সাহাব ! গোরা পল্টন আসার সাথে সাথেই বর্মীরা পলায়ন করল। আপোনাদের ভরসাতেই মোরা এ্যাখন শান্তিতে শ্বাস নিতে পারছি। আপোনাদের সদ্নাম, যশস্যা চিরস্থায়ী হোক।

নিউভীল : Now, father ! Your turn, please. Enlighten the heathens with your sermons.

পাদরী : Thank you, Good Gracious—God be with you...অসমীয়া প্রজাসকল ! English Soldiers দুষমন বার্মীজকো হঠাই দিল। এ্যাখন টুমিলোগ সুখ-শান্তিতে থাকিতে ফারিবে। But my friends ! হামি হামার প্রাণে বহুত দুখ ফাইছে। টুমালোগের কোন কো'' আদমি পাথর পূজা করে ; কোন কোন আদমী tree, গাছ পূজা করে—আউর দুসরা সব সাপ ভী পূজা করে। ভগবান পাথর নাই আছে, সাপ নাই আছে, গাছ ভী নাই আছে। He is the creator of all—টুমাকে বানাইছে, হামাকে বানাইছে—আউর সারা দুনিয়া ভী বানাইছে। সেই Creator আছে এক ঈশ্বর, সেই এক ঈশ্বর উপাসনা করিতে হইবে। যীশু হামার প্রেম জানে ; যীশু ত্রাণকর্তা আছে।

[ইতিমধ্যে জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে পিয়লি এগিয়ে এসে, একটু দূরে, ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে। জনতার মধ্যে থেকে, গলা তুলে উচ্চকণ্ঠে নারায়ণ পাদরীসাহেবকে জিজ্ঞাসা করে—]

নারায়ণ : তোমাদিগের যীশুকে উপাসনা করলে কী হয় হে সাহাব ?

[বাঙ্গালী পেশকার তৎক্ষণাৎ নারায়ণকে ধমকে দেয়—]

পেশকার : এটা কে অসভ্য রে ! ব'সে পড়, ব'সে পড় !

নারায়ণ : এই ! মুই ত'র নষ্টামিটা দেখতেছি রঙীন কাঠর গুড়ি পাই শিয়াল হৈছেন রাজা ! এ্যাক্টা চড়ে ঢাক যাবে, ঢাকের বাঁয়া তুইও যাবি।

[পিয়লি ফুকন আরও কয়েক পা এগিয়ে এসে বাঘের চোখ দিয়ে পাদরীকে দেখতে থাকে। বোঝা যায়, ভেতরের উত্তেজনাকে প্রচণ্ড শক্তিতে সংযত করে রেখেছে]

পাদরী : যীশুর উপাসনা করিলে Salvation ফাইবে, অর্থাৎ মুক্তি ফাইবে। হামি জানে, টুমিলোগের ধর্মের অভাব আছে। হামার গোরা ফৌজ লৌটি গেলে হামিলোগ লেকিন টুমার দেশমে থাকি যাব। টুমালোগের অন্ধতা দেখি হামার বহুত দুখ হৈছে। হামি টুমলোগকো স্বরগের রাস্তা বাত্‌লাই দিব। হামি টুমলোগকো Salvation দিব।...

"Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen."

[অসমীয়া জনগণের ধর্মের অভাব আছে, পাদরী সাহেবের এই উক্তিতে পিয়লির ধৈর্যচ্যুতি হয়। ক্রাচে ভর দিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, বাজের মতো এসে পাদরী সাহেবকে উত্তেজিতভাবে বলে—]

পিয়লি : খুব হয়েছে পাদরী সাহেব! অসমীয়া প্রজাদের স্বর্গের রাস্তা দ্যাখাবার জন্যে তোমার এতো অধীর না হলেও চলবে। তোমাদের কোম্পানীর দোহাই, আমাদের মুক্তির জন্যে আসামে তোমার আশ্রম খোলার দরকার নেই। যে পথ দিয়ে এসেছো, সেই পথ দিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরে যাও।

[পিয়লিকে উত্তেজিত দেখে ইংরেজ প্রহরী বন্দুক উঠিয়ে কুপারের ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করে। পরে, বন্দুক নামিয়ে আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে]

নিউভীল : The traitor's son Speaking!

কুপার : Captain! Watch patiently, mind what he says.

[পাদরী সাহেবের কাছ থেকে কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে পিয়লি অল্প দূরে দণ্ডায়মান মনিরামকে প্রশ্ন করে—]

পিয়লি : মনিরাম! তুমি বিখ্যাত কাকতী বংশের অভিজ্ঞ পুরুষ। সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম নিয়ে, শ্বেত বিদেশীকে কম্বল পেতে অভ্যর্থনা ক'রে এনে, ঘরের ভেতরের কথা ব্যক্ত করাটা কতোখানি সমীচীন—এ ব্যাপার অপরে না বুঝলেও অন্তত তোমার বোঝা উচিত, ক্যানোনা, তুমি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান।...তুমি আসামের দুর্গতির মূল কারণ আরোপ করেছো আমার স্বর্গীয় পিতার ওপর। তুমি আসামের ইতিহাস ভুলে গ্যাছো যে, এরও আগে, বর্মীদের চেয়েও অনেক বেশি রণদক্ষ মোগল সৈন্য আসাম আক্রমণ করার জন্যে বাজপাখির মতো এসে পড়েছিল, এবং অসমীয়া তীরন্দাজ-পাইক-বন্দুকধারীদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্যাঁচার মতো লুকিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল—তাও একবার নয়, দুবার নয়, সতেরো বার!

[নিউভীল, কুপার, প্রভৃতি সাহেবদের কেউই কথা বলে না ; সতর্কভাবে পিয়লির গতিবিধি লক্ষ্য করে]

হরনাথ : ফুকন ! এই সভায় এইসব কথা তুলি দ্বন্দ্ব-বিতর্ক সৃষ্টি করি কোন লাভ নাই। সাহেবের সামনে আমরা হাস্যাস্পদই হব। এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্যি এই সভা ডাকা হয় নাই। আপনি বসেন।

পিয়লি : বসব ! কোথায় বসব ? এ জায়গাটা তো আর স্বর্গদেবের সভাস্থল নয় যে এখানে বড়ফুকনের জন্যে আলাদা আসন পাতা থাকবে। এ হচ্ছে অসমীয়াদের অধঃপতনের সভা। এখানে তোমরা ডেকে এনে ফিরিঙ্গিকে বসিয়েছ মণিকট[1]-এর ভিত্তিভূমিতে।...ষড়যন্ত্র ক'রে,'রূপ সিং বাঙ্গালের সাহায্যে আমার বাবাকে মেরেও তোমরা সন্তুষ্ট হওনি। বদন না-হয় বর্মীদের ডেকে এনেছিল—কিন্তু বড়-বড় পাগড়ি পরা, ক্ষমতা ও খ্যাতিমান বুড়ো গোঁসাই[2], বরুয়া[3], হাজারিকা[4]—এঁরা সবাই বর্মীদের বাধা দিতে গেলেন না কেন ? লজ্জার কথা, এঁরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্যে বদনের নামে কুৎসা রটাচ্ছেন, আর দেশরক্ষার জন্যে প্রকাশ্যে কোম্পানীর পল্টনের সাহায্য নিচ্ছেন।

[পিয়লি পাগলের মতো উত্তেজিত হ'য়ে, ঘুরে-ঘুরে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে—]

—ক্যানো ? ক্যানো—? আমাদের দেশে কি গোলন্দাজ নেই, কামান নেই, যুবক নেই, ধুতিপরা পুরুষ মানুষ নেই যে, গোরা পল্টনকে এসে আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে ? আমাদের দেশে কি মোহান্ত নেই যে বিধর্মী পাদরীকে এসে অসমীয়াদের জন্যে স্বর্গের পথ খুলে দিতে হবে ?

কুপার : What does he mean by all these things ? What is this lame man excited for, Tehshildar ? হেই, টুমি গরম হৈছে কেন ?

পিয়লি : হেই, ক্যানো গরম হয়েছি ?—সভ্যতার ধ্বজা উড়িয়ে আসা তোমাদের ফিরিঙ্গিদের অভদ্র ব্যবহার দেখে। আর তোমাদের আলোয় ফুটে ওঠার লালসায় হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা কিছু লোকের হীন আচরণ দেখে। কর্ণেল সাহেব ! ইংরেজ পল্টনের নায়ক তুমি ?

কুপার : হাঁ-হাঁ—জরুর।

পিয়লি : তাহলে শোনো তুমি। তোমাদের শান্তিস্থাপনের বাসনা এতো প্রবল যে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত—পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহীশূর, অযোধ্যা এবং

1. কীর্তনঘরের কাছে ছোটঘর, যেখানে মূর্তি, পুঁথি ইত্যাদি থাকে।
2. প্রধান মন্ত্রী।
3. উচ্চ রাজকর্মচারী।
4. এক হাজার ধানুকীর প্রধান।

বাংলার শাসন দু'পায়ে মাড়িয়ে—শান্তি-প্রতিষ্ঠার ছলে ব্যবসা-বানিজ্য চালিয়ে যাচ্ছ। অতএব, আসামের প্রতিও তোমাদের প্রীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক—যেহেতু, আসামের পাহাড়ে খনিজ পদার্থ আছে, সুবর্ণশ্রীতে সোনা আছে, আসামের বনে-জঙ্গলে আছে চায়ের গাছ।

কুপার : But were we not invited? টুমালোগ হামাকে নিমন্ত্রণ করি আনিছে?

পিয়লি : নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমরা অসমীয়ারাই তো সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে শ্বেত বিদেশীদের পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে ডেকে এনেছি বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে! আর, আসামের রাজন্যবর্গের পরিবর্তে আসামের মহানিত্র ব্রহ্ম-রাজ সেই বন্ধুত্বের খত্-এ স্বাক্ষর করেছে ইয়াণ্ডাবুর সন্ধিতে[1] মোহর মেরে। আর এই শর্তও দিয়েছে যে, আসামের স্বর্গীয় রাজাদের সমাধিতে যতো সোনা-দানা, মণি-মুক্তো, অস্ত্র-শস্ত্র, বাসনপত্র গচ্ছিত আছে, মাটি খুঁড়ে সব লুটে নিয়ে ডিঙ্গি বোঝাই ক'রে পশ্চিমে চালান দেবে। আর তার বদলে, পশ্চিম থেকে গাদা-গাদা আফিং-এর নাড়ু এনে বিলিয়ে দেবে আসামের প্রজাদের!

মেথী : We want to preserve them in the Brithish museum—জাদুঘরে তার ব্যবস্থা হইবে।

পিয়লি : ও—জাদুঘরে তার ব্যবস্থা হবে! কিন্তু, তোমাদের জাদুঘর যে আসামের ধন-সম্পদের ভাঁড়ারঘর—এ খত কে লিখে দিলে? এ বন্দোবস্ত আসামের প্রতি, আসামের রাজন্যদের প্রতি অপমানজনক; এবং এ অপমান তোমরা করতে পারছ স্বর্গত রাজাদের বর্তমান বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে! তোমাদের শিক্ষা সভ্যতা কি এই সামান্য জ্ঞানটুকুও দেয় না যে, স্বর্গীয় রাজাদের সমাধিতে দান করা জিনিসপত্র অতি পবিত্র! জাতটাকে অপমান না ক'রে সেসবে হাত দেওয়া যায় না! তোমরা ভেবেছ যে এই লুণ্ঠন-কাজের প্রতিবাদ কেউ করবে না!... শুধু প্রতিবাদই নয়, তোমাদের—

[মনিরাম পিয়লিকে বাধা দিয়ে থামিয়ে বলে—]

মনিরাম : ফুকন, আপনি অনিমন্ত্রিতভাবে এখানে এসে কী সব বাজে কথা বলছেন?

[বাধা পেয়ে, এবং তাকে দাবিয়ে দিয়ে মনিরামের কথা বলায়, অপমানিত বোধ ক'রে দ্বিগুণ ক্রোধে পিয়লি বলে—]

পিয়লি : তুমি চুপ করো, মনিরাম! পশ্চিম-দুয়ার দিয়ে শ্বেত বিদেশীদের পথ দেখিয়ে এনে ভেবেছ, তুমি দেশে শান্তিস্থাপন করেছ?...কর্ণেল সাহেব! ওই কলিতা-রাজ মনিরাম তহশীলদার তোমাদের আসামে ঢোকার পথ দেখিয়ে

1. 1826 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধি।

এনেছে ; আর বদনের পুত্র এই খোঁড়া পিয়লিই তোমাদের দেখিয়ে দেবে—ফিরে যাবার পথ !

মনিরাম : কর্ণেল সাহেব ! আমাদের সভার কাজ শেষ হল। এ্যাখন আমাদের সভা ভঙ্গ করতে হয়।

কুপার : Alright. Let us break up then.

পিয়লি : সেই ভালো। যাও...যাও। যতো তাড়াতাড়ি তোমরা যাবে, ততোই মঙ্গল।

[প্রহরীসহ সাহেবদের প্রস্থান। সঙ্গে যায় মনিরাম-হরনাথ-হৃতিরাম এবং আরও কয়েকজন। বাকি সবাই যাবার উদ্যোগ করে। কিছু লোক ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে পিয়লির কথা কথা শোনে। নারায়ণ দ্রুত পিয়লির কাছে আসে]

নারায়ণ : হৈছে, হৈছে, মেজকত্তা—। অনেক হৈছে। চলেন, ঘর যাই। গোটা দেশ আগ বাড়ি অর্ঘ্য দিছে। অকলে আপোনি ক্যামনে ফিরাই আনবেন ?

পিয়লি : দেশ তো অর্ঘ্য বাড়িয়ে ধরেনি, নারায়ণ। হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠারাই দেশ নয়। গোটা জাতটাই তো আর রঙীন কার্পেট বিছিয়ে শ্বেত বিদেশীদের সমাদরে ডেকে আনেনি। (পার্বত্য 'গাম' বা রাজাদের কাছে গিয়ে)—কথা বলছো না কেন ? মুখ ফুটে বলছো না কেন ? আজ ছ'শো বছর ধ'রে খাজনাপত্র দিয়ে, সহযোগিতা ক'রে, মিত্রতা-সম্বন্ধ পাতিয়ে, যে রাজন্যবর্গের বশ্যতা তোমরা স্বীকার ক'রে এসেছো, অভিষেকের সময়ে যাদের আম-দরবারের সিঁড়িতে ব'সে আনুগত্য স্বীকার ক'রে এসেছো, সেই সাতপুরুষের সিংহাসনে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে আসা শ্বেত বিদেশীদের বসিয়ে তাদের...তাদের কাছে নতজানু হওয়া ?

খা. সিয়াম : হেইটা ঠিকই। মোদিগকে ত'শীলদার ডাকছে, তাই মোরা আহিছি।

[গামেরা সব চলে যায়]

পিয়লি : (একজন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে) তুমি বৃদ্ধ, তুমিই বলো। তুমি লোকেদের মনের কথা জানো, তুমি দেশের কথাও জানো। তুমি বলো—আসামে রাজা কে ছিল, আর আসামে রাজা কে হবে ? তুমি কার কাছে মাথা নীচু করবে—তোমার পুত্র-পৌত্র কার কাছে মাথা নোয়াবে—তোমার পুত্র-পৌত্র নতমস্তক হবে কার কাছে ? (বৃদ্ধ নির্বাক)—বলছ না। তুমি জানো, কিন্তু আজ চুপ করে থাকতে চাইছ।...নারায়ণ, আজ কেউই মুখ খোলে না।

[মাথা নীচু করে বৃদ্ধ চলে যায়। পিয়লির প্রতি অঙ্গভঙ্গি ক'রে নর্তকীর প্রস্থান]

—স্বর্গদেব। যারা একদিন নতজানু হয়ে তোমার কাছে কৃপা ভিক্ষা করেছিল,

তোমার ইঙ্গিতকে আদেশ ব'লে মাথা পেতে নিয়েছিল—তারাই আজ দেশের এই দুর্দিনে তোমার অধিকার নিয়ে একটা কথা বলে না, একটা আঙুল তোলে না। আজ তারা চারদিক থেকে কুঠারাঘাত করছে তোমাকে।

[দুদিনের ভেতরে মানুষের এমন পরিবর্তন দেখে, অদৃষ্টের পরিহাস উপলব্ধি ক'রে পিয়লি পাগলের মতো জোরে হেসে ওঠে। উত্তেজনার প্রাবল্য রোধ করতে না পেরে চেতনা প্রায় লোপ পেয়ে পতনোম্মুখ হয়। নারায়ণের স্পর্শে পিয়লির চেতনা আসে ; সংযত হবার চেষ্টা করে পিয়লি বলে—]

পিয়লি : নারায়ণ!

নারায়ণ : মেজকত্তা।

পিয়লি : নারায়ণ! আজ রাত্রে আমি আবার যাব।

নারায়ণ : কুথা যাবেন মেজকত্তা?

পিয়লি : দেবীর সন্ধানে।

নারায়ণ : গোঁসানীর সন্ধানে? আপনি কুথা গোঁসানীকে দ্যাহেন? গোঁসানী যে অশরীরী!

পিয়লি : শরীরী হোক, অশরীরী হোক। দেবী হোন, মানবী হোন। তাঁকে আমায় পেতেই হবে, নারায়ণ। নারায়ণ, অন্তরাত্মাই যে আমার বুকের মধ্য থেকে বলে দিচ্ছে—'সমাধিস্থলেই আমি সমাধান পাব'।...সহস্র সেনার বুকের রক্তবিন্দু দিয়ে শরাইঘাট লাল ক'রে যে দেশের গৌরব আমরা অটুট রাখলাম, সেই আমার সোনার দেশে প্রবিষ্ট সরীসৃপদের তাড়াবার...সমাধির সাতপুরুষের পবিত্রতা নাশক, ধর্ম-বস্তু অপহারক, বুকের কল্‌জে ছিঁড়ে সেই দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছ বিতারণের উপায় খুঁজে পাব। সেখানে আছে আমার আশ্রয়—সচল তারা ; স্বর্গদেবের হারে মাদুলি পরিয়ে সে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে...সমাধিক্ষেত্রেই আমি পাব সার্বিক সমাধান।

[মন্ত্রমুগ্ধ চিত্তে পিয়লির প্রস্থান। পেছনে-পেছনে যায় বিস্মিত নারায়ণ]

সন্ধান

[প্রথম দৃশ্যের মতো সাজানো রাজসমাধিক্ষেত্র। সময় মধ্যরাত্রি।

সমাধির সামনে একটি প্রদীপ, ওপরে একটা কলাপাতায় কয়েকটা রাঙা জবা ফুল। যবনিকা ওঠার আগে থেকে একটা ভয়ংকর সুর বাজতে থাকে। যবনিকা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়—সমাধির সম্মুখে স্তব-নৃত্যের ভঙ্গিতে কৃষ্ণবসনা এক নর্তকী। সঙ্গে সঙ্গে সব বাজনা একসঙ্গে বেজে ওঠে। তার

তালে তালে নর্তকী অনুপ্রাণিতা হয়ে নাচ আরম্ভ করে। তাণ্ডব নৃত্য! ক্রমশ, ভঙ্গির ক্ষিপ্রতা বেড়ে গিয়ে সেই নাচ অঙ্গ-সঞ্চালনের একটা বিরাম-বিহীন গতিময়তায় পরিণত হয়। নর্তকী যেন পাগলিনী হয়ে যায়, উন্মাদনার প্রাবল্যে সমাধির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হয়।..নির্জন নিস্তব্ধতা। ধীরে ধীরে নর্তকীর কান্না শোনা যায়। একটা করুণ সুর বাজতে থাকে।...মঞ্চের সামনের দিক থেকে আস্তে আস্তে পিয়লি ফুকনের প্রবেশ। পিয়লির ইঙ্গিতপূর্ণ আহ্বানে নারায়ণ সন্তর্পণে প্রবেশ করে। পিয়লি নারায়ণকে এগিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করে। নারায়ণ ভয়ে-ভয়ে নর্তকীর কাছে গিয়ে, মাথার দিকে দাঁড়িয়ে তাকে তুলে ধরে। নর্তকী মাথা তুলে, সামনে নারায়ণকে দেখে ভয় পেয়ে উঠে পড়ে। পেছনে হঠে যায়। নারায়ণেরও ভয়ে গা কেঁপে ওঠে]

নারায়ণ : তুই কোন্?

[নারায়ণের ওপর চোখ রেখে নর্তকী পিছিয়ে যায়। মঞ্চের মাঝখানে এসে পোঁছতেই দৌড়ে পালাতে যায়। দৌড়ে যেতেই পিয়লি পথরোধ করে দাঁড়ায়। মঞ্চ আলোকিত হয়ে যায়]

পিয়লি : কে তুই?

[নর্তকী পিছু হঠতে থাকে; পেছনে দাঁড়িয়ে-থাকা নারায়ণের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নর্তকীর পালাবার পথ রোধ ক'রে নারায়ণ এবং পিয়লি এগোতে থাকে]

নারায়ণ : কুথা পালাবি?

পিয়লি : কে তুই?

নারায়ণ : ক'—তুই কোন্?

[নর্তকী একবার নারায়ণের দিকে, আর একবার পিয়লির দিকে চেয়ে বুঝতে পারে—ধরা পড়ে গেছে]

নর্তকী : আমি নর্তকী!

পিয়লি : কোথাকার নর্তকী?

নর্তকী : ভালো ক'রে দেখুন—চিনতে পারবেন।

[পিয়লি নর্তকীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে; নারায়ণও দেখে]

পিয়লি : কি, তু-ই?

নারায়ণ : মেজকত্তা! চিন্‌তি পারেন?

নর্তকী : হ্যাঁ—আমি, গড়গঞা নর্তকী।

নারায়ণ : তুই হেথা কী করিস্?

নর্তকী : নাচছি।

নারায়ণ : নাচছি—ডাইনী বেটী!

পিয়লি : মাঝরাতে তোর কিসের নাচ ?

নর্ত্তকী : ক্যানো জানেন না—নাচই আমার পেশা।

পিয়লি : বুঝেছি।—কিন্তু এই শ্মশানে তো তোর সাহেব নেই !

নর্ত্তকী : শ্মশান নয়, সমাধি। সাহেব নেই—কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ স্বর্গদেবরা আছেন। তাঁদের সামনে নাচতে হয়।

পিয়লি : এখানে কাঁদে কে ?

[নর্তকী নীরব]

নারায়ণ : এয়েই কান্দে মেজকর্ত্তা।

নর্তকী : আমিই কাঁদি, আমিই নাচি।

নারায়ণ : তুই গেরামের মানুসকে এহ্যান ভয়-ভীত খায়াইছস্ ক্যানে ? মেজকর্ত্তা, এই ডাইনীকে শূলে দিতি হয়। বেটী শরীরি।

পিয়লি : তুই কাঁদিস ক্যানো ?

নর্তকী : (কাষ্ঠ হাসি হেসে) ক্যানো কাঁদি ?...আপনারই পিতৃদেব বদন পাটকাই পাহাড় পার হয়ে নিজের অহংকারবশে বর্মীদের ডেকে এনে দেশের যে দুর্দশা করেছেন, তার পরিণামে দেশ জুড়ে কান্নার রোল না উঠে পারে ? তাই আজ রাজপ্রাসাদে ক্রন্দনের রোল, সমাধিতে আজ ক্রন্দনের রোল, বৃদ্ধ যুবার হৃদয়ে বিপর্যয়ের বেদনা, কন্যার-বধূর মুখে বিষন্ন অশ্রুজলের নির্ঝর। আপনি আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন—'তুই কাঁদিস ক্যানো ?' (কাছে এসে)—আপনার চোখে জল ক্যানো ? আপনার মুখ বিষাদে অবসন্ন ক্যানো ?

পিয়লি : সাবধান নর্তকী ! আমার সামনে, আমার পিতার নামে, একজন সামান্যা নাচনীর উদ্ধত বাক্য আমি ক্ষমা করব না।

নারায়ণ : মেজকর্ত্তা !

[পিয়লি হাতের ইঙ্গিতে নারায়ণকে নীরব থাকতে বলে]

পিয়লি : আমি কাঁদি বা না কাঁদি—তুই এভাবে আমাকে দোষ দিবি না। তুই—তুই ফিরিঙ্গির গুপ্তচর। সমাধিতে-শ্মশানে—কোন সাধারণ মানুষ তোর মতো নাচে না, তোর মতো কাঁদে না।...নারায়ণ ! একে ধর। একে মেরে ফেলাই ভালো হবে।

নর্তকী : সমাধিতে ভৃত্যকে দিয়ে সামান্য একজন স্ত্রীলোককে হত্যা—আজকের বীরপুরুষেরা এর চেয়ে বড় কাজ আর কী করতে পারেন ? কিন্তু তার জন্যে তো তারাতলীতে সৈন্যদের ঘাঁটি করার দরকার হয় না !

[গুপ্ত ঘাঁটি তারাতলীর নাম নর্তকীর মুখে শুনে নারায়ণ ও পিয়লি বিস্মিত হয়]

নারায়ণ :
পিয়লি : } —তারাতলী !

পিয়লি : তারাতলীর ঘাঁটির কথা কি ক'রে জানলি ? আমি নিঃসন্দেহ, তুই গুপ্তচর।

নর্তকী : গুপ্তচর—ফুকন ঠাকুর। আর, সেইজন্যেই আমি জানি—ভরা লুইতের বুকের ওপর ফিরিঙ্গির নৌকোর বারুদ কারা লুটে এনেছিল !.. আশ্চর্য হয়ে কী দেখছেন ? (নারায়ণকে)—বাঁধো বাঁধো। দাঁড়িয়ে আছো ক্যানো ? ফুকন ঠাকুর, আমি স্বীকার করছি—আপনার সহচরেরা সাহসী, কিন্তু চতুর নয়।

পিয়লি : (বিমূঢ় ভাবে) নর্তকী।

নর্তকী : ফুকন ঠাকুর।

পিয়লি : কে তুই ?

নর্তকী : আমি নর্তকী।

পিয়লি : তুই নর্তকী না।

নর্তকী : তাহলে আমি গুপ্তচর।

নারায়ণ : এই তুই পরিহাস করবি নি। ক'-তুই কোন্ ?

পিয়লি : বল্—কে তুই ?

নর্তকী : কে আমি ? আমি স্বর্গদেবের খাস দাসী। বর্মীদের কাছে আমি দোভাষী, ফিরিঙ্গির কাছে আমি নাচনী। আর, আপনার চোখে আমি গুপ্তচর !

নারায়ণ : ঈটা ডাইনী—মেজকত্তা !

নর্তকী : আর হ্যাঁ—আপনার ভৃত্যের ধারণায়—আমি ডাইনী !

নারায়ণ : আরে ! এই চকিতে রাজদাসী, চকিতে দোভাষী, চকিতে নাচনী ! ঈসব কথার পাক ভাল নয়, মেজকত্তা ! এই এ্যাক প... চকিতে কুমড়াটহৈ সাহাবের শয্যাতলে গৈ ঢুইকবে। ইয়াকে এই অবস্থাতেই আমাদিগের চকিতে শেষ করাটাই ভাল।

পিয়লি : ধাঁধা ছেড়ে সত্যি কথা বল্—তুই কে ?

নারায়ণ : গুপ্তচর, মেজকত্তা।

নর্তকী : হ্যাঁ—কিন্তু কার গুপ্তচর ?

পিয়লি : কার আবার ? শ্বেত বিদেশীর, ফিরিঙ্গির !

নর্তকী : বিদেশী বর্মীদের ডেকে এনে দেশকে ছারখার করে দিলেও বদনের কোন দায় লাগল না, আর—

পিয়লি : (নর্তকীকে বাধা দিয়ে) পিতা বদন বর্মীদের ডেকে এনে যে পাপ করেছেন, তাঁর পুত্র পিয়লি ফুকন তার প্রায়শ্চিত্ত করবে। তারাতলীতে সৈন্যদের ঘাঁটি তারই আয়োজন। যা, বল্‌গে যা তোর সাহেবকে যে পিয়লি ফিরিঙ্গিদের তাড়িয়ে তবে ছাড়বে।

নর্তকী : শুনলুম। কিন্তু দেখলে তবে বুঝতে পারব।

নারায়ণ : তোর মুখে ঈসব বড়-বড় কথা কদাপি শোভা পায় না। ঈসব তোর

দাগাবাজী। ইয়ার সূক্ষ্ম কথাগুলা শুনলে মোর গা' শীতল হয় না। ইয়ার এ্যাটটা উপায় করেন মেজকত্তা!

নর্তকী : সেদিন সেই অপরিচিত নৌকো এসে ফিরিঙ্গির নৌকোটাকে মাঝ-লুইতে ডুবিয়ে না দিলে, বারুদ লুটে আনার খবর কবে ফিরিঙ্গির কানে পৌঁছে যেত, আর আপনার সাহসী সহচরেরা বারুদ এনে লুকিয়ে রাখতে না রাখতেই ফিরিঙ্গিরা সেই বারুদ পুনরুদ্ধার করে নিত, ফুকন ঠাকুর!

পিয়লি : নারায়ণ! এর কথাবার্তা আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। না নারায়ণ! এ মেয়ে যে-ই হোক না কেন, সম্প্রতি একে বেঁধে রাখা ছাড়া অন্য উপায় নেই!

নারায়ণ : বান্ধি আর কী থোব মেজকত্তা—ইয়াকে এ্যাক কোপে শেষ করি থোয়াই ভাল।

[নারায়ণ দা তুলে নেয়। নর্তকী অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে]

নর্তকী : সত্যি—শেষ করাই ভালো। নইলে, আপনাদের সুনামে কলঙ্ক পড়বে। অনেক বড়-বড় মানুষ মেরেছেন। ভাঙ্ খাইয়ে পাগলা হাতী ছেড়ে দিয়ে প্রচুর যশ উপার্জন করেছেন—এখন এইটুকুই বাকি আছে! কিন্তু আমাকে মেরে ফেলার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

পিয়লি : কি কথা?

নর্তকী : তারাতলীতে যে প্রস্তুতি চলছে, তার উদ্দেশ্য যদি সত্যি-সত্যিই হয় সাদা বিদেশীগুলোকে তাড়ানো, তাহলে সে-কাজে, স্ত্রীলোক হলেও, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব। আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারবেন?

নারায়ণ : ইয়ার কথাতে প্রত্যয় যাবেন না মেজকত্তা!

পিয়লি : পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত তোকে আমি বিশ্বাস করি না।

নর্তকী : আপনি নিজেই আমাকে নাচতে দেখেছেন। আমি নর্তকী। এর চেয়ে বিস্তৃত পরিচয় দিতে আমি অপারগ।

পিয়লি : কিন্তু—এই রকম একটা গুরুতর কাজে একজন নর্তকী পিয়লি ফুকনকে সাহায্যটা করবে কিভাবে?

নর্তকী : নেচে-নেচে—নাচের ভঙ্গি দিয়ে, নূপুর-ধ্বনি দিয়ে! আচ্ছা, তারাতলীর সৈন্য-সামন্তরা ফিরিঙ্গিকে তাড়াবেটা কিভাবে? সৈন্য সংখ্যা তো খুবই কম। একমুঠো সৈন্য ফিরিঙ্গিদের বিশাল গোরা-সিপাইদের হঠাতে পারবে?

পিয়লি : আমার যোদ্ধাদের সংখ্যা অতি অল্প হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই এক একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। তাদের প্রত্যেকেই স্বর্গদেবের নামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সম্মুখ-যুদ্ধ করতে পারব না। তবে, এই একমুঠো যোদ্ধার সাহায্যেই শ্বেত বিদেশীদের তাড়ানো যেভাবে সম্ভব, তার ব্যবস্থা আমি করব।

নর্তকী : যদি সাদা বিদেশীদের লাল চোখ দেখে, এবং ফিরিঙ্গিদের গায়ে লেগে থাকা হঠাৎ-গজা-নেতাদের প্রলোভনে পড়ে আপনার সহচরেরা পিছু হঠে আসে?

নারায়ণ : উহ্ । কথার পাক দ্যাহেন ।

পিয়লি : নর্তকী । পিয়লি ফুকনের দল আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত, শত রক্ত চক্ষু, শত প্রলোভনেও তাদের পশ্চাৎগামী করতে পারবে না ।

নর্তকী : তাই যদি—তাই যদি হয় ফুকন ঠাকুর—আমাকেও সেই দীক্ষা দিন ।

পিয়লি : নর্তকী !

নর্তকী : আমাকে ভুল বুঝবেন না, ফুকন ঠাকুর । অন্তরে যে তুষের আগুন জ্বলছে, তাকে শান্ত করবার উপায় আজও পাইনি । তথাপি, যদি কখনও দেশের কাজে লাগতে পারি, সেই আশাতেই এ্যাতদিন ধ'রে এখানে-ওখানে নেচে বেড়াচ্ছি । হয়তো একদিন এই দেশ আবার সজাগ হয়ে উঠবে, ফিরে আসবে হারানো শান্তি । স্বর্গদেবের সামনে আমি আবার নাচতে পারব ।...আজ আমি সেই পথ পেয়ে গেছি—সেই পথ দিয়েই আমি এগিয়ে যাব ।

[দৌড়ে গিয়ে সমাধির সামনে নতজানু হয়]

—স্বর্গদেব ! আমাকে শক্তি দাও । স্বর্গ থেকে তুমি সাক্ষী রইলে, আমি য্যানো কথা রাখতে পারি । (পিয়লির কাছে এসে, নতজানু হয়ে পা ছুঁয়ে, বলে) —ধর্মের নামে, আমার পূর্ব-পুরুষদের নামে, স্বর্গদেবের নামে আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, জীবনে-মরণে আমি আপনার কাজে সাহায্য করব । আমাকে সেই মহামন্ত্রে দীক্ষা দিন । বুকের রক্ত দিয়ে দেশরক্ষার সুযোগ দিন ।... দিন...দিন ফুকন ঠাকুর !

[অধীরা নর্তকী হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলে]

পিয়লি : বুকের রক্ত, বুকের রক্ত । নারায়ণ...নারায়ণ । রমণীর উষ্ণ রক্তের তাপে গোটা আসামে ফিরিঙ্গি ছাই হয়ে যাবে । দেশে একটাও গোরা বিদেশী থাকবে না । অসমীয়া প্রজা আবার নতুন জীবন লাভ করবে । দেশে শান্তি বিরাজ করবে । ধন-ধান্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠবে চতুর্দিক । স্বদেশ-চেতনা ফিরে আসছে, নারায়ণ ।—দেশমাতা জেগে উঠেছেন ।

[পিয়লি অধীর হয়ে পড়ে]

নারায়ণ : মেজকত্তা ! মেজকর্তা !

নর্তকী : ফুকন ঠাকুর !

পিয়লি : নারায়ণ ! নর্তকী !...নর্তকী, তুই পারবি ?

নর্তকী : পারব ফুকন ঠাকুর !

পিয়লি : আমরা প্রথমে গোরা-পল্টনের বারুদ-ঘর আগুন দিয়ে উড়িয়ে দেব । আর, প্রয়োজন হলে, ওখানেই ওদের সঙ্গে লড়াই দেব । সে-কাজে তুই আমাকে কী সাহায্য করতে পারবি ?

নর্তকী : আমাকে যেভাবে নাচাবেন, আমি সেইভাবেই নাচব । ধনুকের তীরের ফলায় জুড়ে যেখানে নিক্ষেপ করবেন, সেখানেই প'ড়ে ধূমকেতুর মতো দাবানল জ্বালিয়ে তুলব ।...ফুকন ঠাকুর !

পিয়লি : কী ?

নর্তকী : আগামী শনিবার রাত্রে আমি সাহেবদের বারুদ-খানার শিবিরে নাচতে যাব, নাচে আমি ওদের মুগ্ধ করে রাখব। সেই সুযোগে আপনারা বারুদ-ঘরে আগুন দিলে কাজ হবে।

পিয়লি : কিন্তু বারুদ-ঘর পাকা ; সেখানে আগুন দেবার মাল-মশলা এখনও পাই নি।

নর্তকী : সেসব আমি দোব, ফুকন ঠাকুর। আগুন লাগাবার শল্‌তে আমিই জোগাব।

পিয়লি : নর্তকী। তুই শল্‌তে জোগাতে পারবি ?

নর্তকী : পারব। যে চোখের জল বেরোবার পথ না পেয়ে বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে, সেই চোখের জল দিয়ে আমি শল্‌তে ভিজিয়ে দেব ; আর বুকের মধ্যে যে অনির্বান অগ্নি নিয়ে আপনি আজ জন্মভূমি উদ্ধারের জন্যে জীবন পণ করেছেন, সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে আপনি জ্বালিয়ে তুলবেন সেই শল্‌তেকে। তারপর আঘাত হানবেন, ফুকন ঠাকুর—সেই শল্‌তের আগুনে ফিরিঙ্গির বারুদ-ঘরে শুরু করবেন—খাণ্ডব-দহণ।

পিয়লি : ঠিক কথা নর্তকী। আসামের সর্বপ্রথম বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাবার শল্‌তে জোগাবি তুই, একজন অজ্ঞাত নর্তকী, আর সেই শল্‌তেয় অগ্নিসংযোগ করবে এই খঞ্জ পিয়লি।

নারায়ণ : রহেন রহেন—কিনতুক যদি কোনো বিঘ্ন বা অঘটন ঘটে ?

নর্তকী : তাহলে দিখৌতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। নৌকোর ঘাটে থাকা পাঞ্চৈ নাও—তার প্রত্যেক নাবিককে নির্দেশ দেওয়া থাকবে। একটু ভেসে যাবার পরেই আপনাদের নৌকোয় তুলে নেবে।

পিয়লি : হুঁ !...তুই কবে নাচতে যাবি ?

নর্তকী : আগামী শনিবার রাত্রে।

পিয়লি : বেশ—তাই হবে।...আচ্ছা, এর আগে তুই ওখানে নাচতে গিয়েছিলি ?

নর্তকী : গিয়েছিলুম।

পিয়লি : তোকে ওখানে কে নিয়ে যায় ?

নর্তকী : হরনাথ দারোগা।

নারায়ণ : হেই পাজী হরনাথ দারোগা ! কবে পোকলাগি মইরবে !

পিয়লি : তুই থাকিস কোথায় ?

নর্তকী : নদীর ওপরে, সেই পাঞ্চৈ নৌকোয়।...ঠাকুর ! আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি পিছিয়ে যাব না। আপনি এবার ভালো ক'রে হাল ধরুন, নৌকো ঠিকই চলবে।...এখন তাহলে আমি যাই।...হ্যাঁ, আমি একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি ফুকন ঠাকুর—সমাধিতে আমার নাচার কথাটা য্যানো আর-কাউকে বলবেন না। হয়তো আমাকে ডাইনী বলে মনে করবে।

[নারায়ণকে সামনে পেয়ে নর্তকী চোখ পাকিয়ে, হাত দুখানা মুখের সামনে থাবার মতো তুলে, মুখ বিকৃত ক'রে ভয় দেখায়]

নর্তকী : আমি ডা-ই-নী—

[নারায়ণ ভয়ে পিছিয়ে যায়। নর্তকীর প্রস্থান। সাহস সঞ্চয় ক'রে নারায়ণ এক পা এগিয়ে এসে নর্তকীর যাওয়ার দিকে চেয়ে, দা-খানা ঝাঁকিয়ে বলে—]

নারায়ণ : হে-হে—ডাইনীই বা হইল, কিবা অশরীরি হলেও মুই তোর পিছু ছাড়ছি নি। সময়কালে সকল অস্বীকার গেলে এই দা-খান দিয়াই চাকা-চাকা করি ফেলাব।

পিয়লি : হাল ধরে থাকলে নৌকো ঠিকই চলবে। নারায়ণ, নারায়ণ—! হাল ধরতে পারব কি? আজন্ম খোঁড়া কি হাল ধরতে পারবে? বল্‌, নারায়ণ বল্‌! মাঝে-মাঝে আমার বড ভয় হয়, নারায়ণ—কী জানি, যদি সবই ভুল হয়ে যায়! নারায়ণ, আমি কি পারব?

নারায়ণ : পারবেন মেজকত্তা—আপোনি নিশ্চয় পা'রবেন।

[দূরে ভক্তের গান শোনা যায়। গানের ধ্বনি ক্রমশ কাছে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নামে। যবনিকা পতনের পরেও নেপথ্যে ভক্ত গান গাইতে থাকে। নীচে উদ্ধৃত দুটি গানের যে কোন একটি রুচি অনুসারে ব্যবহার করা যেতে পারে। উল্লেখ্য : গান দুটির গীতিকার কমলানন্দ ভট্টাচার্য]

গান ১ :

ভাল করি ধরিবি হাল ও নাইয়া
ভাল করি ধরিবি হাল,
সঘন বরষাও নারিবে ডুবাতে
দে তোর তরীতে পাল।
হালের সাথে বৈঠা তোরই মুঠিতে
অশুভ অঘটন তোরই হাতেতে
উঠিতে নামিতে হবি রে সাবধান
খেতে পারে নাও টাল ॥

গান ২ :

রাজা অধিনেতা তুই যে নাবিক
রাজা-অধিনেতা তুই;
খরস্রোত জলে পাকৈ আনিলি
ঘুরন্‌পাক পার হৈ।
উপরে বরষার মেঘ গুরুগুরু—
তলে বহে পাগল নৈ—[1]
নাবিক রে। রাজা-অধিনেতা তুই ॥

---

1. নদী।

জলের চলনি নদীর বুকেতে
চরানাও[1] ভাসি যায় ;
ঢেউয়ের দোলনে, উঠে কোলাহল
মনোমত শ্মশান পায়।
চরা নাও ডুবিল, মেঘের বাণ উড়িল,
পুড়িল, ছাই গেল থৈ—
তোরই ভাঙ্গা নায়ে, ভাসান আজি মোর
মরিব যেন লাগে অই—
নাবিক রে! রাজা-অধিনেতা তুই ॥

বৈঠকখানা

[সুপারির বাটা ও সরাই,[2] মাদুর, চৌকো পিঁড়ে ইত্যাদি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত অসমীয়া দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ঘরটি পরিপাটি ভাবে সাজানো। পূজারী ঘোষা[3] পাঠ করছে। কাছেই ব'সে পিয়লির মা পুঁথি-পড়া শুনছেন। পাশে ছোট্ট নাতনী লবণি বসে আছে। সুচিতা একটু দূরে ব'সে পুঁথি শুনছে এবং সেইসঙ্গে শাশুড়ীর জন্যে সুপারি কাটছে। লবণীর হাতে বর-বৌ পুতুল]

পূজারী : হরিপদ-সেবা না করে নিমিত্তে
মায়ায় বান্ধি ঘুরায়।
তাবৎ মায়াকে না করে রহিত
শরণ না লয় যায়

[পূজারী পুঁথি বন্ধ ক'রে, প্রণাম অন্তে প্রদীপ এবং রহল[4] সরিয়ে রাখে]

পি. মা : বৌ! পুরুতমশাইকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।...পুরুতমশাই! ভেতরে যান। একমুঠো খেয়ে এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিন।

পূজারী : তাই হবে, মা।

[সুচিতা ও পূজারীর প্রস্থান]

---

1. অহোম রাজাদের প্রমোদ-তরণী।
2. ছুটোই এক-পদ সমন্বিত।
3. মাধবদেবের লেখা ধর্মগ্রন্থ।
4. এটিও এক-পদী।

পি. মা : লবণী সোনা। তুমি খেলা করো, ক্যামোন? আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে পুঁথিটা রেখে আসি।

[রহলসহ পুঁথিটা নিয়ে পিয়লির মা'র প্রস্থান। ছোট্ট লবণী বর-বৌ পুতুল নিয়ে খেলতে থাকে, এবং গান গায়—]

লবণী : (গান) মর্তমান কলার পাতা সরু সরু
চম্‌পা কলার পাত,
গা ধুই উঠি চাঁদের কণা মোর
না পেল খাবার ভাত।

—লক্ষ্মী আমার, চাঁদের কণা! রাগ করে না সোনা। বাবা এলে আমি খাব তুমিও খাবে। ক্যামোন?

[নারায়ণের প্রবেশ]

নারায়ণ : সাথে মুইও খাব, লবণী ছোনা মা।

[ব্যগ্রভাব দেখিয়ে লবণীর কাছে বসে]

—দেহি, দেহি, তোমার চাঁদের কণাটি—

[লবণীর হাত থেকে সুড়ুৎ ক'রে একটা পুতুল নেয়। লবণী রাগে ভ্রূ কুঁচকে নারায়ণের দিকে তাকায়। ওকে খুশি করার জন্যে নারায়ণ পুতুলটাকে লবণীর মুখের সামনে অথচ নাগালের বাইরে রেখে নাচায় ও গায়—]

—এরি কাটি মেখেলী[1] ল' হঁয়[2] বান্‌চী—বান্‌চী[3],
এরি কাটি মেখেলী ল'।

লবণী : দেখেছ—এটা কিরকম করে! দে—আমার পুতুল দে। নিজেরটা আনতে পারে না, পরেরটা নিয়ে-নিয়ে খেলে।

[লবণী থাবা মেরে পুতুলটা কেড়ে নেয়। নারায়ণ চট ক'রে লবণীকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে বলে—]

নারায়ণ : মোর পুতলা এইটা হে!

[নারায়ণ লবণীকে চুমু খায়। সুবিধে করতে না পেরে লবণী নারায়ণের চুল খামচে ধরে]

নারায়ণ : উঃ! উঃ! ছাড়ি দাও, ছাড়ি দাও। ধানকাঠি উঠাই দি' সকল চুল হাতেই যাবে।

1. মুগার তৈরি মেখলা।
2. সম্বোধন।
3. রাঙা।

[লবণী চুল ছেড়ে দেয়। নারায়ণ ওকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। লবণী কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকে]

—আস, দেহি। লবণী ছোনা, অসন্তোষ পাইছ ?...রাগ করিবা না, মা। কাইল মন্দিরে পালা হবে, তাইতে মুই হনুমানের পার্ট নিছি। লেজে আগুন লাগাই গোটা নগর ক্যাম্‌নে ছারখার করি ফেলাব—দেইখ্‌বা না ?

[লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নারায়ণ হনুমানের পার্ট দেখায় আর মুখে গান ধরে]

—কালো মউ খাইতে বুড়ো হনুমন্তে
নগরী করিলে নষ্টী,
ওঁ গোবিন্দায় রাম।

—ত্যাখন সকলো নট যুদ্ধের নাচ নাচিবে।

[এই ব'লে মুখে খোলের বোল বাজিয়ে, নেচে নেচে অভিনয় দেখায়]

—টা টা টাওঁ, বাটা টাওঁ, বা-টা টাক্ ঠেই ;
বি টি টাওঁ, টিটি টাওঁ, খিটি টাক ধেই।

[নারায়ণ অট্টহাস্য করে। লবণীও হাসে। অতঃপর লবণীর হাতের পুতুলটা নিয়ে আঙুল তুলে নারায়ণ বলে—]

—আচ্ছা লবণী ছোনা ! এই চাঁদের কণাটুকু কোন্ ?

লবণী : কে আবার ? আমার ময়না।

নারায়ণ : হ্যা, হ্যা—ঈটা ময়না ! (লবণীর থুতনী ধ'রে)—আর ঈটা হয়েলেন ময়নার মা,—আর, মুই য্যান দাসীটি।

[এই ব'লে ধুতির কোঁচাটা খুলে মাথায় ঘোমটার মতো ক'রে দাসী সাজে]

লবণী : (উল্লাসে হাততালি দিয়ে) মা-মা—নারায়ণকে দ্যাখো ! (নারায়ণের গোঁফ দেখিয়ে)—তোমার এগুলো কি ? দাসীর বুঝি এগুলো থাকে ! মেয়ে-মানুষের আবার দাড়ি থাকে ?

নারায়ণ : (মিহি সুরে) সাদা-সাদা মেমগুলার থাকে।

[দুজনেই হাসে। হাসির মাঝখানে পিয়লির প্রবেশ]

পিয়লি : নারায়ণ !

[পিয়লির ডাক শুনে নারায়ণ চমকে উঠে ঘোমটা নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে]

নারায়ণ : মেজকত্তা—সকলো ঠিকেই আছে।

পিয়লি : তুই কতক্ষণ ফিরেছিস ?

নারায়ণ : মন্দিরে ঢাক বাজার সাথে সাথেই আহিছি, মেজকত্তা !

পিয়লি : তাহ'লে আয়।

[দুজনে প্রস্থানোদ্যত, এমন সময়ে সুচিন্তার প্রবেশ]

সুচিত্রা : ধুলো পায়ে এসেই এই ভর্-সন্ধ্যেয় আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

পিয়লি : সুচিত্রা ! দিনদুয়েক এই প্রশ্ন তুমি আমায় কোরো না। তুমি তো জানোই, আমি বিপথে যাব না।...আয় নারায়ণ !

[দুজনে পা বাড়ায়। এমন সময়ে লবণী বলে—]

লবণী : বাবা ! তাড়াতাড়ি এসো। তোমার সঙ্গে খাব ব'লে আমি ব'সে থাকব।

পিয়লি : (লবণীকে আদর ক'রে) আচ্ছা, আসব লবণীসোনা ! ঠিক খাবার সময়েই আসব।

[নারায়ণ ও পিয়লির প্রস্থান]

সুচিত্রা : সময়-অসময় নেই, কোথায় যান, কী করেন, একমাত্র হরিই জানেন। আমি জানি, উনি কুপথে যাবেন না। কিন্তু একটু বিশ্রাম না নিয়ে, আরাম না ক'রে, রুগ্ন দেহে দিনরাত ঘুরে বেড়ান—আমার মন যে মানে না।

লবণী : মা—বাবা কোথায় গেল ?

সুচিত্রা : একটা কাজে গেছেন, লবণী। যাও, তুমি খেলা কর।

[লবণী খেলতে থাকে। পিয়লির মার প্রবেশ]

পি. মা : বৌ। মেয়েটাকে কিছু খাইয়ে শুইয়ে দাও।...পিয়লির গলা য্যানো শুনতে পেলুম— কোথায় গ্যালো ?

সুচিত্রা : কোথায় গেলেন, বলতে পারব না, মা ! এসেই, নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন। খাবার সময় ফিরে আসবেন, ব'লে গেছেন।

পি. মা : এদের যে কী হয়েছে, বুঝি না। ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। মুখটা দেখলেই মনে হয়, কী এক গুরুতর ভাবনায় ডুবে আছে।

সুচিত্রা : এই রাত্রে বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে কি রকম য্যানো ভাবনা হয়। আপনি ছেলেকে একটু বলবেন তো, মা !

পি. মা : একটা কথা আমি কতোবার ক'রে বলব, বৌ।

[জন্মির প্রবেশ। সুচিত্রা ঘোমটা টেনে চলে যায়। সঙ্গে লবণীকে নিয়ে যায়]

জন্মি : কাকে কী বলার কথা বলছো, মা ?

পি. মা : তোর ভাইয়ের কথা বলছি। এ্যাতোতেও তোদের চেতন হল না? তোদের বাবা তো যা করবার, করেছেন। তোদের নিয়েই আমার হয়েছে মুশকিল।

জন্মি : মা—এসব তুমি কী বলছ ? তুমি কার ওপর রাগ করছ ?

পি. মা : পিয়লির এতো রাত অবধি বাইরে থাকাটা আমার ভাল লাগছে না। তোরা যদি আমার কথা না শুনিস, আমি ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

জন্মি : মা ! তোমরা স্ত্রীলোক, অল্প কথাতেই রেগে ওঠ। সে বাচ্চা ছেলে নয়— কাঁচা কাজ করবে না। যা-কিছু করছে, নিশ্চয়ই দশের উপকার হবে ব'লে করছে, লোকেদের ভালোর জন্যেই।

পি. মা : আমি অনেক সয়েছি, জন্মি। বুড়ো দেহ আর টানতে চায় না। লোকেদের মতিগতিও খুব সুবিধের দেখি না। অবুঝকে বোঝানো আর নিফলা যত্ন করা, একই কথা। দলের উপকার করব ব'লে আগুনে ঝাঁপ দেয়াটা আমি ভাল ব'লে মনে করি না।

জন্মি : মা! ভাল-মন্দ এখনই ঠাহর করা মুশকিল। কিন্তু একদিন আসবে, যেদিন লোকেরা সব বুঝতে পারবে।

পি. মা : তোদের এসব কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়। এখন যা—হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে গিয়ে।

[জন্মি ও মায়ের প্রস্থান। নারায়ণের প্রবেশ]

নারায়ণ : মা! মা!

সুচিতা : (ভেতর থেকে) কে—নারায়ণ না ?

নারায়ণ : মা! পেটের পোকাটি মরছে—নাড়ি সকল জট খাই পাক দিছে—পেট গৈ পিঠে নাগছে।

[মায়ের প্রবেশ]

পি. মা : এ্যাতো রাত অবধি তোরা কোথায় গিয়েছিলি ?...ঢাকের সঙ্গে বাঁয়া !

নারায়ণ : (অন্যদিকে তাকিয়ে) না...ই...এ-ই—

পি. মা : না—এই—বুঝেছি! কিন্তু এতো রাত পর্যন্ত খোঁড়া ছেলেটাকে এইভাবে নিয়ে গিয়ে আড্ডা মারাটা আমি একেবারেই ভাল বুঝছি না। এই বাড়িতে তুই চুল-দাড়ি পাকালি, তবু তোর জ্ঞান হল না।

[নারায়ণ না শোনার ভান ক'রে অন্য কথায় পিয়লির মার কথা ঘোরাতে চায়]

নারায়ণ : হঁ্যা ঠাম্‌মা! বাটে-ঘাটে যা অশরীরি! কোনো উপায় নাই।

পি. মা : তোর বক্‌বকানি থামা দিকি! আজকের পর থেকে যদি আমি—

নারায়ণ : হরি হরি! মোর গুরু ঐ! আইজ কপালে কিবা অকাল-অঘটন ছিল, মনে লয়। উমা কী কাণ্ড! এই কুমড়া হয়, এই প্যাঁচাটী হয়্যা মিউ-মিউ করে।

পি. মা : নারায়ণ! আমি বলছি বাইরে বাইরে থাকার কথা, আর তুই বলিস, বাদুড়ে খেলে কলার থোকা!

[নারায়ণ ভেতরের দিকে মুখ করে সুচিতাকে শুনিয়ে বলে—]

নারায়ণ : মাগো! পেটের জ্বালায় যে—

[সুচিতা প্রবেশ করে]

সুচিতা : ভাত হয়ে গেছে। রাঁধুনীকে ব'লে খেগে যা।

নারায়ণ : না মা। ভাত খোয়ার আগে জলপান এ্যাট্‌টা—হ্যা। মেজকত্তা আসেন, পরে-পশ্চাৎ ভাত খোয়া যাবে।

সুচিতা : তাহলে, দাঁড়া।

[প্রস্থান]

নারায়ণ : ঠাম্‌মার খাওন সারি শোওন দিয়াটাই ভাল। হ্যা, বুড় মানুস—

পি. মা : শুলে, আমার ঘুম আসবে না—যতদিন না তোদের এইসব উৎপাত বন্ধ হয়।

নারায়ণ : বেশ, বেশ! তাঁকেই বুলি এ্যাকবার চেষ্টা করেন না—হ্যা।

[পিয়লির মা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে চলে যায়। একটা ঘটিতে জল এবং একটা বাটিতে[1] জলখাবার নিয়ে সুচিতা আসে। জলখাবারের বাটি দেখে নারায়ণ নিজেই একটা মাদুর পেতে বসে পড়ে এবং হাত বাড়িয়ে বাটিটা নেয়।]

—দিয়েন, দিয়েন—মা।

[নারায়ণ বাটিটায় একটা আঙুল ডুবিয়ে ঝুঁকে দেখতে দেখতে বলে—]

—মা! আজি দেহি সকলো বিপরীত!

[জলখাবারে আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলে—]

—কৃষ্ণদেউ!...

হুচ্‌হুচায়ং চকলা-চকলি,
মিঠৈয়েন রক্তবর্ণং,
দুগ্ধেন গলগলায়ং নমঃ।[2]

[এই ব'লে জলখাবার খেতে থাকে। স্মিত হেসে সুচিতা ভেতরে চলে যায়। পিয়লির মা'র পুনঃপ্রবেশ। পিয়লি তখনও ঘরে ফেরেনি দেখে মা'র রাগ হয়। যেন দেখতে পায়নি—এইরকম একটা ভাব ক'রে নারায়ণ একাগ্রচিত্তে জলখাবার খাওয়ায় নিবিষ্ট থাকে]

পি. মা : শোন্ নারায়ণ! আজকের পর থেকে, দিনের বেলা যা খুশী কোরো। সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের ঘরে ফিরে আসতেই হবে। রাত্তিরে আমি কাউকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দোব না। পিয়লি—

[উৎকণ্ঠিত উত্তেজনায় চলে যায়। নারায়ণ ধীরে ধীরে মাথা তুলে পিয়লির মা'র যাবার দিকে তাকায়, চলে যেতেই বলে—]

নারায়ণ : ঠাম্‌মা! অন্তরের ভার তুমি কি বুঝবা! কোমল চাউল, দৈ, দুধের এইহ্যান জলপান য্যাতোদিন না সাদা ফিরিঙ্গির দাড়ি-গোঁফে ঘষছি, ত্যাতোদিন দিবা-নিশা সদা সমান হয়্যা থাকবে। তা, তোমার জ্ঞানেতে গেলেই তো দোষ। অতএব, আইজ হইতে সন্ধ্যাকালে পলানুধ্বর্ম্, অতি প্রত্যূষে শয্যাগ্রহণম্; তথাপি মেজকত্তাকে অকলে ছাড়ি দিব না। সাদা ফিরিঙ্গির লাল পিপীলিকার বাসায় আসন দি' তবে ছাড়ান।...শরীরি হে—অশরীরি না।

1. বাটির একটা পা, হস্তিপদ।

2. লাল মিঠাইয়ের হুঁশিয়ার খণ্ডগুলো দুধে গলে গিয়ে যে রক্তবর্ণ, তাকে নমস্কার (সম্ভবত. এই ধরণের কোন অর্থ)।

[নারায়ণ খাওয়া শেষ করে ; তারপর মেঝের থেকে উচ্ছিষ্ট বাটিতে তুলে নেয়, জায়গাটা মুছে নেয় ; ঘটি-বাটি নিয়ে চলে যায়। পিয়লির প্রবেশ]

পিয়লি : নারায়ণ।

[গামছায় মুখ মুছতে মুছতে নারায়ণ আসে]

—বাড়ির সবাই খাওয়া-দাওয়া করেছে ? মা শুয়েছে ?

নারায়ণ : ঠাম্‌মা এইমাত্র যৈছে। কিনতুক এ্যাকেবারে তপ্ত লোহার আগন ! হরি ছাড়িলেও দড়ি না ছাড়ে ! মুই সরি পইড়ব খুঁজি, বুড়ী জোর পাক দি দি ধরে।

পিয়লি : বুঝেছি। ধনঞ্জয়, ধনুধর, উদয় সিং আর পিয়লি বরুয়া—সব ঠিক। নাচনী—পাঙ্কে নৌকো...আর তুই আমার সঙ্গে, বুঝলি ?

নারায়ণ : হ্যা, মেজকত্তা।

পিয়লি : এখন তুই যা—ভাত খা গিয়ে।

[নারায়ণের প্রস্থান। সুচিতা আসে। পিয়লি একটা-একটা ক'রে পোষাক ঢিলে করে নেয় ; বসে]

পিয়লি : সুচিতা ! আমার একটু দেরি হল, না ? তুমি বোধহয় খুব বিরক্ত হয়েছো ? লবণী কি শুয়ে পড়েছে ?

সুচিতা : আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে এইমাত্র শুল।...আপনি ভেতরে চলুন।

পিয়লি : চলো।

[সুচিতা ও পিয়লির প্রস্থান। নারায়ণ প্রবেশ ক'রে মেঝের এটা-সেটা জিনিস যার যথা স্থানে রেখে দেয়। বাটা থেকে একটা সুপারি নিয়ে খায়]

নারায়ণ : আরে ! এইমাত্র চুরি করি এ্যাক বাটি জলপান খাই উঠলম—মুশুদ্দিখনও ভাল করি জমে নাই—পেটের যে পুনর্‌ভোক্‌ নাইগল ! আইজ লাগাত কেইদ্দিন মোকে কি-যে ভোকে ধরছে, কইতি পারি না। এইটা ভোক নয়, ঈ এ্যাক সব্বনাশা ক্ষুধা। এইটা মোর ভালর জন্যি হয় নাই। মনে হয় এইবার মোর—'আগলতি কলাপাত লড়ে কি চড়ে'। তথাপি এই শম্মা পিছপাও নয়—'মারে হরি রাখে কে ; রাখে হরি, মারে কে !'

তবে হ্যা—মেজকত্তা এইটা কিনতুক ভাল কাজ করেন নাই। এহ্যান গুরুতর কাজে স্ত্রীজাতিকে টানা-হ্যাঁচোড়া করা মোর সমূলেই ভাল লাগে নাই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতির অবশ্যে সাহসের অভাব নাই ; কিনতুক এই কাজটি, মোর মতে, অগ্রাহ্য হৈলছে। এক্কেবারে উপদ্রব। শাস্ত্রে কৈছে—স্ত্রীজাতি পাতার তল। একথা ঠিকেই যে, কাজটার হাল ধরি আছেন মেজকত্তা। তবে, দেশখান এ্যাক জাত, এ্যাক বাত, এ্যাক ভাত যদি হৈত, তবে কাজটা আরো সরল হৈত—হয়তো বা। শাস্ত্রে নাকি কৈছে—কলিকালে হ্যানো কালো রমণীর কেশে আর মাটির

ঢিপিতে থাকে। শাদা বিদেশীর অবশ্যে কেশের ভয়টা ত্যাতো নাই; তেনাদিগের কালো এ্যাহন ঢিপিতেই আছে। এ্যামন মাটি-খোঁচরা জাত না!...তা, মাটি খুঁচড়িবার বাসনা যদি, আন্ দেশে যা—য্যাতো পার, খোঁড়, সিন্ধ দিয় দে গিয়া। আমাদিগের দেশে আহিছিস্ ক্যান? আমাদিগের দেশে তোরা কোনোই সুবিধা কর্তি পারবি নি। আমাদিগের উপরি-পুরুষ সকলে ঘরের চাল যিভাবে গাঁথি দি যৈছেন, কোন্খানেতে সিন্ধ দিবি? তোদের সাথে মোদের কিসের মিতালী? কিসের মিল? না বরণেতে মিল, না বচনেতে মিল, না ভোজনেতে মিল, না শয়নেতে মিল। জাগ্রতে মিল তো নাই-ই, সপোনেতেও তোদের সাথে মিল নাই বুলি মনে লয়। অ্যা— সপোনইবা তোরা দ্যাহস্ ক্যাম্নে? (গলা খাঁকারি শুনে)—অ', মেজকর্ত্তার গলা-হেকারনি য্যান্ শুনি! অন্ন প্রসন্ন ধইরছে সম্ভবত।

[তাড়াতাড়ি গড়গড়াটা এনে পিয়লির বসার জায়গার কাছে রেখে প্রস্থান করে। পিয়লি প্রবেশ ক'রে বিছানার ওপরে ব'সে সুপুরি খায়; তারপর গড়গড়ির নল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে তামাক খায়। কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে চিন্তায় ডুবে থাকে। তারপর মনে মনে ভাবা কথাগুলো ব্যক্ত করে]

পিয়লি : নর্তকী, অজ্ঞাতকুলশীলা! তবু উপায় নেই। সব স্থির, যদি অন্যথা না করে।...নর্তকী! কার্য সিদ্ধি হলে তোকে যথোচিত পুরস্কার দেব, সোনার অলংকার দেব, তোকে জমি দেব, ক্ষেত দেব, তোর নামে আল বেঁধে, মন্দির গড়ে, সোনার ঘট স্থাপনা ক'রে, তোকে মস্ত বড়ো খেতাব দেব; তোকে...তোকে ...আরও অনেক কিছু দেব। (বিরতি)—এদিকে একমুঠো সেনা, ওদিকে সংখ্যাহীন ইংরেজ সিপাই। ঈশ্বর! কোন্ মহাপাপে তুমি আমাকে খোঁড়া করলে? দেশের জন্যে লড়াই ক'রে মরা, সেই গৌরব থেকেও আমাকে বঞ্চিত করলে?...উঃ, আমি খোঁড়া, আমি...আমি পারব না! নারায়ণ—নারায়ণ!

[মানসিক উত্তেজনায় পিয়লি ওঠবার চেষ্টা করে, উঠতে না পেরে, অসহায়-ভাবে আবার বসে পড়ে। সুচিতার প্রবেশ]

সুচিতা : স্বামিন!

[সুচিতা কাছে গিয়ে বসে, এবং হাত দিয়ে ধরে]

পিয়লি : অ্যাঁ? সুচিতা—

সুচিতা : নারায়ণকে ডাকছিলেন ক্যানো?

পিয়লি : কিছু না সুচিতা! নারায়ণ কি শুয়েছে?

সুচিতা : শুতে গেছে; কিন্তু—

পিয়লি : তোমার খাওয়া হয়েছে?

সুচিতা : হ্যাঁ-স্বামিন্!

[পিয়লি গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় তামাক খেতে থাকে, তারপর বলে—]

পিয়লি : কাল কৃষ্ণা চতুর্দশী, না সুচিতা ?

সুচিতা : একথা জিজ্ঞাসা করছেন ক্যানো, স্বামিন !

[পিয়লি বাইরে আকাশের দিকে তাকায়]

পিয়লি : না, এমনিই। বাইরে খুব অন্ধকার দেখছি। অন্ধকার রাত্রে আমি একলা বাইরে থাকলে তোমার খুব ভয় হয়—না ? খোঁড়া মানুষ--কি জানি কোথায় কোন্ খানা ডোবায় পড়ে শেষ হ'য়ে যায় ! কী করবে ? তোমার বিয়ে হল এই খোঁড়ার সঙ্গে। তোমার কপাল ! আমার এই রুগ্ন দেহটাই তোমাকে বোধহয় মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। সুচিতা ! তোমার অদৃষ্টে আরও কতো দুঃখ যে আছে !

সুচিতা : স্বামিন ! আপনি ক্যানো আজ রাত্তিরে এইসব অমঙ্গলের কথাগুলো বলছেন ? আমার বড় ভয় করে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছেন, এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়াই ভালো।

পিয়লি : শুয়ে পড়ব ? শুলে তো আমি শান্তি পাই না, সুচিতা ! তোমার কপালে সুখ লেখা নেই, আর আমার অদৃষ্টে বিশ্রাম লেখা নেই। এ হল পূর্বজন্মের কর্মফল এবং বাবার রেখে-যাওয়া পৈত্রিক ঋণ ! বেচারী লবণী ! মেয়ে আমার বুকের মধ্যে শুতে চায়। কিন্তু বাছা জানে না যে, পিতৃঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমার ছুটি নেই। আমি যে জীবন-মরণ নিয়ে খেলা শুরু করেছি !

সুচিতা : এসব আপনি কী বলছেন, স্বামিন !...আজ ক দিন ধরেই আপনাকে খুব চিন্তিত দেখছি।—ক্যানো ?

পিয়লি : সুচিতা ! মনে আমার অনেক কষ্ট। অনেক জায়গায়, অনেক লোকের কাছে অশেষ পরিহাস-লাঞ্ছনা সহ্য করছি। লোকেরা আমাদের ডাকে না, প্রতিবেশীরা আমাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। দাসী পাই না—বেচারী লবণী একা-একা বিমর্ষ চিত্তে খেলা করে। আর তুমি—তুমি সমস্ত অবহেলা, লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য ক'রে, আমার এই রুগ্ন দেহটার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছো। এক অশান্তির মধ্যে তোমরা রয়েছো।

সুচিতা : আপনি বেশি ভাববেন না, স্বামিন।

[কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে পিয়লি বলে—]

পিয়লি : আজ বেরোতে মন চাইছে না, সুচিতা। আকাশটা ক্যামোন য্যানো লাল ! গোটা আকাশটা য্যানো রক্তের ডেলা। মাঝে মাঝে এতো লাল, য্যানো রক্তের ডোবা এ্যাক-এ্যাকটা।

সুচিতা : কখনও কখনও আকাশ ওইরকম লাল দেখায়, স্বামিন।

পিয়লি : কখনও কখনও দেখায় ! বাবা আগে একবার দেখেছিলেন। কিন্তু তুমি

জানো না—এ কিসের ইঙ্গিত ! (কিছুক্ষণ নতমস্তক। আবার বলে)—সুচিতা। কাল আমি এ্যাক দীপান্বিতার আয়োজন করেছি।

সুচিতা : দীপান্বিতা ! কাল তো দীপান্বিতা নয়, স্বামিন !

পিয়লি : রাক্ষসের হাত থেকে জানকীকে উদ্ধার করার জন্যে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেছিলেন। আর আমি অকালে এই দীপান্বিতা পেতেছি ফিরিঙ্গির গ্রাস থেকে আমার মা'কে উদ্ধারের জন্যে।

সুচিতা : কিছু বুঝতে পারছি না আমি।

পিয়লি : পরে বুঝতে পারবে। আমার পাতানো দীপান্বিতা দেখো। সেই দীপান্বিতার দীপাবলীর আলোয় মন্দিরের কলস উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, দিখৌ-এর জল রাঙা হয়ে যাবে, আমাদের হাউই-পটকার শব্দে সমাধি-শয়ান স্বর্গদেবগণ জীবন্ত হয়ে উঠে বসবেন।...অমন ভাবে কী দেখছ তুমি, সুচিতা ? আমি যা বলছি, সত্য। এ্যামন ভয়ঙ্কর দেয়ালী দেব যে, বড় ফুকনের বাড়ির নাম শুনলে কেউ, আর কখনও, অসম্মান করতে সাহস পাবে না। কাল যে দেয়ালীর আয়োজন করব, আমার মৃত্যুর পরেও তার ঔজ্জ্বল্য রাঙা হয়ে, জমাট বেঁধে, কালাতীত হয়ে থেকে যাবে। ভবিষ্যতে, আমাদের দেশের যুবক দল সারা দেশ জুড়ে বারবার আয়োজন করবে পিয়লি ফুকনের এই দীপাবলী নাটকের !

সুচিতা : স্বামিন ! আপনি কোন্ দেয়ালীর অনুষ্ঠান করছেন ? এসব কী বলছেন ? এ ধরণের কথা বললে আমার খুব ভয় হয়।

পিয়লি : ভয় কোরো না, সুচিতা—ভয় কোরো না ! কাল সকালে, স্নান সেরে, মন্দিরে পূজো ক'রে এ্যাকটা প্রদীপ দিয়ে আসবে—তোমার সিঁথির সিঁদুর য্যানো অক্ষয় হয়ে থাকে।

[ছোট মেয়েকে আদর করার মতো, সুচিতার মাথা বুকের মধ্যে রেখে পিয়লি গভীর ভাবে আদর করে। পর্দা নামে]

বারুদ-খানা

[দূরে ইংরেজের বারুদ-খানা। তার কাছাকাছি ঝোপ-জঙ্গল। সময় রাত্রি। বারুদ-খানার সংলগ্ন ইংরেজ-শিবির থেকে সংগীতের সুর ভেসে আসতে শোনা যায়।

ঝোপের আড়ালে এবং বড় গাছের গায়ে কয়েকজনকে গা মিশিয়ে থাকতে দেখা যায়। হামাগুড়ি দিয়ে উদয় সিং প্রবেশ করে ; অতি সন্তর্পণে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে, একটা ঝোপের কাছে গুড়ি মেরে বসে প্যাঁচার মতো আওয়াজ

ক'রে সংকেত দেয়। আগে থেকে ওখানে যারা লুকিয়ে রয়েছে, তাদের কাছ থেকেও একই সংকেত আসে। উদয় সিং দাঁড়িয়ে উঠে একটা গামছা নাড়ায়। আর, সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেমে ধনঞ্জয়, ধনুধর ও পিয়লি বরুয়া এবং ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা অন্যান্য সবাই উদয় সিং-র কাছে এসে, একটা গাছের তলায় জুড়ো হয়। ওদের পরস্পর ফিসফিস ক'রে কথা বলতে দেখা যায়। এইসময়ে, নারায়ণের পিঠে চড়ে পিয়লি ফুকনের প্রবেশ। নারায়ণের হাতে পিয়লির ক্রাচ-জোড়া। নারায়ণ পিয়লিকে পিঠ থেকে আস্তে নামিয়ে দেয় ; পিয়লি ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে যায়। তখন সকলে সাবধানে পা ফেলে পিয়লির কাছে চলে আসে]

পিয়লি : বরুয়া ! বারুদ-ঘরে প্রহরী ক'জন ?

পি. বরুয়া : (আঙুল দিয়ে দেখায়—দুজন)

পিয়লি : বাকী প্রহরীরা সব কোথায় আছে ?

ধনঞ্জয় : নাচ ঘরে।

[পিয়লি ফুকন নারায়ণকে ইঙ্গিত করে। নারায়ণ ঝোপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আবার বেরিয়ে আসে, সঙ্গে ছ'জন লোককে নিয়ে ; এসে দাঁড়ায় পিয়লির কাছে। তাদের মধ্যে চারজনের হাতে বন্দুক, বাকি দু'জনের হাতে তীর-ধনুক। নারায়ণের হাতে একটা ছোট বারুদের বাক্স। পিয়লি ফুকন বন্দুকধারী দলের নেতাকে হাত ধ'রে কাছে টেনে এনে বলে—]

পিয়লি : তুই কতোদিন বন্দুক চালাচ্ছিস ?

ব. ধারী : মুই ধুতি পরণের পর থিকাই বন্দুক চালাইছি।

পিয়লি : বন্দুক চালাতে কোথায় শিখেছিস ?

ব. ধারী : মুই স্বর্গদেবের দেহরক্ষী দলের প্রধান হিলৈদার[1] ছিলম।

পিয়লি : আচ্ছা !...তাহলে শোন্। এখান থেকে তিনশ' হাত দূরে ওই বারুদ-ঘরে সেন্ট্রি পাহাড়া দিচ্ছে। সঠিক নিশানে গুলি করতে পারবি ?

ব. ধারী : পাইরব কত্তা।

পিয়লি : পারবি !...তাহলে তোরা বারুদ ভ'রে তৈরি হ'। আমি সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুই আর তোর সঙ্গী বন্দুকধারীরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাতে থাকবি।

[বন্দুকধারী অন্যদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তীরন্দাজ দুজনকে কাছে ডেকে এনে পিয়লি বলে—]

পিয়লি : তোরা তীর-ধনুক জুড়ে তৈরি থাক। খুব সাবধানে, গোরা সিপাইদের লক্ষ্য ক'রে তীর ছুঁড়বি, বুঝলি ?

---

1. বন্দুকধারী।

[দুজনে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায়। বারুদ-খানার দিক থেকে নাচ-গানের শব্দ ভেসে আসে। পিয়লি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, অভীষ্ঠ হ'য়ে বলে—]

পিয়লি : নারায়ণ! কই. নর্তকী তো এ্যাখনও এল না!

নারায়ণ : মুই বড় ভাল দেহি না. মেজকত্তা...সে আমাদিগকে কিবা বিপাকে ফেলবে, মনে লয়। স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস নাই।

পিয়লি : না নারায়ণ! সে স্বর্গদেবের নামে, পূর্বপুরুষের নামে, আমার চরণ ছুঁয়ে শপথ করেছে। সে আমাদের প্রবঞ্চনা করবে না।

[নারায়ণ ও পিয়লি উদ্‌গ্রীব হয়ে বারুদ-খানার দিকে চেয়ে থাকে]

পিয়লি : ওই-ওই-নারায়ণ! ও আসছে।

[সকলে উদ্বিগ্নচিত্তে নর্তকীর আগমন-পথের দিকে চায়। হাতে শল্‌তে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে নর্তকীর প্রবেশ। এসেই, শল্‌তের মাথাটা পিয়লির হাতে গুঁজে দেয়]

নর্ত'কী : ফুকন ঠাকুর! আমি ফিরে গিয়ে, নাচের ভঙ্গিতে, নাচঘরের দরজা থেকে প্রদীপের আলো দেখিয়ে, সংকেত করব। আপনারা তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করবেন। আমি চললুম।

পিয়লি : আমরা প্রস্তুত। শুধু তোর সংকেতের অপেক্ষা। তুই যা। (নর্তকীর প্রস্থান। সহচরদের দিকে চেয়ে)—এই কাজে হাত দেয়ার আগে আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তোমরা সবাই হাঁটু গেড়ে ব'স।

[সবাই পিয়লিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে নতজানু হয়।]

পিয়লি : স্বর্গদেবের নামে আমরা শপথ করছি—

সকলে : আমরা শপথ করছি—

পিয়লি : আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না—

সকলে : করব না।

পিয়লি : আমরা কার্যসিদ্ধি করব—

সকলে : কার্যসিদ্ধি করব।

পিয়লি : দেবী! শ্বেত বিদেশীদের গ্রাস করুন!

সকলে : দেবী! শ্বেত বিদেশীদের গ্রাস করুন।

[সবাই নতজানু অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ায়]

পিয়লি : এ্যাখন যাও। যে-যার নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে থেকে আমার সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করো।

[সবাই ঝোপের আড়ালে গিয়ে, নিজের নিজের স্থানে প্রস্তুতভঙ্গিতে অপেক্ষা করে। পিয়লি ও নারায়ণ শল্‌তে ধরে অগ্নিসংযোগ করার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে, একাগ্রচিত্তে বারুদ-খানার দিকে চেয়ে থাকে]

নারায়ণ : মেজকত্তা অই—নাচনী প্রদীপের সংকেত দিছে।

[পিয়ালী সেই দিকে চেয়ে প্রদীপের সংকেত দেখে—]

পিয়লি : নারায়ণ! আগুন দে—আগুন দে—

[পিয়লি শলতে ধ'রে থাকে। নারায়ণ শলতেয় আগুন ধরিয়ে দেয়। শলতের বারুদে আগুন লেগে পুড়তে পুড়তে এগোতে থাকে। পিয়লি আর নারায়ণ স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এক সূচ পড়লেও শব্দ হয়, এমন নিস্তব্ধতা। শুধু, বারুদ-খানার নাচঘর থেকে নাচ-গানের একটা ক্ষীণ সুর ভেসে আসে। একটু পরে, বারুদ-ঘরে আগুন লেগে বারুদ ফাটার একটা ভীষণ শব্দ হয়।

সঙ্গে সঙ্গে পিয়লি সবাইকে বন্দুক এবং তীর ছোঁড়ার সংকেত দেয়। বন্দুকের কর্ণবিদারী শব্দে, রঙ্গমঞ্চ কেঁপে ওঠে। পিয়লি নিজেও মাটিতে বসে বন্দুক তাক করে। নারায়ণ পিয়লিকে বারুদ জোগাতে থাকে। তীরন্দাজ তীর ছোঁড়ে। বারুদ-খানার দিকে কোলাহল ওঠে; নেপথ্যে বিউগ্‌ল্‌-এ বিপদ-সংকেত বেজে ওঠে: সঙ্গে সঙ্গে পাগলা-ঘণ্টি শোনা যায়।...বারুদ-ঘরের আগুনের আলোয় মাঝে মাঝে রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হতে থাকে। বারুদ-খানার দিক থেকেও বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শোনা যায়। রঙ্গমঞ্চে আলো পড়লে মানুষদের স্পষ্ট দেখা যায়। চারদিকে চিৎকার, বন্দুকের শব্দ, আর মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠা আগুনের আলোয় গোটা দৃশ্যটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। উদয় সিং দৌড়ে পিয়লির কাছে চলে আসে]

উদয় সিং : ফুকনজী। বারুদ-ঘরেতে আগ খুব বড়িয়া ধরিছে। অব্ পল্টন আসি হামলোগকো ঘিরে লেবে। তুরন্ত এই জায়গা ছোড়তি হোবে।

পিয়লি : উদয় সিং! সবাইকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। দিখৌতে পাঞ্চৈ নৌকো তৈরি আছে। তোমরা সবাই এ্যাখনই চলে যাও। আমি আর নারায়ণ খেল্‌নাও[1] নিয়ে যাব।

নারায়ণ : মেজকত্তা, আপোনিও চলেন।

উদয় সিং : হা ফুকনজী। আপনি ভী চ'লেন।

পিয়লি : তোমরা যাও। আমি বন্দুক ছুঁড়ে ছুঁড়ে ইংরেজের গতিরোধ করব। ঠিক সময়ে আমি আর নারায়ণ পৌঁছে যাব। যাও—

[উদয় সিং-র সঙ্গে সবাই চলে যায়। পিয়লি ও নারায়ণ থেকে যায়। একা পিয়লি বন্দুক ছুঁড়তে থাকে। বারুদ-খানার দিক থেকেও গুলি আসতে থাকে। নারায়ণ বারুদ জোগায়, এবং গলা তুলে তুলে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। ক্ষণপরে ধনুধর ও ধনঞ্জয় দৌড়ে প্রবেশ করে]

---

1. স্পীডবোট।

ধনঞ্জয় : ফুকন ! সর্বনাশ—

পিয়লি : কী হয়েছে ?

ধনঞ্জয় : কে-য্যানো দড়ি কেটে পাঞ্চৈ নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে। শুধু খেল্-নাওটা একটু দূরে রয়েছে। উদয় সিং সবাইকে নিয়ে সাঁত্‌রে পার হয়ে গেছে। ঘাটে আছে পিয়লি বরুয়া।

পিয়লি : তোমরা—

ধনুধর : আপনাকে একা ছেড়ে আমরা যাব না।

পিয়লি : কথা শোন। খেল্-নাও নিয়ে তোমরা এখনই যাও।...নারায়ণ, তুইও যা। আমি একলা ফিরিঙ্গিদের ঠেকাব। তোরা পালা।

নারায়ণ : তা হয় নে, মেজকত্তা। আপোনিও চলেন।

পিয়লি : ওই নৌকোয় আমরা সবাই যেতে পারব না, নারায়ণ। আমার কথা ভাবতে হবে না। আমি খোঁড়া...আমি গেলেও, তোমাদের বাঁচতেই হবে। যাও-যাও—

ধনুধর : ফুকন। আমি—আপনি আসুন।

নারায়ণ : মেজকত্তা! আপোনি আসেন, আমার পিঠে ওঠেন।

পিয়লি : তর্ক করবি না। যা করতে বললাম, তাই কর্। যা-যা-নারায়ণ, যা—

নারায়ণ : না, মেজকত্তা—আপনাকে যাতি হবেই। পিঠে ওঠেন। শৈশব থিক্যা, ভৃত্য-স্বরূপে, কাঁখে-পিঠে লয়্যা এ্যাতোটা বড় করছি। এ্যাহন প্রাণ গেলেও ছাড়ি যাতি পারব নি। মেজকত্তা! আপনি ওঠেন—ওঠেন! মোর পিঠে ওঠেন!

[পিয়লিকে নেবার জন্যে নারায়ণ পিঠ পেতে দেয়। সেই মুহূর্তে কুপারের রিভলবার থেকে গুলি এসে নারায়ণের পিঠে লাগে। 'উশ্‌' ব'লে নারায়ণ পড়ে যায়। ধনঞ্জয়, ধনুধর আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু, সামনে-পেছনে, কয়েকদিক থেকে, গোরা-পল্টন ঘিরে ধরায় ওদের গতি রুদ্ধ হয়। বেয়নেট-লাগানো বন্দুকের ডগা দিয়ে ওদের ঠেলে আনা হয় ; ওরা বন্দী হয়। পেছন দিক থেকে, একদল পল্টন-ফৌজ নিয়ে নিউভীল প্রবেশ করে।

পিয়লি, ধনঞ্জয়, ধনুধর হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। রিভলবার হাতে কুপার প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে দুজন পল্টন পিয়লি বরুয়াকে নিয়ে আসে]

কুপার : Captain Newville ! Please take charge of the lameman and his gang and take them to our camp. Let me find out the others.

[কুপারের প্রস্থান]

নিউভীল : Proceed on, quick !

[সেকথায় কান না দিয়ে পিয়লি স্থিরদৃষ্টিতে নারায়ণের দিকে চেয়ে থাকে]

পিয়লি : নারায়ণ।

নিউভীল : Quick ! Quick !

[রিভলবারের ডগা দিয়ে নিউভীল পিয়লির পিঠে খোঁচা দেয়। পিয়লি পড়ে থাকা নারায়ণের দিকে একবার চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ধীরে এগিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সকলে প্রস্থান করে। পর্দা নামে]

বিচার

[শিবসাগরস্থ কাছারী। বিচার-কক্ষ। বিচারের আসনে কর্ণেল কুপার। নথি-পত্র নিয়ে নীচে বসে আছে বাঙালী পেশকার। একপাশে আসামীর কাঠগড়া। একদিকে, বিচার-দেখতে-আসা মানুষজন সারি দিয়ে বসে আছে। কিছু দাঁড়িয়ে। অন্যদিকে উপবিষ্ট হরনাথ বরুয়া, দুতিরাম, মেথী, প্রভৃতি। পেশকারের কাছে একজন পেয়াদা দণ্ডায়মান। বিচার-কক্ষের বিভিন্ন স্থানে গোরা সিপাই প্রস্তুত অবস্থায় কর্তব্যরত। আসামীর কাঠগড়ায়—পিয়লি, ধনঞ্জয়, ধনুধর এবং পিয়লি বরুয়া। বিচার চলছে।

নিউভীল ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Prosecution Story) দিচ্ছে, এমন সময়ে যবনিকা ওঠে]

নিউভীল : ...But your Honour ! I beg to submit that there must be a very big gang involved in this cospiracy, plotted by Piyali Phookan ; or without a gang such a daring thing would not have been possible for a lame man like Piyali Phookan to accomplish.

কুপার : Alright. পেশকার-বাবু ! আসামীসে জবানবন্দী লইতে হইবে।

পেশকার : দারোগাবাবু। আসামীদের জবানবন্দী নেওয়া হোক।

হরনাথ : ফুকন, আপনারা এ্যাখন নিজের নিজের জবানবন্দী দ্যান।

পিয়লি : আমরা জবানবন্দী দেব না।

হরনাথ : জবানবন্দী দেওয়াটাই নিয়ম।

সকলে : আমরা দোব না।

কুপার : That's alright, Inspector ! We need not press them. পিয়লি ফুকন। টুমি ম্যাগাজিনমে আগুন দিয়াছ ? (অন্যান্য আসামীদের প্রতি) —টুমিলোগ ফুকনকে সহায় করিয়াছিলে ?

ধনঞ্জয় : আমাদের কিছু বলার নেই।

ধনুধর : থাকলেও বলব না।

পি. বরুয়া : কিছু বললে—ফুকনই বলবে।

কুপার : পিয়লি ফুকন। টুমি আগুন দিয়াছিলে ?

পিয়লি : দিয়েছিলাম।

[কুপার কাগজে জবানবন্দী লিখতে থাকে]

কুপার : Very good ! লেকিন, টুমি lame, ল্যাংড়া আদমী আছে। জরুর টুমারা সাথ আউর ভী আদমীর আলবৎ সংযোগ আছে।

হরনাথ : ফুকন। আপনাকে কে-কে উৎসাহ দিয়েছিল, এই সুযোগে, তাদের নামগুলো ক'য়ে দ্যান।

[হরনাথকে একনজর দেখে নিয়ে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পিয়লি বলে—]

পিয়লি : সাহেব ! এই কাজে আমায় কেউ যদি সাহায্য করে থাকেও, তাদের নাম আমি বলব না।

কুপার : হঁা—হঁা—। লেকিন, মরণে কো ওয়াস্তে টুমার কোই ডর্ নেহী আছে ?

পিয়লি : মরণ! মরণের ভয় করে তো একাজে আমি হাত দি' নি।

কুপার : তব্ ?

পিয়লি : মনে রেখো সাহেব, যদিও আমার এই রকম অবস্থা—আমি খঞ্জ—তবু আমার বুদ্ধি, পরামর্শ এবং সাহসের অভাব নেই।

নিউভীল : Your Honour ! His patriotism has blinded his common-sense. He forgot that the blaze of the Magazine could light up the surroundings.

কুপার : He has been befooled ! (পিয়লির প্রতি)—লেকিন পিয়লি ফুকন, টুমার আদমীসবকো ম্যাগাজিনকা লাইটমে হামি দেখ্‌তে পেলম—ইধার উধার ছুটে পালালে। উন্‌সোব্‌কা নাম বাতলাতে হইবে।

পিয়লি : আমার মুখে অন্য কারও নাম শুনতে পাবে না, সাহেব ! এই কাজের জন্যে একলা আমিই দায়ী।

হরনাথ : ফুকন। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবেন নে। সাহেবের কথা শোনেন—আপনাদের মঙ্গল হবে।

পিয়লি : হরনাথ। শ্বেত বিদেশীর দারোগা হ'য়ে নিজের অস্তিত্ব, নিজের আত্ম-সম্মান জলাঞ্জলি দিও না।

কুপার : টুমিলোগ কসুর স্বীকার করে ?

পিয়লি, ধনঞ্জয়, সবাই : কসুর ? কিসের কসুর ?

নিউভীল : ম্যাগাজিন ফায়ার কী কসুর, প্রাণী হত্যা কী কসুর, বিদ্রোহ আচরণ কী কসুর। হঁা—Your Honour ! Here is a letter written by Piyali Phookan to the Kumta Prince seeking his help. ইয়ে ভী এক কসুর।

পিয়লি : (কাষ্ঠ হাসি হেসে) কসুর। বিদ্রোহ।! কিসের কসুর ? কিসের

বিদ্রোহ? দেশ উদ্ধারের চেষ্টা যদি দোষের হয়, তাহলে পিয়লি ফুকন দোষী। কিন্তু সেই দোষ বিচার করার অধিকার তোমাদের কোন্‌খানে, সাহেব? আমি যদি সত্যিই বিদ্রোহী—তাহলে আমার বিচার করবেন—আসামের রাজা... ...আসামের জনগণ...তোমরা নয়।

কুপার : Captain Newville! Please continue your prosecution.

নিউভীল : Your Honour! বার্মীজ কো হটানে ওয়াস্তে গোরা পল্টন আসাম দেশকে নিমন্ত্রণসে আসাম আসিয়াছে। গোরা পল্টন বার্মীজ কো হটাই দিয়া দেশমে শান্তি ফিরৎ আনিয়াছে। হাঁ—লেকিন আভী ভী দেশ নিরাপদ নেই আছে। অসমীয়া আদমী কো ভী জোর বহুৎ কম্‌তি আছে। উসী ওয়াস্তে প্রজাকো নিরাপদ কে লিয়ে ইংরাজ সরকার গোলা-বারুদ কী ম্যাগাজিন বানাইল। গোলা-বারুদ থাকে তো দেশ নিরাপদ থাকিবে। দুশমন-সব attack করিবার সাহস করিবে না। লেকিন, পিয়লি ফুকন আউর আদমী—সব আপনা স্বার্থকো ওয়াস্তে প্রজাকো বহুৎ অন্যায় করিল। আজ ম্যাগাজিনমে গোলা-বারুদ নাই। বিনা গোলা-বারুদ দুশমন নাশ কেইসে হইবে? আজ ফিন্‌ বার্মীজ attack করিলে হামার কামান কেইসে দাগিব? পল্টন সব কেইসে লড়াই করিবে?

Your Honour! I beg to Submit that this is not the first instance—Piyali Phookan and his family betrayed the cause of the country, জব্, His Exeellency, the King of Assam—দেশকো শান্তিমে শাসন করেছিলেন—this Piyali Phookan's father—বদন বরফুকন—earned the notoriority, unparalleled in the history of Assam. বদন ফুকন দেশটাকে ধ্বংস করিয়া দিলে—তামাম বদনাম আনিলে। He will go down to the posterity as one who combines the devil and Satan together.

পিয়লি : এখানে হচ্ছে পিয়লির বিচার। তার পিতা বদনের নামে কলঙ্ক আরোপ ক'রে মিথ্যার অবতারণা কোরো না, সাহেব। তাঁর কাজের আলোচনা করার কোন অধিকার তোমাদের নেই।

সব আসামী : কোনও অধিকার নেই।

কুপার : Order, Order—

নিউভীল : Your Honour! Here stands the leader of this conspiracy, Piyali Phookan, who has, with his gang, destroyed our magazine and has thereby thrown the country open to the enemy —who is known throughout the length and breadth of Assam—known, not for bravery, not for his chivalry, not also for his patriotism, but notorious for his systematic disloyalty, matured

conspiracy and, above all, his most heinous treachery. Fortunately for all, your Honour, he has been caught and stands his trial.

কুপার : Captain Newville! Have you got any witness to be examined?

নিউভীল : Yes, your Honour! দারোগাবাবু, সাক্ষীকো হাজির করিতে হয়।

হরনাথ : পেশকারবাবু! নাচনীকে হাজির করা হোক।

পেশকার : পেয়াদা—অ' পেয়াদা—নাচনীকে নিয়ে এসো।

[পেয়াদা চলে যায় ; এবং ক্ষণ পরে নর্তকীকে নিয়ে প্রবেশ করে। এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় ঢুকিয়ে দেয়]

নিউভীল : Your Honour! The Inspector will conduct this part of the prosecution on my behalf. দারোগাবাবু! সাক্ষীকো জবানবন্দী লইতে হইবে।

হরনাথ : আচ্ছা সাহেব।...নাচনী! তুই হলফ নে যে—'যাহা বলিব, সত্য বলিব'।

নর্তকী : যা বলব, সত্য বলব।

হরনাথ : আচ্ছা—তুই এই আসামী কয়জনকে চিনতি পারিস্?

[নর্তকী আসামীদের দেখে]

—দ্যাখ্, ভাল ক'রে দ্যাখ্...

[নর্তকী ফুকনের দিকে তাকায়]

নর্তকী : শুধু একজনকে চিনতে পারছি।

হরনাথ : কাকে? পিয়লি ফুকনকে?

নর্তকী : হ্যাঁ।

হরনাথ : বেশ! আচ্ছা, গ্যালো শনিবার ইংরেজের বারুদ-ঘরে আগুন লাগার কথা জানিস?

নর্তকী : জানি।

হরনাথ : জানিস্! আচ্ছা—ক্যাম্নে জানলি?

নর্তকী : আমি তখন বারুদ-খানার নাচঘরে ছিলুম।

হরনাথ : বারুদ-ঘরে আগুন লাগল ক্যামনে?

নর্তকী : কেউ একজন আগুন ধরিয়েছিল ব'লে।

কুপার : This is not an accident.

নিউভীল : And somebody must be responsible for this. There must be some agents, My Lord! and a conspiracy behind. —এই! কোন্ আগ্ দিলে—জানিস্?

[নর্তকী নীরব]

কুপার : বলিতে হইবে—কোই ডর নাই আছে।

[নর্তকী নিশ্চুপ]

হরনাথ : কোন ভয় নাই--ক', কে দিলে ?

[নর্তকী তথাপি নির্বাক]

হরনাথ : ক'—

কুপার : আদালতমে সচ্ কইতে হইবে। টুমি জানে তো নাম বাত্লাই দিবে।

নর্ত্তকী : সাহেব! বারুদ-ঘরে আগুন আমিই দিয়েছিলুম।

[নর্তকীর কথা শুনে কুপার, পিয়লি এবং হরনাথ বিস্মিত হয়ে প্রায় একসঙ্গেই ব'লে ওঠে—]

কুপার : What ?

পিয়লি : মিথ্যে কথা!

হরনাথ : তুই আগুন দিয়েছিলি ?

পিয়লি : মিছে কথা—একেবারে মিছে কথা। বারুদ-ঘরে আগুন লাগানোর জন্যে দায়ী একা আমি—আর কেউ না।

নর্ত্তকী : আদালতে—জনতার সামনে—আমি মিছে কথা বলিনি।

কুপার : (হেসে হেসে) তুমি ওই রোজ হামলোগের ক্যামপ্মে Dance করলে—টুমি কেইসে আগুন দিলে? ঠিক বাত কও। টুমি দুষীকা নাম জানে তো বাতলাতে হইবে—নেই জানে তো যাব ফারে।

নর্ত্তকী : আগুন লাগাবার শল্তে আমিই দিয়েছিলুম।

পিয়লি : নর্তকী!

কুপার : What ?

হরনাথ : কী!

নিউভীল : Your Honour! The dancing girl seems to be not in her senses. (নর্তকীকে)—এই! টোমার মাথা খারাপ আছে।

নর্ত্তকী : ধর্ম স্মরণ ক'রে শপথ খেয়েছি—আমি মিছে কথা বলিনি। আজ এতো লোকের সামনে ধর্ম সাক্ষী রেখে বলছি—বারুদ-ঘরে আগুন আমিই দিয়েছিলুম।

পিয়লি : কখ্খনও না। নর্তকী! সাহেব! তোমরা নিজেরা আমাকে ধরে এনেছো। বিচার করতে ব'সে তোমাদের অনাবশ্যক সাক্ষীর অবতারণা করার দরকার নেই। তোমাদের আমি বলছি—বারুদ-ঘরে আমি আগুন দিয়েছিলাম।

নিউভীল : Your Honour! This evidence cannot be recorded, because everybody knows that this dancing girl was in the camp on the date of occurance. I assume, she has had a shock in her brain and is thoroughly upset; therefore, her statement is absolutely unacceptable to any sensible mind.

কুপার : Alright. পেশকারবাবু, সাক্ষী কো যানে দিব ফারে।

পেশকার : পেয়াদা—

[পেশকারের ইঙ্গিতে পেয়াদা নর্তকীকে নিয়ে যায়]

কুপার : Captain Newville, please read your charges.

নিউভীল : Here are the charges—Your Honour !

(কাগজপত্র দেখে)—One : He set fire to the Magazine of Sibsagar for which he is liable to the charge for arson—এক : শিবসাগর বারুদ-ঘরে আগুন দিয়ার অপরাধ কো ওয়াস্তে দোষী আছে। Two : He and his party—including those who are at large upto now shot six Soldiers on duty of which two are English and four natives for which they are liable to be charged for murder—দুই : ইংলিশ পল্টন আউর চার নেটিভ পল্টনকো হত্যা কী অপরাধ কো ওয়াস্তে পিয়লি ফুকন, আউর আসামী সব দোষী আছে। Three : His intentions for setting fire to the magazine pulpably meant for creating disorder in the country to the depriment of the country's peace, for which he is liable to be charged with treason—এ দেশদ্রোহী আছে। ধনঞ্জয় গোঁহাঞি, ধনুধর গোঁহাঞি বন্দুক-বারুদ আউর আদমী দে কর পিয়লি ফুকনকো সহায়তা করিয়াছে ; ইস্‌লিয়ে উনলোগ ভী দোষী আছে। হাঁ—লেকিন পিয়লি বরুয়াকো নদী-কিনারমে মিলিছে। উস্‌কা উপর ভারী charge হামার নাই আছে।

কুপার : (কুপার আসামীদের সম্বোধন করে) টুমিলোগ দোষ স্বীকার করে ?

সবাই : স্বীকার করি না।

পিয়লি : এবং সাহেব তোমাদের বিচার করার অধিকারের দাবিও আমরা মানি না। বারুদ ঘরে আমি আগুন দিয়েছিলাম—দেশের শত্রুকে তাড়াবার জন্যে, আর সেই শত্রু হচ্ছ তোমরা। শান্তি স্থাপনের দোহাই দিয়ে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমরা যে গড়ানো-ছাদের কাছারী ঘর খুলেছো, বর্মীদের পুনরাগমনের ভয় দেখিয়ে তোমরা যে গোরা পল্টন রেখেছো, আর, নিজেরা থাকার জন্যে যে চার-চালা বাংলো তুলেছো—এই সবকিছুর ব্যবস্থাই দুর্বল অসমীয়া জনগণের প্রতি উদারচেতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মহান সৌহার্দ্যের পরিচয় !...তোমরা চতুর বণিকজাত। তোমরা জানো যে, বর্মীদের আক্রমণের পর দরিদ্র, দুর্বল অসমীয়া প্রজারা তোমাদের এসব কাজের প্রতিবাদ করতে পারবে না। আর তোমরাও, সেই সুযোগে, সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারবে। তোমাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবার জন্যেই আমি বারুদ-ঘরে আগুন দিয়েছিলাম।

কুপার : Alright. হামি পাঁচ মিনিট কো ওয়াস্তে অন্দর যাব। বিচার পাঁচ মিনিট বন্ধ থাকিবে। ইস্‌কা বাদ টুমিলোগকো উপর হুকুম জারী করিব। লেকিন পিয়লি ফুকন ! শেষবার হামি টুমলোগকে ভাবি দেখিবার টাইম দিচ্ছে। টুমিলোগ ফেরার আদমীসবকো খবর বাতলাতে ফারো তো হামি

টুমিলোগের punishment, I mean, শাস্তি কমতি করিতে পারে, ফিন্ consider, I mean, বিবেচনা করিতে পারে। হাঁ—খালাস্ ভী দিতে পারে।

[সাহেবদের প্রস্থান। হরনাথ পিয়লির কাছে উঠে যায়]

হরনাথ : ফুকন! আপনারা চারজন যখন ধরা পড়ছেনই, নিজেদের বাঁচার ব্যবস্থা করি বাকী কয়জনের নাম কই দিলেই হয়। কর্ণেল সাহেব কী ক'য়ে গেলেন, শুনছেন তো! বিশেষত, আপনার ওপরে সাহেবের করুণা হৈছে। আরও একটা কথা ফুকন! রাজনীতিতে ধর্ম নাই। ফেরারীদের নাম ক'য়ে দিলে আপনি কি রৌরব নরকে যাবেন?

পিয়লি : তাদের নাম আমি বলব না।

হরনাথ : আপনি শুধু নাম কয়টা কইলেই, বাকিটা আমি—

পিয়লি : হরনাথ! বন্ধুভাবেই হোক, আমার মুখ থেকে তুমি বাকিদের নাম বার করতে পারবে না। আমাকে বিরক্ত কোরো না।

[সাহেবরা আবার ফিরে আসে। হরনাথ নিজের জায়গায় ফিরে যায়]

কুপার : Now, Piyali Phookan—টুমি হামাকে ফেরার আসামীসব্‌কা নাম বাত্‌লাতে রাজি আছে?

পিয়লি : সাহেব, একবার যে কথা বলব না বলেছি, তুমি আমাকে ফাঁসীকাঠের ভয় দেখিয়েও সে-কথা আমার মুখ থেকে বার করতে পারবে না।

কুপার : Alright. (কাগজে রায় লেখে। তারপর পড়ে শোনায়)—পিয়লি ফুকন, ধনঞ্জয় গোঁহাঞি, ধনুধর গোঁহাঞি আউর পিয়লি বরুয়া— টুমিলোগ ম্যাগাজিনমে আগ দিয়ার অপরাধ মে আউর দেশকা শান্তি আউর শক্তি নষ্ট করার অপরাধ কো ওয়াস্তে দোষী প্রমাণ হৈছে। লেকিন, পিয়লি বরুয়াকো হামিলোগ ম্যাগাজিনমে না পাইছে—উস্‌কা মতলব প্রমাণ না হৈছে—ইস্‌লিয়ে আদালত উস্‌কো খালাস্ দিছে। ধনঞ্জয় গোঁহাঞিকো আদালত বারো বরিস আউর ধনুধরকো দস বরিস Rigorous impisonment—অর্থাৎ—সশ্রম কারাদণ্ড কা হুকুম দিছে। আউর পিয়লি ফুকন! টুমি সব্‌লোগকা Leader আছে— টুমি সব ষড়যন্ত্র আউর বিদ্রোহ কা কারণ আছে। ইস্‌লিয়ে টুমার কসুর ভী বহুৎ জা'দা আছে। আদালত টুমাকে ফাঁসীর হুকুম দিছে!

সকলে : ফাঁসী!!!

['ফাঁসী' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে একটা Sound Effect হয়, আর তৎক্ষণাৎ আসামী কয়জন পিয়লিকে জড়িয়ে ধরে। গোটা রঙ্গমঞ্চ নির্বাক-নিস্তব্ধ, একটা আলপিন পড়লেও যেন শব্দ উঠবে।

পিয়লির মুখ থেকেও হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

সংযত থাকতে না পেরে জন্মির চোখে জল আসে। নেপথ্যে বারোটা বাজার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। অতঃপর পিয়লি ধীরস্থির ভাবে বলে—]

পিয়লি : আইনের আড়াল নিয়ে, ক্ষমতার প্রয়োগ ক'রে তোমরা আমাকে ফাঁসী দিচ্ছ। ফাঁসীর মঞ্চে ওঠা পিয়লি ফুকনের একটা জবানবন্দী তোমাদের এই বিচার প্রহসনের দলিলে লিখে রাখো, সাহেব! ...আমি বলে যাচ্ছি—আজ একজন পিয়লিকে ফাঁসী দিচ্ছ, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে—যেদিন ছ'শো বছর স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া এই অসমীয়ারা, পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে না পেরে, তোমাদের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঘরে-ঘরে মাথা তুলবে। সেদিন কটা পিয়লিকে ফাঁসী দেবে?...একদিন আসবে, যেদিন প্রহরী-ঘেরা বারুদ-খানা, চারচালের বাংলো-বাড়ি, গড়ানে-ছাদ কাছারী ঘর—সমস্ত ছেড়ে, স্টীমারবোটে উঠে, এই দেশ ত্যাগ ক'রে, যেপথ দিয়ে এসেছ সেই পথে তোমাদের ফিরে যেতে হবে! তোমাদের প্রতি এ আমার ক্রুদ্ধ উক্তি নয়, সাহেব—এ আমার ভবিষ্যৎবাণী। লিখে রেখো তোমাদের দলিলে।...বারুদ-ঘরে অগ্নিসংযোগ ক'রে অসমীয়া জনগণকে আমি শুধু উপদেশই দিই নি—উদাহরণও দেখিয়ে দিয়েছি।

কুপার : অসমীয়া কর্মচারীসকল! আপলোগকা দেশমে কেয়া দস্তুর, সে দেশদ্রোহীকো প্রাণদণ্ড দেয়?

[কর্মচারীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, কেউ কিছু বলে না]

কুপার : কইতে ফারে না? কও—কও—

হুতিরাম : কাঠ-কাকতী[1] এবং বর-ভাণ্ডার বরুয়াই[2] আমাদিগের দেশের তাবৎ দা-দস্তুর জানেন—তেয়ঁারাই কন্। তেয়ঁারা যি বুইল্যন, সিই আমাদিগের মত।

কুপার : কোন্ বর-ভাণ্ডার-বরুয়া জানে? ত'সীলদার মনিরাম বর-ভাণ্ডার-বরুয়া?

হুতিরাম : হ্যাঁ সাহেব।

কুপার : তসীলদারকো সেলাম দাও।

পেশকার : পেয়াদা! ত'শীলদারকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো।

[পেয়াদার প্রস্থান ; মনিরামসহ পুনঃপ্রবেশ]

কুপার : Look here, Tehsildar—টুমালোগের দেশমে কেইসা মাফিক দেশদ্রোহী কা প্রাণদণ্ড দিয়া হয়—বাতলাও।

মনিরাম : সাহেব! বিচারে যদি কেউ রাজদ্রোহী ব'লে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই রাজদ্রোহীর গলায় ছেঁড়া মেখলা বেঁধে—

আসামীগণ : মনিরাম!

মনিরাম : —আরও নানারকম দুর্গতি ক'রে মারাটা আমাদের দেশের দস্তুর।

[জন্মি লোকজন ঠেলে এগিয়ে এসে মনিরামকে ধাক্কা মারে]

1, 2. উপাধিবিশেষ

জন্মি : হঠাৎ-গজা কোম্পানীর গোলাম।

হরনাথ : (বিরক্তির সঙ্গে) ছিঃ ত'শীলদার। এ আমাদের দেশের দস্তুর না।

ধনঞ্জয় :
ধমুধর : } —কক্‌খনও না!

[রঙ্গমঞ্চ জুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে]

কুপার : Order ! Order !

[সিপাইরা লোকদের ঠেলে সরিয়ে দেয়]

—বর-ভাণ্ডার-বরুয়ার বাত জরুর বলবৎ থাকিবে।

[কুপার সাহেবের প্রস্থান]

পিয়লি : মনিরাম! তুই ঢুওরা-কাকতী[1] বংশের, আর আমিও সাতঘরীয়া আহোমের ঢুওরা বংশের। আমাকে ফাঁসী দিয়ে প্রাণে মেরেও হল না? ভদ্রকুলে জন্মেও, সম্ভ্রান্ত লোকের মরণকালে, তাকে এইভাবে ঘোর অপমান করিয়েই তোর সুখ হল! যে দোষে আজ আমার এই অবস্থা, তার জন্যে আমার কণামাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু মরণকালে—এমন অপমান দিয়ে মারার জন্যে—গলায় দড়ির ফাঁস প'রে, সমস্ত অন্তর থেকে আমি বলে যাচ্ছি—যে দড়িগাছি আজ আমি উপহার পেলাম, সেই দড়িগাছাই একদিন বিনা উপহারে তুই পাবি মনিরাম, বিনা উপহারে পাবি।

[পর্দা নামে]

ফাঁসী

[সময়—প্রভাত। শিবসাগর জেলখানার সম্মুখভাগ। দ্বারদেশে বারো জন সশস্ত্র প্রহরী। একপাশে ফাঁসীকাঠ দেখা যায়। জেলখানার দরজার সমান্তরালে আসা-যাওয়ার পথ একটা; সেই পথের দুদিকে ফাঁসী দেখতে-আসা মানুষের ভিড়। কিছু লোক বসে আছে। কিছু দাঁড়িয়ে। একপাশে পিয়লির মা, সুচিতা এবং লবণীর হাত ধ'রে জন্মি দাঁড়িয়ে আছে। নেপথ্যে ছ'টা বাজার ঘন্টা শোনা যায়। কর্ণেল কুপার, মেথী এবং হরনাথ বরুয়ার প্রবেশ। কুপার জেলের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। সিপাই স্যালুট ক'রে জেলের দরজা খুলে দেয়; কুপার জেলের ভেতর ঢুকে যায়। হরনাথ ও মেথী বাইরে থাকে। মানুষেরা সব স্থির। চারদিকে নিস্তব্ধতা। দরজার

1. আহোম বংশের উচ্চকোটির সাত ঘর—রাজা, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, সন্দিকৈ, লাহন, দিহিঙীয়া, ঢুওরা।

মধ্যে দিয়ে দেখা যায়—পিয়লি তার সহচর ধনঞ্জয় ও ধনুধরকে আলিঙ্গন-অন্তে বিদায় দিচ্ছে।

পেছনে কুপার বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে চারজন সিপাই ফুকনকে ঘিরে জেলের ভেতর থেকে বার ক'রে আনে। জেলের দরজা পেরিয়ে এদিকে আসতেই পিয়লিকে দেখে লবণী 'বাবা বাবা' বলে চিৎকার ক'রে জন্মির হাত ছাড়িয়ে কাছে যেতে চায়। জন্মি আস্তে লবণীকে কোলে তুলে নেয়। মুহূর্তের জন্যে পিয়লি বিচলিত হয়; কিন্তু সংযত হবার চেষ্টা ক'রে এগিয়ে আসতে থাকে। মঞ্চের মাঝখানে এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। কুপার এগিয়ে এসে পিয়লিকে বলে—]

কুপার : পিয়লি ফুকন! টুমার উপরে জো হুকুম জারী করিছে, উস্‌কো ফিন্ আউর একদফে পড়ি বাতলাব। (প'ড়ে শোনায়)—শিবসাগর ম্যাগাজিনমে আগুন দিবার অপরাধ মে, আউর কোম্পানী পল্টনকো হত্যা কী অপরাধ মে, আউর দেশমে শান্তি-ভঙ্গ আউর শক্তি ধ্বংস করার অপরাধ মে আদালত টুমাকে দোষী বানাইছে। ইয়ে কসুর কো ওয়াস্তে আদালত টুমাকে ফাঁসী হুকুম দিছে। (ঘড়ি দেখে)—আভী ফাঁসী কো সময় হো গিয়া। টুমার কোই অভিলাষ থাকে তো আদালতকো বাতলাতে ফারিবে। টোমার শেষ অভিলাষ পূরণকো ওয়াস্তে আদালত বিবেচনা করিতে ফারে।

পিয়লি : আমার কোন অভিলাষ নেই।

কুপার : আইনকো দস্তুর রাখি হামি টুমাকে দশ মিনিট সময় দিছে। (পুনরায় ঘড়ি দেখে)—টুমার কোন relations, I me...,—আত্মীয়লোক থাকে তো বাতচিত হইতে ফারে। আউর ধর্মকো ওয়াস্তে ঈশ্বরকো ভী প্রার্থনা করিতে ফারে।

[কুপারের কথা শুনে পিয়লি কুপারের দিকে চেয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়; কিছু না ব'লে জনতার দিকে এগিয়ে যায়। জন্মি এগিয়ে গিয়ে পিয়লিকে জড়িয়ে ধরে, এবং বেদনা-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে—]

জন্মি : পিয়লি—

[পিয়লির মন, মনে হয়, পার্থিব হর্ষ-বিষাদের অনেক ওপরে। মুখ শিলামূর্তির মতো অস্বাভাবিকরূপে স্থির]

পিয়লি : কেঁদো না, দাদা। তোমরা আমাকে আনন্দের সঙ্গে বিদায় দাও।

[লবণী জন্মির কোল থেকে নেমে 'বাবা' 'বাবা' ব'লে পিয়লিকে জড়িয়ে ধরে। পিয়লি মেয়েকে কোলে তুলে নিতে চেষ্টা করে; জন্মি লবণীকে তুলে ধরে। পিয়লি মেয়েকে সস্নেহে চুমু খায়]

লবণী : বাড়ি যাব, চলো বাবা! বাড়ি যাবে, চলো।

পিয়লি : যাব মা! একটু পরে একেবারেই নিজের বাড়ি যাব।

[পিয়লি মার কাছে এগিয়ে যায়। মা হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে]

পি. মা : পিয়লি, সোনা আমার—

পিয়লি : কপালে দুঃখ নিয়ে এসেছিস্ মা, কাঁদলে কী হবে? কাঁদবি না—আমি যাবার পরে, আমরণ কাঁদিস্। অপেক্ষা কর্—আমার শেষ কাজটা ক'রে নি।

[সুচিতা কাঁদতে থাকে। জনতার মধ্যে দু-একজনকে কাঁদতে শুনে পিয়লি ওদের দিকে তাকিয়ে বলে—]

পিয়লি : তোমরা ক্যানো এসেছো? বর্মী-আনা বদনের ছেলের গলায় ছেঁড়া মেখলা বেঁধে শ্বেত বিদেশীরা ফাঁসী দিচ্ছে—তাই দ্যাখার জন্যে?

[জনতা নতমস্তকে ব'সে থাকে]

—কোম্পানীর বারুদ-খানায় আমি আগুন দিয়েছিলাম; সেইজন্যে ফিরিঙ্গিরা বিচার ক'রে আমার গলায় একগাছি ফাঁসীর দড়ি দিচ্ছে। কিন্তু আমার স্বদেশবাসী আমার গলায় পরিয়ে দিলে ছেঁড়া মেখলা।—ক্যানো? আমি কী দেশদ্রোহের কাজ করেছিলাম? কোন্ মহাপাপে, আমার মরণকালে তোমরা এই লাঞ্ছনা জড়িয়ে দিলে? কোম্পানী কি তোমাদের এ্যামোনই অন্তরঙ্গ কুটুম যে, দেশ থেকে তাদের উৎখাতের চেষ্টা করলে তোমাদের হৃদয় ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়?...আজ গলায় দড়ির হার প'রে, মৃত্যুর তোরণ-দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি—বর্মীদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্যে শ্বেত বিদেশীরা আসে নি—ওরা এসেছে, সুজলা-সুফলা আসামে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে।... আমাদের তোমরা 'বিষধর সাপের সন্তান ব'লে মনে করো। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমাদের 'পতিত-পাতকী' আখ্যা দিয়ে একঘরে করে রেখেছো।...আজ আসামের স্বর্গদেবরা নেই যে, বরফুকনের বিচার করবেন। আমায় ক্ষমা কোরো না—পিতৃঋণ আমি শোধ ক'রেই যাব। এই ক্ষতবিক্ষত বুকের রক্ত দিয়ে বরফুকনের নামের কলংক আজ আমি ধুয়ে দিয়ে যাব।...আমি মরব।—আমি প্রেতযোনি লাভ ক'রে রাজসমাধিকে রক্ষা করব।—আমি আবার আসব। স্বর্গে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বৈকুণ্ঠও আমি চাই না—আমি এই সোনার কটোরা,[1] দেবেরও দুর্গম আসামেই আবার ফিরে আসব—আবার জন্ম নেব। ওরা আমাকে, একবার ফাঁসী দেবে, আমি দ্বিতীয়বার আসব; দুবার ফাঁসী দেবে, আমি দশবার আসব!! সাদা ফিরিঙ্গীদের না তাড়ানো পর্যন্ত আমি জনমে-জনমে গলায় ফাঁসীর দড়ি পরব। (উদ্দীপনায় পিয়লির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ছোট ছেলের মতো কেঁদে ফেলে) —দু'শো বছর ধ'রে বুকের রক্ত দিয়ে গড়া আসামকে আমি রেখে গেলাম বিদেশীর হাতে—

[উপস্থিত সকলে কেঁদে ওঠে]

1. মূলে আছে—'সঁফুরা'। ঢাকনাযুক্ত পান-সুপুরির ট্রে।

কুপার : Inspector! পিয়লি ফুকনকো বলিয়া দিবে—This is time ; আউর জাস্তি দেরি করিবে না।

হরনাথ : সাহেব! মরণ-কালে ওঁর অভীষ্ট কাজ করি মরতে দিয়েন। আর কিছুক্ষণ সময় দিলে ও হৃদয় উজাড় করি কৈতি পারবে। তাতে, আত্মাও শান্তি পাবে। মরণকালের দুঃখ থাকবে নে।

পিয়লি : যাও তোমরা! যাবার আগে হাতজোড় ক'রে বলছি—এই-খোঁড়ার সমস্ত দায়-দোষ ক্ষমা কোরো।

[পিয়লি জনতাকে নমস্কার করে। জনতা হরিধ্বনি দেয়]

জনতা : অ'—হরি, অ'—রাম ;
অ'—রাম ; অ'—হরি।

[প্রণামান্তে পিয়লি উঠতে যায়, পারে না। হঠাৎ 'নারায়ণ' ব'লে ডেকে ওঠে। জন্মি ধ'রে তুলে দেয়]

পিয়লি : দাদা! মৃত্যুর পরে ফিরিঙ্গিরা আমার শব দেহটা যদি তোমাদের ফিরিয়ে দেয় -তাহলে রাজ-সমাধির কাছে সৎকার কোরো।

[পিয়লি মার কাছে যায়। মা কচি বাচ্চাকে আদর করার মতো আদর করতে গিয়ে আবার অঝোরে কেঁদে ফেলে]

পিয়লি : মা! আমি আবার আসব।

[পিয়লি মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে গিয়ে নর্তকীকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। নর্তকী পিয়লির চরণে প্রণাম নিবেদন করে, উত্তরীয়ের আঁচলে চোখের জল মোছে]

পিয়লি : নর্তকী। তুই আমার দেবী!...গোঁসানী!

[কুপারের ইঙ্গিতে দুজন প্রহরী পিয়লির দিকে এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। সুচিতা পিয়লিকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। পিয়লির সংযমের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যেতে চায়। সুচিতার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে ; তারপরে নিজে হাতে সুচিতার সিঁথির সিঁদূর মুছে দেয়।...অসহ্য যন্ত্রণায়, আর কোনদিকে না তাকিয়ে, ঘুরে, ফাঁসীকাঠের দিকে এগিয়ে যায়। সুচিতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

লবণী : বাবা—বাবা!...কোথায় যাচ্ছ—যেও না—যেও না—

[এই ব'লে চিৎকার করতে করতে পিয়লির পেছনে-পেছনে দোড়ে যেতেই জন্মি লবণীকে কোলে তুলে নেয়। লবণী অস্থির হ'য়ে হাত-পা ছুঁড়ে, চিৎকার করতে থাকে—]

লবণী : আমাকে ছেড়ে দাও...আমাকে ছেড়ে দাও—

[পিয়লি ফুকন কোনকিছুতে কর্ণপাত না ক'রে নিজে নিজে ফাঁসীকাঠের মঞ্চের ওপরে উঠে যায়। পিয়লির মা, সুচিত্রা এবং লবণীকে সরিয়ে নিয়ে যায় জল্লি।

পরিবেশ জুড়ে স্তব্ধতা। ফাঁসীকাঠে উঠে—পিয়লি হার, পাগড়ি, সব আল্‌গা ক'রে দেয়।

অতঃপর প্রহরী পিয়লির মাথায়-মুখে কালো কাপড় পরিয়ে গলায় ফাঁসীর দড়ি বেঁধে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে গোটা রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকারাবৃত থাকা অবস্থায়ই পিয়লির মুখের কয়েকটা কথা—

—স্বর্গে আমার প্রয়োজন নেই—বৈকুণ্ঠ আমি চাই না—আমি এই সোনার কটোরা, দেবেরও দুর্গম আসামেই আবার ফি'রে আসব—আবার জন্ম নেব—আমি জনমে-জনমে গলায় ফাঁসীর দড়ি পরব—

এসব শূন্য থেকে কারও পুনরাবৃত্তির মতো শোনা যায়। বিগ্‌ল্‌ বেজে ওঠে—সে ফাঁসীকাঠের –দুর্বহ পরিস্থিতির কথা ঘোষণা করে মাত্র। বেশ কিছু পরে, রঙ্গমঞ্চ আলোকিত হয়ে ওঠে।

দেখা যায়—জনতার মাঝখানে শ্বেতবস্ত্র এবং ফুলে ঢাকা পিয়লির মৃতদেহ ; পাশে পিয়লির ক্রাচ জোড়া। জনতা হরিধ্বনি সহকারে শবশয্যা উঠিয়ে নিয়ে যায়]

জনতা : অ'—হরি, অ'—রাম ;
অ'—রাম, অ'—হরি।

[শবশয্যা ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য থেকে করুণ গানের সুর ভেসে আসে—]

বুকের বাছারে কেবা কাড়ি নিলে,
কলিমার রক্তে হাড়িকাঠ রাঙালে
বধিতে নারিবে,
মরি জনমিবে
জনমে জনমে দেশের যুবাদলে ॥

॥ যবনিকা ॥

আসামের একাঙ্কিকা-আন্দোলনের শুরু স্বাধীনতার অনেক বছর পরে হলেও, অবশ্য 1914 সালে লেখা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'পদাধর রাজা' একমাত্র ব্যতিক্রম। অসমীয়া সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ রীতিমত বিস্ময়কর। বর্তমান সঙ্কলনের আটটি একাঙ্কিকা সেই আশ্চর্য অগ্রগতির ছবি তুলে ধরে। এই সঙ্কলন সমগ্র অসমীয়া সাহিত্যের দুর্বার গতির একটি স্মারক মাত্র। যে কোন ভাষার পাঠকই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই সঙ্কলনের এক বিশেষ সংযোজন মগাওঁ নাট্য সমাজ প্রকাশিত 'পিয়লি ফুকন'। এই নাটকের নাট্যকারদের নাম নেই। অথচ অসমীয়া নাট্য সাহিত্যে 'পিয়লি ফুকন' এক মাইলস্টোন।

অনুবাদক গুরুদাস ভট্টাচার্য নাট্য সাহিত্যের একজন স্বীকৃত সমালোচক।

Rs. 13.50

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

